প্রতিচিন্তা



সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

পঞ্চম বর্ষ ● তৃতীয় সংখ্যা ● ঢাকা ● জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৫

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

জুলাই-সেপ্টেম্বর সংখ্যা ২০১৫

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মাননীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মাহবুব হোসেন, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; উপদেষ্টা, ব্র্যাক

সম্পাদনা পর্ষদ
নজরুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্ ও জোশিতা জিহান অর্নব

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : protichinta.prothom-alo.com, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
July-September Issue, 2015; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৬

অর্থনীতি

একবিংশ শতকে পুঁজি : মার্ক্স থেকে পিকেটি ৯
এম এম আকাশ

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক

ছিটমহল বিনিময় : পেছনের কাহিনি ও সামনের চ্যালেঞ্জ ৪৩
মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী

পর্যালোচনা নিবন্ধ

ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতভাগ : জিন্নাহ ও গান্ধীর ভূমিকা ৭১
রাহমান চৌধুরী

আঞ্চলিক রাজনীতি

নেপালের 'মাধেস আন্দোলন' : পূর্বাপর ১১৯
আলতাফ পারভেজ

আন্তর্জাতিক

অপ্রত্যাশিত কিউবা ১৩৫
এমিলি মরিস

বই আলোচনা

ইসলামি রাষ্ট্রের পতন ও উত্থান ১৮০
আইরিন খান

পাঁচ বছরের প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বই আলোচনা ২০০

লেখক পরিচিতি ২০৪

সম্পাদকীয়

পুঁজিবাদী বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভঙ্গুর চিত্রটি সাম্প্রতিক কালে বারবার সামনে চলে এসেছে। ফরাসি অর্থনীতিবিদ থমাস পিকেটি তাঁর *একবিংশ শতকে পুঁজি* গ্রন্থে বর্তমানকালে পুঁজিবাদী অর্থনীতিরই শুধু সমালোচনা করেননি, কার্ল মার্ক্সের অনেক মতামত প্রসঙ্গেও ভিন্নমত পোষণ করেছেন। সেই বিবেচনায় পুঁজিবাদের সমালোচনা করার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ পাঠের পাশাপাশি মার্ক্সবাদের পাঠকে সঠিকভাবে উপস্থাপন অত্যাবশ্যকীয়। এম এম আকাশ তাঁর প্রবন্ধে মার্ক্স থেকে পিকেটি পর্যন্ত পুঁজিবাদ ও মার্ক্সবাদকে পাশাপাশি উপস্থাপন করে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। উল্লেখ্য, প্রবন্ধটি চলতি বছরের ৫ মে কার্ল মার্ক্সের ১৯৮তম জন্মবার্ষিকীতে 'পাঠশালা' আয়োজিত একটি পাবলিক লেকচারে পঠিত হয়েছিল।

দীর্ঘদিন ঝুলে থাকার পর সম্প্রতি বাংলাদেশ-ভারত স্থলসীমান্ত চুক্তিটি ভারতের জাতীয় সংসদে অনুসমর্থন পেয়েছে। দুই দেশের সম্পর্কের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিবদমান কিন্তু অমীমাংসিত এ চুক্তিটি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ছিটমহলবাসী রাষ্ট্রহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে যাচ্ছে। কিন্তু দেখা দরকার, কেন এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এত লম্বা সময়েও বাস্তবায়িত হয়নি এবং বাস্তবায়নের পথে উল্লেখযোগ্য কী কী চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী।

দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনৈতিক দৃশ্যপটে নেপাল উল্লেখযোগ্য একটি দেশ। চারদিক থেকে ভূখণ্ডবেষ্টিত দেশটির ওপর ভারতের যেমন রয়েছে প্রবল প্রভাব, তেমনি চীনের রয়েছে প্রচণ্ড আগ্রহ। ভূরাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নেপালের মাধেস আন্দোলন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই আন্দোলন দেশটির ওপর ভারতের প্রভাব বিস্তারের অন্যতম মাধ্যম। এসব আর্থ-রাজনৈতিক উপাদান বিবেচনায় রেখেই লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ 'নেপালের মাধেস আন্দোলন: পূর্বাপর' প্রবন্ধে মাধেস আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেছেন।

প্রথম আলোর পুরস্কারপ্রাপ্ত আহমদ রফিকের *দেশবিভাগ: ফিরে দেখা* গ্রন্থটির একটি প্রতিক্রিয়া হিসেবে পর্যালোচনা নিবন্ধটি লিখেছেন লেখক ও গবেষক রাহমান চৌধুরী। ভারতভাগ নিয়ে প্রচলিত জ্ঞানকর্ম জিন্নাহ ও গান্ধীর মধ্যে জিন্নাহকেই বেশি দায়ী করে থাকে। কিন্তু এই নিবন্ধে গান্ধী তথা কংগ্রেস নেতৃত্বের ভূমিকা জিন্নাহ তথা মুসলিম লীগ থেকে বেশি বলেই দাবি করা হয়েছে। ভারতভাগ ও এর প্রভাব উপমহাদেশের রাজনীতিতে এখনো প্রবল। এর পাশাপাশি বাংলাভাগের পেছনে কার কতটুকু দায় রয়েছে, সে বিষয়েও স্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন। এসব নিয়ে আরও বিস্তর ইতিহাস আলোচনার তাগাদা থেকেই এ ধরনের পর্যালোচনা নিবন্ধ ছাপাতে উৎসাহী হলাম।

ভূকৌশলগত কারণে মধ্যপ্রাচ্যে সব সময়ই উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজমান। আরব বসন্ত নামে পরিবর্তনের যে ঢেউ সেখানে লেগেছিল, তার ভবিষ্যৎ নিয়ে রয়েছে নানা মত। স্বৈরশাসনের পতনের মধ্য দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর আবির্ভাব ঘটায় গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিয়ে যথেষ্ট শঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। নোআহ ফেল্ডম্যানের *দ্য ফল অ্যান্ড রাইজ অব দ্য ইসলামিক স্টেট* গ্রন্থটি ইসলামি শরিয়া আইনের সঙ্গে গণতান্ত্রিক শাসনের সংমিশ্রণের একটি চেষ্টা দেখিয়েছিল। সেটার প্রাসঙ্গিকতা আরব বসন্ত-পরবর্তী মধ্যপ্রাচ্য তথা মুসলিম বিশ্বে রয়েছে বলে মনে হয়। আইরিন খান এই বইটি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে থেকেও যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকে ভালো করা যায়, তার অন্যতম উদাহরণ লাতিন আমেরিকার দেশ কিউবা। সুদীর্ঘকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধের কবলে থাকা সমাজতান্ত্রিক দেশ কিউবা বিভিন্ন সূচকে কীভাবে উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জন করল, তার একটি চিত্র এঁকেছেন এমিলি মরিস তাঁর 'অপ্রত্যাশিত কিউবা' প্রবন্ধে। সাম্প্রতিক সময়ে এসে কিউবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্কোন্নয়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে কিউবা সম্পর্কে আলোচনা নতুন আঙ্গিকে সামনে এসেছে। যার ফলে এ দেশের মানুষের জানার কৌতূহল আরও বেড়েছে। কিউবা সম্পর্কে জানার ক্ষেত্রে এ প্রবন্ধটি যথেষ্ট কার্যকরী হবে বলে আশা করি।

এ সংখ্যার মাধ্যমে প্রতিচিন্তা তার পাঁচ বছর পূর্ণ করতে যাচ্ছে। এ সুযোগে আমরা বিগত পাঁচ বছরের প্রতিচিন্তার লেখক, গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি প্রতিচিন্তা পরিবারের সংশ্লিষ্ট সবাইকে, যাঁদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছি।

খাতি
অর্থনীতি
চিন্তা

একবিংশ শতকে পুঁজি : মার্ক্স থেকে পিকেটি

এম এম আকাশ

সারসংক্ষেপ

মার্ক্স-সমর্থক ও মার্ক্সবিরোধী উভয় দলই কার্ল মার্ক্সকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। মার্ক্সের দর্শনকে সামনে এগিয়ে নিতে হলে সুষ্ঠু মার্ক্সপাঠ অত্যাবশ্যকীয়। মার্ক্সের অন্যতম কৃতিত্ব হলো তাঁর *পুঁজি* গ্রন্থ, যার ভেতর দিয়ে তিনি পুঁজির বিকাশ ও এর মধ্যে অন্তর্নিহিত বিনাশের উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। এ সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যেমন প্রয়োজন, তেমনি বর্তমান যুগকে মাথায় রেখে পুঁজির পরিবর্তনগুলোয় নজর দেওয়া জরুরি। অনেকগুলো পরিবর্তনের মধ্যে মার্ক্সবাদী অর্থনীতিবিদেরা আর্থিক পুঁজি, শিল্পপুঁজি, বাণিজ্যিক পুঁজি ও করপোরেট পুঁজি নামের চারটি নতুন উপাদানের কথা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সামনে এনেছেন বারবার। এর পাশাপাশি মার্ক্সবাদীদের আত্মজিজ্ঞাসাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতন্ত্র বিজয়ী হলো নাকি পুঁজিবাদ বিজয়ী হলো, সেই আলোচনার চেয়ে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তায় বেশি জোর দেওয়া প্রয়োজন। থমাস পিকেটি একবিংশ শতকে পুঁজির ধরন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্ক্স ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিবিদ কুজনেৎস উভয়কেই সমালোচনা করেছেন। আধুনিককালে পুঁজির ধরন নিয়ে তিনি বিস্তর বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন কেন বৈষম্য ক্রমাগতভাবে বাড়বে এবং তার করণীয় কী।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ : মার্ক্স, পুঁজির বিকাশ ও বিনাশ, পিকেটি, একুশ শতকে পুঁজি, মার্ক্স-পিকেটি সম্পর্ক, পুঁজির বৈচিত্র্য, মার্ক্সবাদীদের আত্মজিজ্ঞাসা, পুঁজিবাদ সংস্কার।

'What these gentlemen all lack is dialectic. They never see anything but here cause and there effect. That is a hollow abstraction, that such polar opposites only exist in the real world during crises, while the whole vast process proceeds in the form of interaction (though of very unequal forces, the economic movement being by far the strongest most elemental and most decisive) and that here everything is relative and nothing is absolut-this they never begin to see. Hegel has never existed for them." [Source: Marx–Engels (1975a)]

'এসব ভদ্রলোকের মধ্যে যা নেই তা হলো দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি। কোনো কিছুর কারণকে এক স্থানে আর ফলাফলকে অন্য স্থানে দেখতে তারা বেশ অভ্যস্ত—এ ছাড়া অন্য কিছুই তারা দেখতে পায়

না। ফলে এটি হয়ে দাঁড়ায় অন্তঃসারশূন্য বিমূর্তায়ন। বাস্তব দুনিয়ায় কেবল সংকটকালীন মুহূর্তেই এমন সংলগ্ন জিনিসের এ ধরনের বিপরীত মেরুর অবস্থান দেখা যায়। অথচ ইতিহাসজুড়ে কারণ ও ফলাফলের বিশাল প্রক্রিয়াটি বিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হয়নি, বরং আমরা এদের দেখি দ্বান্দ্বিক রূপে (যদিও তা সংঘটিত হয় খুবই অসম দুই শক্তির মধ্যে : অর্থনৈতিক গতিশীলতার শক্তিই এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী নির্ধারক হিসেবে কাজ করে)। এ কারণে দুনিয়াতে সবকিছুই আপেক্ষিক; কোনো কিছুই শাশ্বত নয়—যা তারা এখনো বুঝতে শুরু করেনি। হেগেলকে তারা কখনোই বুঝে উঠতে পারেনি।' [উপরিউক্ত ইংরেজি উদ্ধৃতির লেখককৃত বঙ্গানুবাদ]

প্রারম্ভিক কথা

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ হচ্ছে মার্ক্সের সব লেখার প্রাণবস্তু। একে অনুধাবন না করে মার্ক্স অধ্যয়নের প্রচেষ্টা দুই ধরনের একদেশদর্শিতার (One-sidedness) জন্ম দিয়েছে। এক দল মার্ক্সের আবিষ্কৃত স্থান-কাল-পাত্র সাপেক্ষ আপেক্ষিক শিক্ষাগুলোকে একধরনের আপ্ত বাক্যে পরিণত করে মার্ক্সকে ধর্মগুরুর মতো মর্যাদা দান করেছে। আরেক দল মার্ক্সবিরোধী পণ্ডিত 'খড়ের মার্ক্স' তৈরি করে তাকে খণ্ডন করে ভেবেছে যে অবশেষে মার্ক্স খণ্ডিত হলো! মার্ক্সকে দেবতা বানানোও যেমন ভুল, তেমনি মার্ক্সকে সাবজেক্টিভ পাঠের মাধ্যমে একটি 'খড়ের মার্ক্স' তৈরি করাও কোনো একাডেমিক সততার পরিচয় বহন করে না। যেকোনো মহৎ লেখকের লেখা থেকে একটি বাক্যকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে পরিপ্রেক্ষিত ছাড়াই তাকে মিথ্যা বলে ঘোষণা দেওয়া খুবই সহজ একটি কাজ। মার্ক্স বহুবার এ ধরনের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। দুটি সুপ্রচলিত উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন বলা হয় মার্ক্স 'সমাজতন্ত্রের' কথা বলেছেন, সোভিয়েত সমাজতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে অতএব মার্ক্স ভুল প্রমাণিত হয়েছেন। আবার উল্টো বলা হয় 'সমাজতন্ত্রের' অভ্যন্তরীণ কোনো ত্রুটি ছিল না, মার্ক্সের তত্ত্ব থেকে বিচ্যুতি ও বাইরের ষড়যন্ত্রই সমাজতন্ত্রের পতনের কারণ। এই দুই রকম তত্ত্বই ভুলে যায় যে মার্ক্স বা এঙ্গেলস কেউই সমাজতন্ত্রের ব্লুপ্রিন্ট দিয়ে যাননি এবং আমাদেরই দেশের একজন প্রগতিশীল অধ্যাপক খুব সুন্দর করে বলেছেন যে 'পুঁজিবাদ সম্পর্কে মার্ক্সের রচনা ভান্ডারটিকে যদি আমরা সাগর নাম দিই, তাহলে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার রচনাবলির নাম হওয়া উচিত গোষ্পদ।' তাই সমাজতন্ত্রের পরবর্তী ব্যর্থতা বা ত্রুটির সবকিছুর জন্য মার্ক্সকে অনর্থক দায়ী করা যেমন ভুল, তেমনি স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা না করে মার্ক্সকে হুবহু প্রয়োগ করার চেষ্টা করাটাও ভুল।

মার্ক্সের জন্ম ১৮১৮ সালের ৫ মে। লেনিন তাঁর *কার্ল মার্ক্স* প্রবন্ধে লিখেছেন, *'১৮৮৩ সালের ১৪ মার্চ আরামকেদারায় বসে শান্তভাবে মার্ক্স তাঁর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন'* [লেনিন, ১৯১৪]। এই শান্তভাবে মৃত্যুবরণকারী মানুষটির জীবন ছিল বেশ অশান্ত। তিনি ছিলেন দেশান্তরি বিপ্লবী। পুলিশ তাঁকে এক দেশ থেকে আরেক

দেশে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। প্রথমে বেলজিয়াম, তারপর ফ্রান্স, তারপর জার্মানিতে আবার সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে ফ্রান্সে এবং সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত লন্ডনে এসে মার্ক্স স্থিতিশীল হন এবং সেখানেই মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর জীবন অতিবাহিত করেন। মার্ক্সের ৬৫ বছরের এই জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে *পুঁজি* (*Capital*) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের রচনা ও প্রকাশ। জার্মান ভাষায় রচিত গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডটি প্রকাশ পায় ১৮৬৭ সালে। পরবর্তী সময়ে ১৮৭৩ সালে এর দ্বিতীয় জার্মান সংস্করণটি প্রকাশিত হয় এবং সেটিরও ভূমিকা লেখেন কার্ল মার্ক্স। তৃতীয় ও চতুর্থ জার্মান সংস্করণটি প্রকাশিত হয় মার্ক্সের মৃত্যুর পর ১৮৮৩ এবং ১৮৯০ সালে। উভয়ের ভূমিকা লিখেছেন মার্ক্সের আজীবন বন্ধু ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। আমরা যে ইংরেজি অনুবাদে *ক্যাপিটাল* প্রথম খণ্ড পড়ে থাকি সেটিও প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মার্ক্সের মৃত্যুর পর ১৮৮৬ সালে এবং সেটারও ভূমিকা লিখেছিলেন ফ্রেডারিক এঙ্গেলস। তিনিই মার্ক্সের অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে পরবর্তী সময়ে *ক্যাপিটাল*-এর অন্য দুটি খণ্ড সম্পাদনা করেছেন।

ক্যাপিটাল গ্রন্থের বিষয় হচ্ছে পুঁজি এবং পটভূমি হচ্ছে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের ইউরোপ, আরও ঠিক করে বললে ফ্রান্স, জার্মানি ও ইংল্যান্ড। এ যুগটা ছিল পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার জন্ম ও বিকাশের যুগ। মার্ক্সের ভাষায় যার 'ক্লাসিক গ্রাউন্ড' (চিরায়ত ভিত্তি) হচ্ছে ইংল্যান্ড। মার্ক্স নিজেই *পুঁজি* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম ভূমিকাতে লিখেছেন :

> *'In the work I have to examine the capitalist mode of production and the conditions of production and exchange corresponding to that made up to the present time, their classic ground is England. That is the reason why England is used as the chief illustration in the development of my theoretical ideas.' (এ লেখায় আমাকে পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতি এবং তার উৎপাদন ও বিনিময়ের শর্তাবলিকে পরীক্ষা করে দেখতে হয়েছে। এখন পর্যন্ত এর চিরায়াত ভিত্তিভূমি হচ্ছে ইংল্যান্ড। সে জন্যই আমার তাত্ত্বিক ধারণাসমূহের বিকাশের ক্ষেত্রে উদাহরণ হিসেবে ইংল্যান্ডকেই প্রধান দৃষ্টান্তরূপে ব্যবহার করা হয়েছে।)*

তারপরেই তিনি তার জার্মান পাঠকদের সতর্ক করে বলেছেন যে ইংল্যান্ডের শিল্প ও কৃষি শ্রমিকদের দুর্দশা দেখে জার্মানরা যদি মনে করে থাকেন যে জার্মানিতে অবস্থাটা মোটেও তত খারাপ নয়, তাহলে তাঁরা ভুল করবেন। কারণ, তাঁর ভাষায়,

> *'The country that is more developed industrially only shows to the less developed the image of its future.' (উন্নত শিল্পায়িত দেশটি হচ্ছে কম উন্নত দেশটির ভবিষ্যতের প্রতিচ্ছবি মাত্র।)*

এ উদ্ধৃতি থেকে মনে হতে পারে যে মার্ক্স সব দেশের জন্য পুঁজিবাদী বিকাশের এবং তার যন্ত্রণাময় পরিণতির (শ্রমিক শ্রেণির জন্য) অবধারিত ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এবং সে জন্য হয়তো পুঁজিপতিদেরই তিনি জঘন্য শত্রু হিসেবে দায়ী

করেছেন। অনেক মার্ক্সবাদী এভাবেই মার্ক্সকে পাঠ করেছেন। তার ফলে পুঁজিবাদের অবশ্যম্ভাবিতা ও পুঁজিপতিদের নেতিবাচক অনিবার্যতাই তাদের পাঠে সমধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

এ ধরনের ভাবাদর্শভিত্তিক পাঠের অসুবিধা হলো : এটি মার্ক্সের সামগ্রিক পাঠ নয়। দ্বান্দ্বিক পাঠও এটি নয়। মার্ক্সেরও একটি ভাবাদর্শ আছে কিন্তু সেটিও দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী পদ্ধতিতে নির্মিত। তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে পুঁজি সব সময় 'একরকম ভালো' বা 'একরকম খারাপ' থাকেনি। আমাদের 'পুঁজিকে' দেখতে হবে তাঁর জন্ম-বিকাশ-মৃত্যু—এই দীর্ঘ গতিশীল পথপরিক্রমণের ধারায় ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে। কখন পুঁজি দুর্বল হচ্ছে, কখন সে সবল হচ্ছে, বিকাশমান পুঁজি নিজেই কখন স্থবির ও সংকটে পতিত হচ্ছে, কখন সে সংকটে জর্জরিত হয়ে যাচ্ছে, মনে হচ্ছে মৃত্যু আসন্ন কিন্তু তারপরও কখনো সে 'ফিনিক্স পাখির' মতো ছাইভস্ম থেকে পুনরায় উদিত হচ্ছে, আবার আরেকটি বৃহত্তর সংকটের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য সেই বিচিত্র গতি-পরিণতির সব মাত্রা ও দিকের আন্তক্রিয়ায় পুঁজিকে আমাদের দেখতে হবে একটি জীবন্ত গতিশীল সত্তা রূপে, যদি আমরা প্রকৃতই মার্ক্সের মতো করে পুঁজিকে দেখতে চাই। মার্ক্সের মতো করে পুঁজিকে দেখার অর্থ কী তা মার্ক্সের মুখেই শোনা যাক। *পুঁজি* গ্রন্থের জন্য রচিত এই প্রথম খণ্ডের প্রথম ভূমিকাতেই মার্ক্স পরিষ্কার করে বলেছেন :

'It is the ultimate aim of this work, to lay bare the economic law of motion of modern society-it can neither clear by bold leaps, nor remove by legal enactments, the obstacles offered by the successive phases of its normal development. But it can shorten and lessen the birth pangs. To prevent possible misunderstanding a word. I paint the capitalist and the landlord in no sense coleur de rose. But here individuals are dealt with only in so far as they are the personifications of economic categories, embodiments of particular class relations and class interests. My standpoint from which the evolution of the economic formation of the society is viewed as a process of natural history, can less than any other make the individual responsible for relations whose creature he especially remains, however much he may subjectively raise himself above them.'

'এই গ্রন্থের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে, আধুনিক সমাজের (পুঁজিবাদের—কারণ সেটাই তখন ছিল বিশ্বের আধুনিক সমাজ-লেখক) গতির অর্থনৈতিক বিধানটি উন্মোচিত করে প্রদর্শন করা। এর স্বাভাবিক বিকাশের নিয়মানুযায়ী যেসব প্রতিবন্ধকতা পর্যায়ক্রমে এর সামনে উপস্থিত হবে, যেগুলো সে দুঃসাহসী লম্ফ দিয়েও পার হতে পারবে না। আইনকানুন প্রণয়ন করেও দূর করতে পারবে না তবে যেসবের ভূমিষ্ঠ হওয়ার যন্ত্রণাকে সে কিছুটা কমাতে বা হ্রাস করতে পারবে। ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ যাতে না থাকে সে জন্য আরেকটি কথা। আমি পুঁজিপতি ও ভূস্বামীদের যে ছবি এখানে এঁকেছি তা কোনো অর্থেই সোনালি বর্ণের হয়নি। কিন্তু এখানে ব্যক্তিকে ব্যবহার করা হয়েছে অর্থনৈতিক প্রত্যয়, বিশেষ শ্রেণি সম্পর্ক এবং বিশেষ শ্রেণি স্বার্থের প্রতীক রূপে। আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো সমাজের অর্থনৈতিক গঠনের বিবর্তন হচ্ছে একটি স্বাভাবিক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া, এই ক্ষেত্রে তাই ব্যক্তি হচ্ছে এসব সম্পর্কেরই সৃষ্টি।

এসব সম্পর্কের পরিবর্তনের জন্য একক ব্যক্তিকে তাই দায়ী করা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব তা সে ব্যক্তি বিষয়ীগতভাবে নিজেকে যত ওপরেই তুলে ধরুন না কেন।'

ঊনবিংশ শতকে পুঁজির বিকাশের নিয়মাবলি—মার্ক্সের দৃষ্টিতে

পুঁজি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে পুঁজির গতিচিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্ক্স যে বিষয়ানুক্রম অনুসরণ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তার একটি সংক্ষিপ্ত ক্রম প্রথমে তুলে ধরছি :

ক. *পুঁজির* প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পণ্যের বিনিময়-প্রক্রিয়ায় মুদ্রার অনিবার্য উদ্ভবের নিয়ম।

খ. দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে মুদ্রার পুঁজিতে রূপান্তরিত হওয়ার নিয়ম। কীভাবে সরল পণ্য উৎপাদন জটিল পণ্য উৎপাদনে পরিণত হচ্ছে ইত্যাদি।

গ. তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির নিয়ম।

ঘ. চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আপেক্ষিক উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টির লক্ষ্যে পুঁজিপতি কর্তৃক উন্নততর প্রযুক্তিগত বিকাশের প্রক্রিয়াটি।

ঙ. এসবের ধারাবাহিক পরিণতিতেই পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠছে প্রথমে হস্তশিল্প গিল্ড। তারপর একই ছাদের তলে বৃহদায়তন হস্তশিল্প, যাকে মার্ক্স ম্যানুফেকচারিং নাম দিচ্ছেন। সর্বশেষে জন্ম নিচ্ছে বিস্তৃত অভ্যন্তরীণ শ্রম বিভাজনসহ বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্প। একই দেশের ভেতরে এরপর থেকে কৃষি এবং শিল্প, শহর এবং গ্রাম সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেল। সামন্তবাদ তখন আর প্রধান উৎপাদনপদ্ধতি নয়।

মার্ক্সের এসব বিশ্লেষণ থেকে পুঁজির যৌক্তিক বিবর্তনশীল মডেলটি আমাদের সামনে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এই মডেলে পুঁজির পরিপূর্ণ বিকশিত পর্যায়ক্রমিক রূপগুলো হলো : মুদ্রারূপ পণ্যরূপ উৎপাদনশীলরূপ আবার নতুন পণ্যরূপ আবার মুদ্রারূপ। এভাবেই পুঁজি ক্রমাগত রূপান্তরিত এবং আবর্তিত হচ্ছে। নিচের নকশায় মার্ক্সের এই ক্রমাগত বিকাশমান পুঁজির পর্যায়ক্রমিক রূপগুলোর চিত্রটি তুলে ধরা হলো :

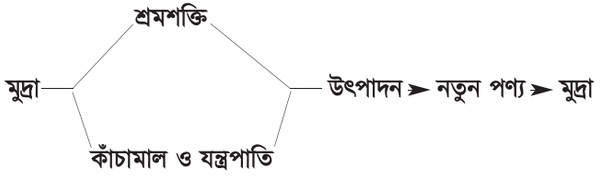

এই নকশাই হচ্ছে পুঁজিবাদী উৎপাদন-প্রক্রিয়ার সরল মৌলিক 'অ্যানাটমি' বা প্রাথমিক অঙ্গব্যবচ্ছেদ। পুঁজিকে যদি মসৃণভাবে টেকসইভাবে সচল রাখতে হয়

তাহলে তাকে তার সবগুলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সচল রাখতে হবে এবং পুঁজির প্রতিটি পর্যায়ক্রমিক রূপের মধ্য দিয়ে পুঁজিকে আবর্তিত হতে হবে। নিজের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যাত্রা করে আবার বর্ধিত আয়তনে যাত্রাবিন্দুতে উপনীত হতে হবে নতুন যাত্রা শুরুর জন্য। যতক্ষণ পুঁজি এই প্রক্রিয়া সাফল্যের সঙ্গে চালিয়ে যেতে পারবে ততক্ষণ পুঁজির কোনো সংকট নেই—বিনাশ নেই। এই কাজে পুঁজির প্রধান দুটি উপায় হচ্ছে ক্রমাগত মুনাফা আহরণ বা উদ্বৃত্ত আহরণ ও তার ক্রমাগত উৎপাদনশীল পুনর্বিনিয়োগ। প্রবৃদ্ধির এই জান্তব অভীপ্সাই হচ্ছে পুঁজিবাদের অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি।

উৎপাদনশক্তির বিকাশের এই দিকটাকেই মার্ক্স মধ্যযুগের অচলায়তন ভাঙার অগ্রদূত হিসেবে প্রশংসা করেছিলেন। কিন্তু এটুকু সত্য আবিষ্কার করে বা উন্মোচিত করেই মার্ক্স ক্ষান্ত হননি। পুঁজির যেমন জন্মকালীন প্রগতিশীলতা আছে, তেমনি তার বার্ধক্য এবং মুমূর্ষুতাও থাকবে—গতিশীল দ্বান্দ্বিক দার্শনিক মার্ক্সের কাছে সেটা স্বতঃসিদ্ধ একটি বিষয়। কিন্তু মার্ক্স ইউটোপিয়ান বা কাল্পনিক দার্শনিক ছিলেন না। তাই তিনি চেষ্টা করেছেন পুঁজির বাস্তব অর্থনৈতিক আত্মগতির মধ্যেই পুঁজির আত্মবিধ্বংসী উপাদানগুলো খুঁজে বার করতে। আজকের যুগে আমরা যখন পুঁজি নিয়ে আলোচনা করব তখন এই দ্বিতীয় দিকটিও আমাদের ভালোমতো নজর দিতে হবে।

পুঁজির আত্মবিধ্বংসী যে উপাদানগুলো মার্ক্স তদানীন্তন পুঁজিবাদের গতিকে বিশ্লেষণ করে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন সেগুলোই এখানে তুলে ধরছি :

১. অবাধ বাজারব্যবস্থায় বৃহৎ পুঁজি ছোট পুঁজিকে প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবে, যেহেতু স্কেল অব ইকোনমি বিদ্যমান।
২. ক্ষুদ্রায়তন ব্যক্তিমালিকানা তাই বাজার প্রতিযোগিতার অধীনে ক্রমেই নিঃস্ব হয়ে যাবে, টেকসই হবে না।
৩. সমাজে দুই মেরুর সৃষ্টি হবে—একদিকে সম্পদ এবং আয়ের প্রাচুর্য এসে জমা হবে। অন্যদিকে স্বল্প আয় ও সম্পদহীনতা বৃদ্ধি পাবে।
৪. বিশাল শ্রমিক শ্রেণির উদ্ভব হবে। তারাই সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণিতে পরিণত হবে। এবং শ্রেণি সংগ্রাম ত্বরান্বিত হবে।
৫. বাজারে অপরিকল্পিত উৎপাদনের কারণে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। সর্বদা দামের ওঠানামা চলতে থাকবে। মন্দা ও স্ফীতির ব্যবসা চক্র থেকে পুঁজিবাদের মুক্তি কখনো হবে না।
৬. কখনো অতি-উৎপাদন ও মন্দা, কখনো স্বল্প উৎপাদন ও মুদ্রাস্ফীতি চলবে।
৭. যান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশু ও মহিলা শ্রমিকেরা প্রতিকূল শর্তে শ্রমবাহিনীতে যোগ দেবেন। যন্ত্র কর্তৃক শ্রম প্রতিস্থাপিত হয়ে বেকারত্বও সৃষ্টি হবে।

৮. পুঁজিবাদ মজুরিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বদাই একটি রিজার্ভ আর্মি অব লেবার বেকারত্বেও টিকিয়ে রাখবে, তাই সেখানে কখনো ফুল এমপ্লয়মেন্ট বেকার জনগোষ্ঠী তৈরি হবে না।
৯. পুঁজির প্রাচুর্য হলে পরে মুনাফার হার ক্রম অবনতিশীল হবে। ফলে পুঁজির বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধির গতি আবার শ্লথ হয়ে যাবে। অথবা সেই সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য ঔপনিবেশিক অভিযান ও যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটবে।
১০. উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন হবে সামাজিক সহযোগিতা। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানা ও বিষম বণ্টনব্যবস্থার কারণে সমাজে শ্রেণিভেদ ও শ্রেণিবৈষম্য বাড়তে থাকবে। ফলে একসময় পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের অধীনে আর উৎপাদন শক্তিগুলোর ভারসাম্যপূর্ণ সহযোগিতামূলক বিকাশ সম্ভব হবে না। পুঁজি ও শ্রমের দ্বন্দ্ব এবং বিচ্ছেদ চূড়ান্ত আকার ধারণ করবে। পুঁজিবাদের পতন ঘটবে। উচ্ছেদকারীরা উচ্ছেদ হয়ে যাবেন।

একবিংশ শতকের পুঁজির বিশ্লেষণ করতে হলে আজ আমাদের মিলিয়ে দেখতে হবে মার্ক্সের বিশ্লেষিত উপরিউক্ত নেতিবাচক দিকগুলোর মধ্যে কোনগুলো এখনো যুক্তিসিদ্ধ এবং প্রামাণ্য সত্য হিসেবে বিরাজমান। আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এখানে 'অল অর নান' দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ সঠিক হবে না। কারণ এ কথা যেমন সত্য যে পুঁজিবাদ কখনোই সংকটশূন্য হতে পারেনি, তেমনি আবার এ কথাও সত্য যে পুঁজিবাদ কখনোই সংকট সমাধানের জন্য নিজস্ব স্বার্থে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা থামায়নি। মার্ক্স বর্ণিত নেতিবাচক দিকগুলো পুঁজিবাদের ভেতরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বদাই কম-বেশি ঐতিহাসিকভাবে উৎপাদিত ও পুনরুৎপাদিত হয়েছিল কিন্তু নানা ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক ও সংস্কারমূলক হস্তক্ষেপের ফলে তা সর্বত্র সোজা সংকটের বা বিপ্লবের দিকে এগিয়ে যায়নি। ভিন্ন ভিন্ন দেশে আলাদা ধরনের অভিঘাত এবং ফলাফলের জন্ম দিয়েছে। একবিংশ শতকে যদি মার্ক্স আবার ফিরে এসে দ্বিতীয়বার *পুঁজি* গ্রন্থটি লিখতেন তাহলে পুঁজিবাদের অভিযোজন ক্ষমতা নিয়ে তাঁর একটি দীর্ঘ নতুন মূল্যায়ন করতে হতো বলে আমি বিশ্বাস করি। তবে উৎপাদনের সামাজিক চরিত্রের সঙ্গে মালিকানার ব্যক্তিগত রূপের যে মৌলিক দ্বন্দ্বটি পুঁজিবাদকে কখনো ছাড়েনি, শোষণ ও উদ্বৃত্ত মূল্যের বিষয়টিও যে পুঁজিবাদের অনিবার্য বৈশিষ্ট্য সে সত্যগুলো পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। তবে আপেক্ষিকভাবে সামন্তবাদের বা খুদে উৎপাদনব্যবস্থার তুলনায় পুঁজিবাদের যে অনেক ইতিবাচক দিকও রয়েছে এবং কোথাও কোথাও সমাজতন্ত্র থেকে শিক্ষা নিয়ে রাষ্ট্রীয় পলিসির মাধ্যমে নিজস্ব নেতিবাচক দিকগুলোকে কোনো

কোনো ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ যে যথেষ্ট সংকুচিত করতেও সক্ষম হয়েছে তা আমাদের নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিতে হবে। আমরা এটাও জানি যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দক্ষিণ কোরিয়া ও তাইওয়ানে বিশেষ ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিশেষ ধরনের পুঁজিবাদী বিকাশের অধীনেই একই সঙ্গে প্রবৃদ্ধি ও বৈষম্য হ্রাস সম্ভব হয়েছিল। একবিংশ শতকে এসে এই ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তগুলো থেকে মার্ক্সবাদীরা প্রয়োজনীয় শিক্ষাটুকু না নিলে আমরা এমন 'মার্ক্সবাদী'তে পরিণত হব, যাদের সম্পর্কে আলাপ করতে গিয়ে মার্ক্সকে বলতে হয়েছিল '*All I know that I am not a Marxist*'. *[মার্ক্স-এঙ্গেলস, ১৯৭৫-বি]*। একবিংশ শতকে এসে পুঁজিবাদের মধ্যেও আজ কতকগুলো নতুন উপাদানের আবির্ভাব হয়েছে, যেগুলো চিরায়ত মার্ক্সবাদে ধরা পড়া সম্ভব ছিল না। কারণ পুঁজিবাদের অভিযোজনের ইতিহাস তখনো ততটুকু মাত্রায় বিকশিত হয়নি, যা থেকে মার্ক্স নতুন তথ্য ও নতুন বিশ্লেষণ সম্পন্ন করতে পারতেন। তখনো কেনস আসেনি এবং কল্যাণ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেরও আবির্ভাব হয়নি। সে জন্যই আজ *পুঁজি* গ্রন্থে ঊনবিংশ শতকে পুঁজির যে অঙ্গব্যবচ্ছেদ মার্ক্স করেছিলেন এবং 'অনিবার্য সংকট' সম্পর্কে যে শর্তসাপেক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেখানে শর্তাবলির মধ্যে কোনো লক্ষণীয় বিশেষ পরিবর্তন এসেছে কি না, সেটাও আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। বর্তমানে এ ক্ষেত্রে মার্ক্সবাদী অর্থনীতিবিদেরাই কয়েকটি বিশেষ পরিবর্তনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এ ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তনের মধ্যে বারবার তারা প্রধানত চারটি পরিবর্তনের কথা তুলে ধরেছেন।

চারটি নতুন উপাদান

প্রথমত, মার্ক্সের বর্ণিত পুঁজির বিভিন্ন রূপ এখন পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তার আকৃতি ধারণ করেছে। যদিও তারা আসলে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। আর্থিক পুঁজি, শিল্প পুঁজি, বাণিজ্যিক পুঁজি, করপোরেট পুঁজি, বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্র ইত্যাদি। এদের মধ্যে কোনো কোনোটির উৎপাদনশীল খাতের সঙ্গে যোগাযোগ এখন অনেক বেশি দূরবর্তী ও অপ্রত্যক্ষ। যেমন ব্যাংকিং পুঁজি বা ফিন্যান্স পুঁজি এখন নিজেই নিজের এক বিশাল বৈশ্বিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে। পণ্যের বাজার শুধু নয়, পুঁজি ও মুদ্রার বাজারও এখন বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। ফলে পুঁজির গতিশীলতাও যেমন বেড়েছে, সংকটও তেমনি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০৮ সালের সংকট ও ১৯৯৫ সালের এশিয়ান সংকট তারই দুটি গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।

দ্বিতীয়ত, এখন একবিংশ শতকে নতুন তথ্য-গবেষণা ও প্রযুক্তি বিপ্লবের অভূতপূর্ব বিকাশ সাধিত হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন যোগাযোগ ক্ষেত্রে বিপ্লব সাধিত হয়েছে, অন্যদিকে আবার 'জ্ঞান' নিজেই একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদনশক্তিতে

পরিণত হয়েছে। ফলে শুধু যন্ত্রের বা শ্রমশক্তির নিয়ন্ত্রণ নয়, জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণও শাসকশ্রেণির জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। উল্টো দিক দিয়ে জ্ঞানী শ্রমজীবীদের উৎপাদনশীলতা এবং দর-কষাকষির ক্ষমতাও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু জ্ঞানকে জ্ঞানের মালিক ব্যক্তি থেকে আলাদা করে ক্রয়-বিক্রয় করা যাচ্ছে না। এর ফলে পুঁজি এখন একটি অসমসত্ত্ব শ্রমবাহিনী তৈরি করেছে, যেখানে নানা ধরনের দক্ষতাসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন ধরনের শ্রমিক তৈরি হয়েছে। কেউ পাচ্ছেন বেতন, কেউ পাচ্ছেন মজুরি। এমনকি কেউ কেউ পাচ্ছেন মুনাফার অংশ। এর ফলে শ্রমিকশ্রেণির মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেলেও, উৎপাদনব্যবস্থায় তাদের কারোরই কোনো মালিকানা, কর্তৃত্ব বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই। আবার কোথাও কোথাও শ্রমজীবীরা সোস্যাল সলিডারিটি সেক্টরের অধীনে যৌথ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে। ফলে শ্রমিকশ্রেণির ভেতরেই আয় ও সম্পদের যথেষ্ট তারতম্য তৈরি হয়েছে। মার্ক্স যেমন ভেবেছিলেন বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের অধীনে দুনিয়ার সব শ্রমিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হবে, তেমন সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা অটুট ঐক্য আগের মতো সহজে আর তৈরি হচ্ছে না।

তৃতীয়ত, পুঁজির আবর্তন চক্র এখন আরও বেশি করে জাতীয় পরিসীমা অতিক্রম করে বৈশ্বিক শ্রম বিভাজনের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু এই পুঁজির নিয়ন্ত্রণাধীন শ্রম বিভাজন আঞ্চলিকভাবে বৈষম্যপূর্ণ এক শ্রম বিভাজন, কারণ এখানে পুঁজির গতির অধিকার অসীম অথচ শ্রমের গতির অধিকার বেশ সীমিত। ফলে পুঁজি অনায়াসে সস্তা শ্রমের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য নিজের বাসা থেকে দুনিয়ার যেকোনো প্রান্তে ছুটে যেতে পারছে। অন্যদিকে উদ্বৃত্ত শ্রম বিভিন্ন অঞ্চলে বন্দী এবং পুঁজির সঙ্গে যুক্ত হতে না পেরে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করছে। আর যদিও কখনোবা সুযোগ পেয়ে পুঁজির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তা হচ্ছে খুবই প্রতিকূল প্রতিযোগিতার শর্তে। অন্যদিকে, আগে থেকে প্রান্তের রাজ্যগুলোতে অবস্থিত জাতীয় শিল্প পুঁজির সঙ্গে বাইরে থেকে নতুন ছুটে আসা পুঁজির দ্বন্দ্বও কোথাও কোথাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। উন্মুক্ত পুঁজিবাদী বাজারব্যবস্থায় তাই আঞ্চলিক বৈষম্য ও অনিশ্চয়তা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চতুর্থত, একটি অসম বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া চলছে। একদিকে কোথাও কোথাও আঞ্চলিক বৈষম্যের সঙ্গে সঙ্গে অভ্যন্তরীণ শ্রেণিবৈষম্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে। অন্যদিকে আবার এরই পাশাপাশি শ্রমজীবী অধঃস্তন অ-মালিক শ্রেণির সদস্যদের মধ্যে তাদের শাসক কর্তৃক নানা ধরনের সংস্কারের প্রকোপ এবং সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পেয়েছে। মৌলিক পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার বিপ্লবী পরিবর্তন না করেও বিশ্ব শ্রমজীবীদের একটি বড় অংশ বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের প্রাক পুঁজিবাদী ও অনুন্নত

পুঁজিবাদী দেশগুলোর জনগণ বৈশ্বিক পুঁজিবাদের ভেতরে থেকেই আপওয়ার্ড মোবিলিটির কোনো না কোনো স্পেস খুঁজে বের করে নিচ্ছেন। হতে পারে সেটা বিদেশি পুঁজির ও প্রযুক্তির আগমন। হতে পারে সেটা প্রবাসে গমন। হতে পারে সেটা একটা শ্রমঘন রপ্তানি শিল্পের অভ্যুদয়। কোথাও কোথাও নিচ থেকে উঠে তৈরি হচ্ছে নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি। অর্থাৎ পুঁজিবাদ মানেই স্থবিরতা-সংকট—এরূপ সরল চিন্তার কোনো অবকাশ নেই। তবে এসব সুযোগ-সুবিধা-সংস্কারের স্কোপ স্থান-কাল-পাত্রভেদে একেক অঞ্চলে একেক মাত্রায় বিদ্যমান। এই কারণে এই বৈশ্বিক বিকাশ সুষম নয়।

মার্ক্সবাদীদের আত্মজিজ্ঞাসা

মার্ক্সবাদীরা আজ এক সন্ধিক্ষণে উপস্থিত। একবিংশ শতকে তাদের সামনে পুঁজিবাদের সংকট নিয়ে যত না প্রশ্ন, তার চেয়ে অনেক বড় প্রশ্ন সমাজতন্ত্রের কার্যকারিতা নিয়ে। তাদের মধ্যে যারা হতাশ তাদের বক্তব্য হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপে তো সমাজতন্ত্র বিলুপ্তই হয়ে গেল। তাহলে কি এখন বলতে হবে সমাজতন্ত্র পরাজিত হয়েছে? পুঁজিবাদই কি ইতিহাসের শেষ কথা? এদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করতে ও বলতে শুরু করেছেন 'সমগ্র জীবনটা কি আমরা বৃথাই সমাজতন্ত্রের পেছনে ছুটলাম?'

উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর জবাবদানের সময় শুধু বর্তমান মুহূর্তের পরিস্থিতি বা ব্যক্তিগত জীবনের হতাশার বা বিশ্বাসভঙ্গের বেদনা দ্বারা পরিচালিত হলে সেটা হবে কমিউনিস্টদের জন্য খুবই দুঃখজনক। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এটুকু ইতিহাসচেতনা অবশ্যই রাখতে হবে যে 'সমাজতন্ত্রের' পরাজয় মানেই পুঁজিবাদের বিজয় নয়। এ কথাও মনে রাখা দরকার যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপে সমাজতন্ত্রের যে বিপর্যয়, সেখানেই ইতিহাস থেমে নেই। আবার পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদই বিশ্ব ইতিহাসের শেষ কথা হতে পারে না।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের আশু 'দীপ্তি' দেখে কমিউনিস্টদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। যেকোনো শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শ্রমজীবী শোষিত জনগণ যত দিন আছেন তত দিন তাদের উদ্বৃত্ত মূল্য চুরির ব্যাপারটি থাকবে। হতে পারে কোথাও তা নগ্নভাবে উচ্চহারে করা হয়, কোথাও তা রেখেঢেকে নিম্নহারে করা হয়। কিন্তু কম-বেশির প্রশ্ন নয়, যত দিন শোষণ ও অন্যায় থাকবে তত দিন তার বিরুদ্ধে শোষিতদের ন্যায়ের সংগ্রাম চলতে থাকবে। তত দিন কমিউনিজমের ও কমিউনিস্টদের ইচ্ছানিরপেক্ষ সামাজিক বাস্তব ভিত্তি থাকবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে—এই কঠিন সংগ্রামে সে নিজে ব্যক্তিগতভাবে শামিল হবে, নাকি একান্ত ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধিকেই জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করবে।

অর্থনৈতিক অবস্থানের কারণে শ্রমজীবী শোষিতরাই এই কঠিন পথের প্রধান যাত্রী হবেন। কমিউনিস্টদের তাই স্বাভাবিক সমর্থন ভিত্তি হবে 'শ্রমজীবী শোষিত জনগণ'। অন্য শ্রেণির লোক, যে পরিমাণ যৌথ স্বার্থের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হবেন, সে পরিমাণে তাঁরা হবেন কমিউনিস্টদের সহযাত্রী, মিত্র বা সহানুভূতিশীল সমর্থক। সব বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের আজ ঠিক করতে হবে, তারা কি তাদের পুরোনো ঐতিহাসিক প্রকল্পের ভুল-ভ্রান্তি, সাফল্য-ব্যর্থতা, শৌর্য-বীর্য, হাসি-কান্নায় ভরপুর অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পরিত্যাগ করবেন এবং পুঁজিবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন, নাকি পুরোনো ঐতিহ্যকে ধারণ করেই তাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যাবেন। বিজ্ঞানের জগতে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন যেমন নিউটনীয় পদার্থবিদ্যাকে ধারণ করেই তাকে অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ইতিহাস প্রমাণ করে যে বর্তমান যুগের নতুন সত্য অতীতের পুরোনো সত্যকে কখনোই পুরোপুরি নস্যাৎ করে দেয় না। এ প্রসঙ্গে *অ্যান্টি-ডুরিং* গ্রন্থে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসের প্রদত্ত একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরছি। এঙ্গেলস লিখেছেন,

> *'বয়েলের সুপরিচিত সূত্রটি দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক। এই সূত্র অনুযায়ী তাপের পরিমাণ যদি সমান থাকে তাহলে একটি গ্যাসের পরিমাণ তার চাপের পরিমাণের ভিত্তিতে বিপরীতক্রমে পরিবর্তন হবে। রেনলট, দেখলেন, এই সূত্রটি কয়েকটি ক্ষেত্রে কর্যকর হয় না। রেনলট যদি আমাদের দার্শনিকের মতো বাস্তবতার দার্শনিক হতেন তাহলে তাঁকে বলতে হতো : বয়েলের সূত্র পরিবর্তনীয় এবং সূত্রটি সত্য নয়। সূত্রটি মিথ্যা। কিন্তু তেমন সিদ্ধান্ত দ্বারা তিনি বয়েলের সূত্রে যতটা 'অসত্য' আছে তার চেয়ে অনেক বড় এক অসত্যে পতিত হতেন। তাঁর নিজের সত্য বিন্দুটি মিথ্যার বালুকা-স্তূপে তলিয়ে যেত। তাহলে তাঁর মূল সঠিক সিদ্ধান্তটিকে তিনি এমন ভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করতেন, যার তুলনাতে বয়েলের সূত্রে যে বিন্দু পরিমাণ অসত্য রয়েছে সেই অসত্যসহ বয়েলের সূত্রটি সত্য বলে বোধ হতো। কিন্তু রেনলট তা করেননি। কারণ তিনি একজন বিজ্ঞানী। তাই তিনি এসব শিশুসুলভ কাজে ব্যস্ত না থেকে তাঁর গবেষণা নিয়ে অগ্রসর হন এবং পরিশেষে এই সত্য আবিষ্কার করেন যে বয়েলের সূত্র মোটামুটি সঠিক। কিন্তু যে গ্যাসকে চাপের মাধ্যমে তরল করা যায় (অর্থাৎ চাপের যে বিন্দুতে গ্যাস তরল হতে শুরু করে) সে ক্ষেত্রে সূত্রটি প্রযোজ্য থাকে না। কাজেই একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে বয়েলের সূত্রের সঠিকতা প্রমাণিত হলো। কিন্তু সেই সীমার মধ্যে সূত্রটিকে কি চরম এবং অন্তিমভাবে সত্য বলা চলে? কোনো পদার্থবিজ্ঞানীই এমন কথা বলবেন না। তাঁর কথা হবে, চাপ এবং তাপের কিছু সীমার মধ্যে এবং কতিপয় গ্যাসের ক্ষেত্রে সূত্রটি ঠিক। এবং এভাবে অধিকতর নির্দিষ্ট সীমার ক্ষেত্রেও তিনি ভবিষ্যৎ গবেষণার ভিত্তিতে এর অধিকতর সীমাবদ্ধতা এবং নতুনতর সূত্র তৈরির সম্ভাবনাকে নাকচ করে দেবেন না।'* (দেখুন সরদার ফজলুল করিম অনূদিত, অ্যান্টি-ডুরিং, পৃ-১২২)

কমিউনিস্টরা যে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শের উত্তরসূরি তাকে আজ এঙ্গেলসের উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গি বা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পুনরায় যাচাই করে মার্ক্সবাদকে গ্রহণ করতে হবে। 'অতীতের সবকিছুই ভুল'—এ রকম নৈরাজ্যবাদী

নীতির চূড়ান্ত পরিণতি হবে বিলুপ্তি। এ ধরনের পথে বিলুপ্তি হবে অপেক্ষাকৃত দ্রুত ছিন্নভিন্ন হয়ে পচনের মাধ্যমে বিলুপ্তি। আবার 'অতীতের সবকিছুই ঠিক'—এই দ্বিতীয় পথেরও পরিণতি হবে বিলুপ্তি। এই পথে বিলুপ্তি আসবে ধীরে ধীরে, প্রথমে মৃত্যু এবং পরে মমি বা ফসিলে পরিণত হয়ে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি ও আশা করি বামপন্থী ও কমিউনিস্টরা বিলুপ্ত হবেন না, বরং সৃজনশীলভাবে বিকশিত, নবায়িত ও পুনর্জাগরিত হবেন।

টমাস পিকেটি : এ যুগের 'আধুনিক মার্ক্স?'

এবার পিকেটির আলোচনায় আসা যাক। আমার বর্তমান লেখার শিরোনামের প্রথমাংশ হচ্ছে 'একবিংশ শতকে পুঁজি'। ঠিক এই নামে ফরাসি অর্থনীতিবিদ টমাস পিকেটির একটি 'বেস্ট সেলার' (Best Seller) গ্রন্থ আছে। ৭০০ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি *ক্যাপিটালের* প্রচ্ছদের আদলে প্রথম প্রকাশিত হয় ফরাসি ভাষায় ২০১৪ সালের মার্চ মাসে। এরপর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সেন্টার ফর ইউরোপিয়ান স্টাডিজ'-এর সঙ্গে জড়িত আরথার গোল্ড হ্যামারকে পিকেটি এটি অনুবাদের প্রস্তাব দেন। তত দিনে এই তরুণ ফরাসি গবেষকের এই শ্রমসাধ্য (১৯৯৮-২০১৩) এক যুগের অসাধারণ কাজটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষগুলোতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করেছে। একসময় হার্ভার্ডে অনুষ্ঠিত সেমিনারের পরে পিকেটির দেওয়া এই অনুবাদের প্রস্তাবে গোল্ড হ্যামার সানন্দে সম্মতি দেন। উল্লেখ্য যে গোল্ড হ্যামার একজন পেশাদার অনুবাদক, যাকে 'ফ্রেঞ্চ অ্যামেরিকান' ফাউন্ডেশন এ যাবৎ তাঁর অনুবাদকর্মের জন্য চার-চারবার পুরস্কৃত করেছে। সুতরাং মাতৃভাষায় প্রণীত একটি মহৎ সময়োচিত কর্ম সুচারুভাবে ইংরেজি ভাষায় অনূদিত হয়ে ২০১৪ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা পৃথিবীজুড়ে বিপুল সাড়া তোলে। অল্প কয়েক মাসের মধ্যে ৭০০ পৃষ্ঠার এই বেস্ট সেলার প্রায় তিন লাখ কপি বিক্রি হয়ে যায়। তবে এর পাঠক প্রধানত উন্নত পুঁজিবাদী দেশেই বেশি ছিল। পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা অধ্যাপকেরা এর প্রশংসনীয় ও কখনো কখনো তীব্র সমালোচনামূলক পর্যালোচনা লিখতে শুরু করেন। আমেরিকার *নিউইয়র্ক টাইমস*, ইংল্যান্ডের *গার্ডিয়ান* এবং সুপরিচিত রক্ষণশীল পত্রিকা *দ্য ইকোনমিস্ট*-এ পক্ষে-বিপক্ষে প্রচুর মতামত প্রকাশিত হতে শুরু করে। এই প্রখ্যাত মতামত জ্ঞাপনকারীদের মধ্যে একদিকে যেমন আছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতির অধ্যাপক পল ক্রুগম্যান, তেমনি আরেক প্রান্তে আছেন বিশ্ববিখ্যাত ধনী উদ্যোক্তা বিল গেটস। বামপন্থী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ প্রভাত পাটনায়েকও এই বইয়ের একটি বিস্তৃত সমালোচনা করেছেন। বিশ্বের অন্যতম রক্ষণশীল ধনবাদের প্রবক্তা *দ্য ইকোনমিস্ট* পত্রিকার

৪ মে ২০১৪ সালের সংখ্যায় যে মন্তব্যটি প্রকাশিত হয় তাতে দাবি করা হয় যে পিকেটি হচ্ছেন 'আধুনিক কার্ল মার্ক্স'।

আসলে ১৯৯০ সালে বার্লিন প্রাচীরের পতনের পর উন্নত দেশগুলোতে পুঁজিবাদের পক্ষে যে 'উচ্ছ্বাস' উঠেছিল, পিকেটির বই তাতে একটি প্রবল কার্যকর আঘাত হানতে সক্ষম হয়। অবস্থাটি বোঝার জন্য ইকোনমিস্টের মন্তব্যের পুরো উদ্ধৃতিটি আমি নিচে তুলে ধরলাম,

> *'It is the economics book taking the world by storm. 'Capital in the twenty first century' written by a French Economist was published in French last year and in March of this year. The English version quickly became an unlikely best seller, has prompted a broad and energetic debate on the book's subject: the outlook for global inequality. Some reckon it heralds or may itself cause a pronounced shift in the focus of economic policy, toward distributional questions. This newspaper has hailed Mr. Piketty as 'The Modern Marx' (Karl that is). But what is it all about?'* [Economist, 4th May, 2014]
>
> *'এটি অর্থনীতির একটি বই যা সারা পৃথিবীতে ঝড় তুলেছে। 'একবিংশ শতকে পুঁজি' একজন ফরাসি অর্থনীতিবিদ কর্তৃক লিখিত। এটি গত বছর ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয় এবং এ বছর মার্চ মাসে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। বইটির ইংরেজি অপ্রত্যাশিতভাবে দ্রুত 'সর্বাধিক বিক্রীত' বইয়ে (Best Seller) পরিণত হয়েছে। বইটির বিষয়বস্তু 'বৈশ্বিক বৈষম্যের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি' নিয়ে একটি উদ্দীপ্ত ও বিস্তৃত বিতর্কের সূচনা করেছে অথবা অন্যভাবে বলা যায় অর্থনৈতিক নীতিমালাসংক্রান্ত আলোচনার মনোযোগবিন্দুকে পুনরায় বণ্টনের ইস্যুতে ফিরিয়ে এনেছে। এই পত্রিকা জনাব পিকেটিকে 'আধুনিক যুগের মার্ক্স' (অর্থাৎ কার্ল) হিসেবে আবাহন করেছে। কিন্তু এত সবকিছু কিসের জন্য?'* [ইকোনমিস্ট, ৪ মে, ২০১৪]

এই বইয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য চয়ন সুদূর ইতিহাসের গভীরে দৃষ্টিপাত—প্রায় আড়াই শতাব্দীব্যাপী (১৭৭০-২০১০) আয় ও সম্পদের গতিপ্রকৃতির সুবিপুল তথ্যনিষ্ঠ চিত্র প্রণয়ন। পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রে 'পুঁজির জন্ম শৈশব বিকাশ, সর্বশেষ বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিণতি নিয়ে এমন একটি মহাকাব্যিক প্রক্ষেপণ এর আগে মার্ক্স ছাড়া কেউই করার চেষ্টা করেননি।' নয়া-ধ্রুপদি স্কুলের একজন অর্থনীতিবিদ যখন সংজ্ঞাগত সীমাবদ্ধতাসহই এটা করলেন, তখন তা প্রচলিত নয়া ধ্রুপদি অর্থনীতি এবং তার চেয়েও অধিকতর রক্ষণশীল নব্য উদারবাদী তথাকথিত 'মুক্ত বাজার অর্থনীতির' মর্মমূলে গিয়ে আঘাত হেনে তাকে অবশ করে দিল। একই সঙ্গে তা উত্তর আধুনিকবাদের মহা আখ্যানবিরোধী অবস্থানকেও প্রবল একটি ধাক্কা দিতে সক্ষম হয়েছে। এতকাল নব্য ধ্রুপদি অর্থনীতি বলে এসেছিল যে আয় বা সম্পদ 'বৈষম্য' পুঁজির বিকাশের জন্মলগ্নে একটি স্বাভাবিক বিষয় এবং পুঁজিবাদী উন্নয়ন বা শিল্পায়নের অনিবার্য অনুষঙ্গ, কারণ প্রথম দিকে শ্রম সরবরাহ থাকে প্রচুর এবং পুঁজি থাকে

আপেক্ষিকভাবে দুষ্প্রাপ্য—তাই শ্রমের দাম স্বাভাবিকভাবেই হবে কম এবং পুঁজির 'রেট অব রিটার্ন' বা 'প্রাপ্তি হার' হবে বেশি। এটাই বাজারের চাহিদা-সরবরাহের প্রাকৃতিক স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। তাই শৈশবে পুঁজির বিকাশ ঘটে সংযোজিত মূল্যের বড় অংশটি গ্রাস ও বিনিয়োগের মাধ্যমে। শ্রম অঢেল থাকবে যত দিন তত দিন বাজারের নিয়মানুযায়ী শ্রমের প্রকৃত মজুরি নিম্নমাত্রায় স্থবির হয়ে থাকবে শ্রমের পুরুৎপাদন ব্যয় বা শ্রমের ভরণপোষণ খরচটুকুই শুধু শ্রমিক পাবে। এই পর্যায়ে পুঁজি ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়লেও সেই বাড়তি উৎপাদনশীলতার বেশির ভাগ বা পুরো ফলই পুঁজিপতিদের পকেটেই জমা হতে থাকবে। তবে তাতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই, তার একটি দীর্ঘমেয়াদি সুফল আছে। কারণ পুঁজিপতিরা ধনী হওয়ায় তাদের সঞ্চয় হার হবে বেশি এবং তারাই মুনাফার প্রণোদনায় নিয়ত তাদের বাড়তি সঞ্চয় উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করে যাবে। এই সুবাদেই শেষ পর্যন্ত একসময় গ্রাম থেকে শ্রম সরবরাহের উৎস শুকিয়ে যাবে এবং গ্রামে মজুরি বাড়তে শুরু করবে এবং তখন আরও বিকাশের জন্য পুঁজির আরও শ্রমের প্রয়োজন হলে শহরে মজুরি না বাড়িয়ে পুঁজিপতির আর উপায় থাকবে না। এই নতুন পর্যায়ে যখন সমাজে পুঁজি আর দুষ্প্রাপ্য নয় শ্রমই দুষ্প্রাপ্য, তখন পুঁজির আয়ের তুলনায় শ্রমের আয়ের অংশ (মূল্য সংযোজনে) নতুন করে বাড়তে শুরু করবে এবং পুঁজির 'প্রাপ্তিহার' ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনশীলতা বিধি অনুযায়ী আবার কমতে শুরু করবে। এই সমগ্র বিবর্তনটি ঘটবে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক বিবর্তনের নিয়ম অনুযায়ী। তাই অনিবার্য বৈষম্য বৃদ্ধি পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক উন্নতির কারণেই অনিবার্যভাবে শেষাবধি বৈষম্য হ্রাসে পরিণত হবে। সুতরাং সাময়িক বৈষম্য বৃদ্ধি নিয়ে দুশ্চিন্তার তেমন কিছু নেই। এ হচ্ছে উন্নয়নের গর্ভযন্ত্রণামাত্র।

ঠান্ডা যুদ্ধের যুগে পুঁজিপতিদের জন্য এ তত্ত্বটি ছিল খুবই গ্রহণযোগ্য এক তত্ত্ব। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পুঁজিবাদী উন্নয়নের জন্য এই তত্ত্বকে তারা তখন কাজে লাগান প্রবল উৎসাহে। ১৯৫৫ সালে এই তত্ত্ব আবিষ্কার করে আমেরিকার জাতীয় আয় ও তার বণ্টনের উপাত্ত ঘেঁটে তা চমৎকারভাবে প্রমাণ করেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ সাইমন কুজনেৎস। এই কাজের জন্য তাঁকে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হয়। তারপর থেকে আয় ও সম্পদবৈষম্য দিয়ে কথা উঠলেই অর্থনীতিবিদদের মূলধারার সদস্যরা বলতে থাকেন এটি হচ্ছে একটি 'প্রয়োজনীয় মন্দ কাজ' কিন্তু কেউই এই প্রশ্ন তখন তোলেননি বা তুলতে ভুলে যান যে :

১. অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে আয়বৈষম্য যে কমার কথা তা আসলেই কি সত্য? ১৯৫৫ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত যে তথ্য নিয়ে কুজনেৎস আমেরিকার ক্ষেত্রে এটি দেখিয়েছিলেন (যে তথ্যের ভিত্তিতে অর্থনীতির টেক্সট বইয়ে 'কুজনেৎস কার্ভ' বা

বেল কার্ভের বা 'ইনভার্টেড ইউ' চিত্রের উদ্ভব) তা কি আমেরিকান-ইউরোপীয় পুঁজিবাদের একটি অস্বাভাবিক ব্যতিক্রমী সাময়িক পর্যায়, নাকি আসলেই তা স্বাভাবিক পুঁজিবাদের স্বাভাবিক দীর্ঘমেয়াদি বিধি?

এই অত্যন্ত সহজ-সরল সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক প্রশ্নটি টমাস পিকেটি তাঁর গ্রন্থে উত্থাপন করেছেন। তারপর তিনি নিজেই এর উত্তরটি যে ভাষায় তুলে ধরেছেন তা আমি হুবহু উদ্ধৃত করছি :

> *'Nevertheless, the magical Kuznets curve theory was formulated in large part for the wrong reasons and its emperical underpinnengs were extremely fragile. The sharp reduction in income inequality that we observe in almost all the rich countries between 1914 and 1945 was due above all to the world wars and the violent economic and political shocks they entailed (especially for people with large fortunes). It had little to do with the tranquil process of intersectoral mobility described by Kuznets.'* [Thomas Piketty, 2014, P-14]
>
> *'এতদ্‌সত্ত্বেও জাদুকরি কুজনেৎস কার্ভটি প্রণীত হয়েছিল বহুলাংশে ভুল যুক্তির ওপর ভিত্তি করে এবং এর তথ্যগত মূল ভিত্তিটিও ছিল খুবই ভঙ্গুর। ১৯১৪ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত আমরা প্রায় সব ধনী দেশেই বৈষম্যের যে তীক্ষ্ণ হ্রাসটি দেখতে পাই তার অন্যতম কারণটি ছিল বিশ্বযুদ্ধসমূহ এবং রাজনৈতিক অভিঘাত (বিশেষত বিশাল ভাগ্যের অধিকারী লোকজনদের ওপর)। এর সঙ্গে কুজনেৎস বর্ণিত শান্তিপূর্ণ আন্ত খাত গতিশীলতার সম্পর্ক ছিল খুবই নগণ্য।'* (টমাস পিকেটি, ২০১৪, পৃ-১৪)

পিকেটি কুজনেৎসকে সমালোচনা করার পাশাপাশি বলতে চেয়েছেন যে মার্ক্স ছিলেন ঊনবিংশ শতকের গবেষক। সেই সময় মার্ক্স পুঁজির শৈশব ও বিকাশ (শিল্প বিপ্লবের যুগ) লক্ষ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে পুঁজির পরবর্তী অনিবার্যতা হচ্ছে আয় ও সম্পদের আপেক্ষিক বৈষম্য বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংকটের ঘনীভবন এবং অবশেষে বিপ্লব। সেটাও কিন্তু অনেকাংশে সত্য হয়নি। যদিও এ ধরনের চিন্তা মোটামুটিভাবে তখনকার জন্য বাস্তবভিত্তিকই ছিল। কিন্তু মার্ক্স যেই নতুন বাস্তবতা দেখে যেতে পারেননি, সেটা হচ্ছে দুটি বিশ্বযুদ্ধ এবং বিশ্বযুদ্ধের পর রাজনৈতিকভাবে অভিজ্ঞ বুর্জোয়া শাসকশ্রেণির পরবর্তী রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো। সেসবের অভিঘাতে পুঁজি যে সাময়িকভাবে তখন নবজীবনপ্রাপ্ত হতে পারে সে সম্ভাবনা স্বাভাবিকভাবেই মার্ক্সের নজরে আসেনি এবং আসা হয়তো সম্ভবও ছিল না।

অন্যদিকে কুজনেৎসের অনুসারীরা পুঁজির শৈশবকালীন সংকটকে অতীত ইতিহাস হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে দাবি করেছেন যে পরবর্তী সময়ে পুঁজির বা সম্পদের সাময়িক বণ্টনবৈষম্য হ্রাসই হচ্ছে পুঁজির বিকাশের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তথ্য অনুযায়ী পুঁজিবাদী দেশগুলোতে ১৯১৩ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত আয় ও সম্পদবৈষম্য হ্রাস পেয়ে অনেক দিন নিচুমাত্রায় থাকলেও ১৯৭০-এর পর থেকে

তা পুনরায় অস্বাভাবিক গতিতে বাড়তে থাকে এবং ২০১০ সাল নাগাদ তা আবার সেই ঊনবিংশ শতকের অসহনীয় পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। তাই পিকেটির মতে, ১৯১৪-১৯৪৫-এর বর্ধিষ্ণু পুঁজিবাদের সাময়িক সাফল্য দেখে মার্ক্সকে প্রত্যাখ্যানের কোনো কারণ নেই। সত্য বলতে হলে আমাদের বলা উচিত যে মার্ক্সের চিহ্নিত পথেই ১৯৭০-এর পর পুঁজির বিকাশ আবার শুরু হয়েছে। যা এখন ২০১০ সাল নাগাদ গণতন্ত্র এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য পুনরায় হুমকিতে পরিণত হয়েছে। পিকেটির এই সত্তর-পরবর্তী নতুন তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণটি তাঁর গ্রন্থের সূচনা বক্তব্যেই চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। পিকেটির গ্রন্থের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়টির শিরোনাম হচ্ছে :

'From Marx to Kuznets or Apocalypse to Fairy Tale'
('মার্ক্স থেকে কুজনেৎস অথবা কেয়ামত থেকে রূপকথা')

বোঝা যাচ্ছে মার্ক্সের বিশ্লেষণে যদি পুঁজিবাদের চেহারা হয় 'কেয়ামতের' মতো, তাহলে মূলধারার অর্থনীতিবিদেরা কুজনেৎসের কার্ভকে আশ্রয় করে পুঁজিবাদ সম্পর্কে যে শান্তিপূর্ণ মসৃণ সুষম উন্নয়নের স্বপ্ন তুলে ধরেছেন তা হচ্ছে নেহাতই এক 'রূপকথা'র মতো। 'কেয়ামত' ও 'রূপকথা' উভয়কেই প্রত্যাখ্যান করে পিকেটি লিখেছেন :

'Turning from the nineteenth century analysis of Ricardo and Marx to the twentieth-century analysis of Simon Kuznets, we might say that economists no doubt overly developed taste for apocalyptic predictions, gave way to a similarly excessive fondness for fairy tales, or at any rate happy endings. According to Kuznet's theory income inequality would automatically decrease in advanced phases of capitalist development, regardless of economic policy choices or other differences between countries untill eventually it stabilized at an acceptable level.' [Thomas Piketty, P-11]
(ঊনবিংশ শতকে রিকার্ডো ও মার্ক্সের বিশ্লেষণ থেকে বিংশ শতকে কুজনেৎসের বিশ্লেষণের দিকে অর্থনীতিবিদেরা যখন ঝুঁকতে শুরু করলেন তখন তাদের জন্য 'পুঁজিবাদে কেয়ামত হবে' জাতীয় চরম ভবিষ্যদ্বাণীর বদলে একই রকম কায়দায় অত্যন্ত প্রিয় বিষয় হয়ে পড়ল কতিপয় রূপকথা বা একধরনের 'মধুরেণ সমাপয়েতের' গল্প। কুজনেৎসের তত্ত্ব অনুসারে, আয়বৈষম্য স্বতঃপ্রণোদিতভাবে উন্নত পুঁজিবাদী দেশে হ্রাস পাবে, তা সেসব দেশের অনুসৃতব্য অর্থনৈতিক নীতিমালা যাই হোক না কেন বা দেশে দেশে যে পার্থক্যই থাকুক না কেন। (তার মতে) ক্রমে ক্রমে আয়বৈষম্য (এসব দেশে) একটি গ্রহণযোগ্য মাত্রায় গিয়ে স্থিতিশীল হবে। [টমাস পিকেটি, পৃ. ১১])

কুজনেৎস সম্পর্কে পিকেটির যে অভিযোগ, প্রায় একই রকম অভিযোগ মার্ক্সের বিরুদ্ধেও। পুঁজিবাদী উৎপাদনপদ্ধতি সম্পর্কে মার্ক্স কথিত আপেক্ষিক ও চরম স্থবিরতার যেসব যুক্তি রয়েছে সেগুলোর আপেক্ষিকতা, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভরতা, সর্বোপরি অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী ব্যাখ্যা থেকে

সেগুলোকে মুক্ত করে দেখার প্রয়োজন তুলে ধরেছেন পিকেটি। তাঁর মতে, প্রযুক্তিগত বিপ্লবের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং তখন প্রবৃদ্ধির হারও বেড়ে যায়। তখন উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির ফল কতটুকু পুঁজির মালিকেরা পাবেন তা প্রথমত নির্ভর করবে পুঁজির প্রাপ্তিহার কত উঁচু তার ওপর। কিন্তু পুঁজিঘন অবস্থায় অতিরিক্ত মাত্রায় পুঁজির আবির্ভাবের কারণে পুঁজির লাভজনক বিনিয়োগক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে আসে এবং পুঁজির প্রান্তিক দক্ষতার হার কম থাকে। এর ওপর কল্যাণ পুঁজিবাদের নিয়মানুযায়ী রাষ্ট্র যদি পুঁজিপতিদের ওপর প্রগতিশীল ট্যাক্স নীতি প্রয়োগ করে, নানা যুদ্ধবিগ্রহের ফলে যদি সম্পদ ধ্বংস হয়ে যায়, উচ্চ জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে যদি প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম উত্তরাধিকারের সময় পুঁজিপতিদের রেখে দেওয়া সম্পদ খণ্ডীকরণের মাধ্যমে পুনর্বণ্টিত হয়, তাহলে স্বাভাবিক আয় ও সম্পদবৈষম্যের প্রবণতাটি নাও অগ্রসর হতে পারে। এই লাগামগুলোই হতে পারে পুঁজিবাদের সাময়িক রক্ষাকবচ। একটি সহজ গাণিতিক উদাহরণ দিয়ে পিকেটি দেখান যে পুঁজির ভাগ্যে জাতীয় আয়ের শেয়ার কতটুকু জুটবে তা নির্ভর করছে পুঁজির রেট অব রিটার্ন (r), জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হারের (g) এবং সঞ্চয়ের হার 's'-এর ওপর। তার প্রদত্ত মডেলে সমীকরণ দুটি হচ্ছে যথাক্রমে :

(১) $\alpha = r \times \beta$ (২) $\beta =$ $\quad\quad$ $\therefore \alpha = r \times$

যেখানে

ক. = জাতীয় আয়ে পুঁজির হিস্যা অর্থাৎ আলফা বেশি হওয়ার তাৎপর্য হচ্ছে জাতীয় আয়ে শ্রমের হিস্যা কম হবে অর্থাৎ আয় ও সম্পদবৈষম্য বৃদ্ধি পাবে। যেহেতু পুঁজিলব্ধ আয়ের বণ্টনবৈষম্য শ্রমলব্ধ আয়ের বণ্টনবৈষম্য মাত্রার চেয়ে অনেক উঁচু।

খ. r = পুঁজির প্রাপ্তি হার বা রেট অব রিটার্ন

গ. g = প্রবৃদ্ধির হার

ঘ. s = সঞ্চয়ের হার = মোট সঞ্চয় / মোট জাতীয় আয়

পিকেটি এই সহজ-সরল মডেলকে টেস্ট করার জন্য বহু বছর পরিশ্রম করে (প্রায় এক যুগ) সারা দুনিয়ার r এবং g-এর দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতার তথ্য সংগ্রহ করে তাদের গতিপ্রবণতার প্রক্ষেপণ করেছেন। নিচের চিত্রলেখটি পিকেটির তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে।

নিচের চিত্রটি থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাক শিল্প বিপ্লব যুগে (১৫০০-১৭০০ সাল) সাধারণভাবে সম্পদ থেকে আয় (r) ছিল বেশ উঁচুমাত্রায় স্থির, কিন্তু সেই তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার (g) ছিল তুলনামূলকভাবে বেশ নিচুমাত্রায় স্থির। এই অবস্থায় জাতীয় আয় বাড়বে কম এবং এর বেশির ভাগটাই নিয়ে নেবে সম্পত্তির মালিকশ্রেণি। তাই পিকেটির মডেল অনুসারে প্রাক শিল্প বিপ্লব যুগে আয় ও সম্পদবৈষম্য উচ্চমাত্রায় স্থির হয়ে বিরাজ করবে। শিল্প বিপ্লবের যুগে বা মার্ক্সের যুগে (১৭০০-১৮২০) চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে নতুন প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে পুঁজির প্রাপ্তিহার (r) তীক্ষ্ণভাবে বেড়েছে। পাশাপাশি জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধির হারও বেড়েছে। তবে r তুলনামূলকভাবে বেশি বাড়ায় এই সময় বৈষম্য উচ্চমাত্রায় স্থির না থেকে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময় শ্রমজীবীরা চোখের সামনে প্রবৃদ্ধি দেখছেন, কিন্তু তার কোনো অংশ তাদের কাছে আসছে না। ১৮২০-১৯১৩ এই সময়ও দেখা যাচ্ছে r সামান্য কমেছে এবং g বেশ বেড়েছে। এর অর্থ হচ্ছে শিল্প বিপ্লবের অগ্রযাত্রার গতি বেড়েছে কিন্তু তার ভাগ পাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পদের মালিকদের উচ্চ হার খুব সামান্যই হ্রাস পেয়েছে। এরপর ১৯১৩-১৯৫০ আমরা একটি অস্বাভাবিক চিত্র দেখি, যেখানে r দ্রুত নিচে নামছে কিন্তু তারপরও g না

Figure 1

AFTER-TAX RATE OF RETURN VS. GROWTH RATE AT THE WORLD LEVEL, FROM ANTIQUITY UNTIL 2100



The rate of return to capital (after tax and capital losses) fell below the growth rate during the twentieth century, and may again surpass it in the twenty-first century.

Sources and series: See piketty.pse.ens.fr/capital21c

কমে বেড়েই চলেছে এবং r-এর ওপরে চলে যাচ্ছে। এই অবস্থাটাই হচ্ছে শ্রমজীবীদের হিস্যা বৃদ্ধির সময় কিন্তু পিকেটি মনে করেন এটা হচ্ছে একধরনের ব্যতিক্রম, কারণ পুঁজিবাদের স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে r > g. পিকেটির চিত্র আরও দেখাচ্ছে যে একবিংশ শতকে r আবার বেড়ে যাবে পক্ষান্তরে প্রবৃদ্ধির হার বা g আরও হ্রাস পাবে। অর্থাৎ r ও g-এর ব্যবধান ক্রমাগত বাড়তে থাকবে। এর তাৎপর্য হচ্ছে পিকেটির মতে, ভবিষ্যতে পুঁজির আয় শেয়ার বাড়বে এবং তার ফলে সম্পদ ও আয় বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে, যদি না ১৯১৩-৫০ কালপর্বের মতো কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে।

অঙ্ক থেকে ইতিহাস : মার্ক্স সম্পর্কে পিকেটি

পিকেটি একদিকে যেমন কুজনেৎসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, অন্যদিকে মার্ক্সের 'চরম পরিণতি' বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণীকেও পুরোপুরি গ্রহণ করেননি। সেখানে নানা শর্ত আরোপ করে পিকেটি লিখেছেন :

> *'From the first to the sixth decade of the nineteenth century, workers wages stagnated at very low levels-close or even inferior to the eighteenth and previous centuries. This long phase of wage stagnation, which we deserve in Britain as well as in France, stands out all the more because economic growth was accelerating in this period. The capital share of national income-industrial profit, land rents and building rents-insofar as can be estimated with the imperfect sources available today increased considerably in both countries in the first half of the nineteenth century. It would decrease slightly in the final decades of the nineteenth century, as wages partly caught up with growth. The data we have assembled nevertheless reveal no structural decrease in inequality prior to World War I. What we see in the period between 1870-1914 is at best a stabilization of inequality at an extremely high level and in certain respects an endless inegalitarian spiral, marked in particular by increasing concentration of wealth. It is quite difficult to say where this trajectory would have led without the major economic and political shocks initiated by the war. With the aid of historical analysis and a little perspective we can now see those shocks as the only forces since the industrial revolution powerful enough to reduce inequality.* [Thomas Piketty, 1914,P-8]

পিকেটির এই বর্ণনা মার্ক্সের ক্যাপিটাল ও এঙ্গেলসের 'The conditions of working class in Britain'-এর বর্ণনার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যাচ্ছে। মার্ক্সের

এই বিশ্লেষণ ঊনবিংশ শতকের জন্য ঠিক হলেও বিংশ শতকের উন্নত পুঁজিবাদী সমাজে যে অনেক জায়গাতেই কার্যকর হয়নি, পিকেটির তথ্য সেটাও দাবি করে।

কিন্তু পিকেটি এটাও খেয়াল করেন যে ১৯১৪ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত কতকগুলো ব্যতিক্রমী ঘটনার ফলেই ঊনবিংশ শতকের এই ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের প্রবণতার লাগাম টেনে ধরা সম্ভব হয়েছিল। এই ব্যতিক্রমী ঘটনার মধ্যে প্রধান একটি উপাদান হচ্ছে যুদ্ধের মাধ্যমে বুর্জোয়াদের সম্পত্তির ধ্বংসপ্রাপ্তি। এ থেকে মনে হয় পিকেটি যুদ্ধের দ্বারা অতিরিক্ত পুঁজি ধ্বংস করার মাধ্যমে Capitalism-এর বৈষম্য কমানোর কথা বলছেন, যা অনেকটাই লেনিনের ভবিষ্যদ্বাণীর কাছাকাছি। সুতরাং সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদ দুটো বিশ্বযুদ্ধের মাধ্যমে যে নতুন জীবনীশক্তি পেয়েছিল তার ব্যাখ্যা মার্ক্সের মধ্যে তখনই পাওয়া না গেলেও তাঁর উপযুক্ত শিষ্য লেনিন এবং রোজা লুক্সেমবার্গের রচনায় আমরা তার অনেকটাই পেতে পারি। তদনুযায়ী যুদ্ধ যেমন একদিকে পুঁজিবাদকে নতুন জীবনীশক্তি দিয়েছিল, তেমনি বিশ্ব পুঁজিবাদের দুর্বল দুই গ্রন্থিতে বিষয়ীগত শর্ত (Subjective Condition) অনুকূল থাকায় একধরনের সমতা অভিমুখী বিপ্লবের জন্মও দিয়েছিল।

পিকেটি অবশ্য তাঁর গ্রন্থে যুদ্ধ ছাড়াও পুঁজিবাদের আরও কতিপয় বৈষম্য হ্রাসকারী সংস্কারবাদী প্রক্রিয়ার কথা বলেছেন, যা তাঁর মতে মার্ক্সের বর্ণিত পুঁজিবাদের ভয়াবহ পরিণতিকে ঠেকিয়ে দিয়েছে অথবা কিছুটা দীর্ঘায়িত করতে সক্ষম হয়েছে। মার্ক্সের 'অনিবার্য পতনের' বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে পিকেটির সুনির্দিষ্ট মন্তব্যটি আমি নিচে তুলে ধরছি :

> *'Marx's dark prophecy came no closer to being realized than Ricardo's. In the last third of the nineteenth century, wages finally began to increase. The improvement in the purchasing power of workers spread everywhere and this changed the situation radically, even if the extreme inequalities persisted and in some respects continued to increase until World War I, the communist revolution did indeed take place, but in the most backward country in Europe, Russia, where the Industrial Revolution had scarcely begun, where as the most advanced European countries explored other social democratic avenues-fortunately for their citizens. Like his predecessors Marx totally neglected the possibility of durable technological progress and steadily increasing productivity which is a force that can to some extent serve as a counter weight to the process of accumulation and concentration of private capital. He no doubt lacked the statistical data needed to refine his predictions.'* [Thomas Pikitty-P-10]

উদ্ধৃতি আর না বাড়িয়ে মার্ক্সের বিরুদ্ধে পিকেটির আরও যে কটি সামান্য অনুযোগ রয়েছে তা সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরছি :

ক. মার্ক্স ১৮৪৮ সালেই পুঁজিবাদের অভ্যন্তরীণ অসংগতি সম্পর্কে তত্ত্বগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে একধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। পরে যখন তিনি *পুঁজি* গ্রন্থ রচনা করতে যান তখন তার পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত তাকে পুঁজিবাদ সম্পর্কে 'অনিবার্য ধ্বংসের' মতো চরম অবস্থানের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

খ. মার্ক্স তাঁর আমলে তাঁর তত্ত্বগুলো যাচাইয়ের জন্য ব্যাপক পরিসংখ্যানও পাননি। তখন 'জাতীয় আয়', 'পুঁজির প্রাপ্তিহার', জাতীয় আয়ে পুঁজির ও শ্রমের হিস্যা, আয়বৈষম্য, সম্পদবৈষম্য ইত্যাদি সামষ্টিক চলকের পরিমাণ ও পরিসংখ্যানও মার্ক্সের পক্ষে বিচার করা সম্ভব হয়নি। হয় তখনো এগুলো পরিমিতই হয়নি অথবা পরিমিত হলেও তা মার্ক্সের নাগালে আসেনি।

পিকেটির তথ্য অবশ্য ১৯৭০-এর পর আবার দেখাচ্ছে যে পুঁজিবাদী সব উন্নত দেশেই মার্ক্সের প্রেতাত্মা পুনরায় ফিরে আসতে শুরু করেছে। বিশ্ব পুঁজিবাদের গড় বৈষম্য সাধারণভাবে অতি উচ্চ মাত্রায় উপনীত হলেও একেক দেশে বৈষম্যের সুনির্দিষ্ট পরিমাপটি একেক রকম। তাই এই সাধারণ সত্যের রকমফেরকে শুধু পুঁজিবাদের সাধারণ অর্থনৈতিক নিয়ম বা পুঁজির নৈর্ব্যক্তিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। পিকেটি নিজেই বলেছেন,

> *'As I explained earlier I began this work by collecting sources and establishing historical time series pertaining to distribution of income and wealth. As the book proceeds, I sometimes appeal to theory and to abstract models and concepts, but I try to do so sparingly and only to the extent that theory enhances our understanding of the changes we observe.'* [Thomas Piketty, 2014, P-33]

এ জন্য রক্ত-মাংসের পুঁজিবাদের বিকাশের মডেলে রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় পলিসি, শ্রেণিসংগ্রাম, পুঁজির বিশ্বায়ন মাত্রা ইত্যাদিকেও এযাবৎ অবহেলিত কিন্তু বর্তমানে যথেষ্ট প্রভাবশালী নির্ধারক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমরা যদি জীবন্ত গতিশীল সত্যকে বুঝতে চাই তাহলে আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখাকে (শুধু অর্থনীতি নয়) ব্যবহার করে অগ্রসর হতে হবে। পিকেটির বইয়েও এমনকি নানা ধরনের সাহিত্যের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়, বিশেষ করে মার্ক্সের প্রিয় ফরাসি লেখক বালজাকের একটি উপন্যাসকেও (বালজাক, ১৮৩৫) সেই যুগের সমাজচিত্র বর্ণনার জন্য খুবই সৃজনশীলভাবে তিনি ব্যবহার করেছেন।

আত্মস্বীকারোক্তিতে পিকেটি বলেছেন যে তাঁর ১৮ বছর বয়স হয়েছিল ১৯৮৯ সালে। সেটি ছিল ফরাসি বিপ্লবের দ্বিশতবার্ষিকী, একই সঙ্গে সেটি ছিল 'বার্লিন প্রাচীরের' পতনের বছর। এই অবস্থায় প্রথমে পিকেটি অন্য অনেক প্রতিভাবান অর্থনীতিবিদদের মতো 'আমেরিকাকেই' আদর্শ চাকরি ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু শিগগিরই তাঁর উপলব্ধি বদলাতে শুরু করে। ২২ বছর বয়সে তিনি আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার চাকরি নিয়েছিলেন, কিন্তু ২৫ বছর বয়সেই তিনি চাকরি ছেড়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সেই সময়ে তাঁর অনুভূতির বর্ণনা পাওয়া যাবে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে :

> *I did not find the work of US economists entirely convincing. To be sure they were all very intelligent, and I still have many friends from that period of my life. But something strange happened: I was only too aware of the fact that I knew nothing at all about the world's economic problems…… The truth is that economics should never have sought to divorce itself form other social sciences and can advance only in conjunction with them. The social sciences collectively know too little to waste time on foolish disciplinary squabble. If we are to progress in our understanding of the historical dynamics of wealth distribution and the structure of social classes, we must obviously take a pragmatic approach and avail ourselves of the methods of historians, sociologists and political scientists as well as economist. We must start with fundamental questions and try to answer them. Disciplinary disputes and turf wars are of little or no importance. In my mind this book is as much a work of history and economics.'* [Thomas Piketty, 2014 P-32-33]

উন্নত পুঁজিবাদের মধ্যে বৈচিত্র্য

পিকেটির হিসাব অনুযায়ী, 'স্ক্যান্ডিনেভীয় পুঁজিবাদী' দেশগুলো হচ্ছে 'স্বল্প বৈষম্যের পুঁজিবাদী দেশ'। ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলো হচ্ছে 'উচ্চ বৈষম্যের দেশ'। আর পিকেটির ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে, অন্তত যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বৈষম্য আরও তীব্রতর হবে। পাঠকদের সুবিধার জন্য আমি পিকেটির অসংখ্য তালিকা ও গ্রাফ থেকে মাত্র তিনটি তালিকা ও গ্রাফ নিচে তুলে ধরছি। ১ নম্বর তালিকায় প্রথমে দেখানো হয়েছে 'শ্রমলব্ধ আয়ে' বণ্টনবৈষম্যের চিত্র। ২ নম্বর তালিকায় দেখানো হয়েছে 'পুঁজির মালিকানার' বৈষম্য। ৩ নম্বর তালিকায় দেখানো হয়েছে উপরিউক্ত দুই ধরনের উৎসের আয় মিলিয়ে মোট আয়ের ক্ষেত্রে বিরাজমান বণ্টনবৈষম্য। তথ্যগুলো মূল গ্রন্থে যেভাবে উত্থাপিত হয়েছে হুবহু সেভাবেই আপাতত আমি এখানে উত্থাপন করছি।

তালিকা : ১

Inequality of Labor income across time and space

Share of different groups in total labor income	Low inequality (=Scandinavia, 1970s-1980s	Medium inequality (=Europe 2010)	High inequality (=US2010)	Very high inequality (=US 2030s)
The top 10% ('upper class')	20%	25%	35%	45%
Including the top 1% ('dominant class')	5%	7%	12%	17%
Including the next 9% ('well-to-do class')	15%	18%	23%	28%
The middle 40% ('middle class')	45%	45%	40%	35%
The bottom 50% ('lower class')	35%	30%	25%	20%
Corresponding Gini (synthetic inequality index)	0.9	0.26	0.36	0.46

Note: In societies where labor income inequality is relatively low (such as in Scandinavian countries in the 1970s-1980s), the top 10% most well paid receive about 20% of total labor income, the bottom 50% least well paid about 35%, the middle 40%. The corresponding Gini index (a synthetic inequality index with values from o to 1) is equal to 0.19. See the online technical appendix.

তালিকা: ২

Inequality of capital ownership across time and space

Share of different groups in total capital	Low inequality (never observed; ideal society?)	Medium inequality (=Scandinavia, 1970s-1980s)	Medium-high inequality (=Europe 2010)	High inequality (=US2010)	Very high inequality (=Europe 1910)
The top 10% ('upper class')	30%	50%	60%	70%	90%
Including the top 1% ('dominant class')	10%	20%	25%	35%	50%
Including the next 9% ('well-to-do class')	20%	30%	35%	35%	40%
The middle 40% ('middle class')	45%	40%	35%	25%	5%
The bottom 50% ('lower class')	25%	10%	5%	5%	5%
Corresponding Gini coefficient (synthetic inequality index)	0.33	0.58	0.67	0.73	0.85

Note: In societies 'medium' inequality of capital ownership (such as Scandinavian countries in the 1970s-1980s), the top 10% richest in wealth own about 50% of aggregate wealth, the bottom 50% poorest about 10% , and the middle 40% about 40%. The corresponding Gini coefficient is equal to 0.58. See the online technical appendix.

তালিকা: ৩

Inequality of total income (labor and capital) across time and space

Share of different groups in total capital income (labor + capital)	Low inequality (=Scandinavia, 1970s-1980s)	Medium inequality (=Europe 2010)	High inequality (=US 2010, Europe 1910)	Very high inequality (=US 2030?)
The top 10% ('upper class')	25%	35%	50%	60%
Including the top 1% ('dominant class')	7%	10%	20%	25%
Including the next 9% ('well-to- do class')	18%	30%	30%	35%
The middle 40% ('middle class')	45%	40%	30%	25%
The bottom 50% ('lower class')	30%	25%	20%	15%
Corresponding Gini coefficient (synthetic inequality index)	0.26	0.36	0.49	0.58

Note: In societies where the inequality of total income is relatively low (such as Scandinavian countries in the 1970s-1980s), the 10% highest incomes receive about 10% of total income, the 50% lowest incomes receive about 30%. The corresponding Gini coefficient is equal to 0.26. See the online technical appendix.

[Source: Thomas Piketty, 2014, P: 247-249]

তালিকাগুলো লক্ষ করলেই দেখা যাবে যে সারা বিশ্বকে এখানে বৈষম্যের মাত্রার বিচারে তিন ধরনের রাষ্ট্রপুঞ্জে বিভক্ত করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে সাধারণভাবে স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলোতে বৈষম্য মাত্রা সবদিক দিয়েই সবচেয়ে কম। সাধারণভাবে মধ্যম মাত্রার বৈষম্য বিরাজ করছে ইউরোপীয় দেশগুলোতে। আর উচ্চ মাত্রার বৈষম্য বিরাজ করছে আমেরিকাতে।

পিকেটির তুলে ধরা তিন ধরনের বৈষম্যের চিত্র আবার তিন রকম বিষয়ের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে :

শ্রমলব্ধ আয়, পুঁজির মালিকানা এবং মোট আয়। প্রথম তালিকায় রয়েছে শ্রমলব্ধ আয়ের বৈষম্যের চিত্র।

শ্রমলব্ধ আয়বৈষম্য হচ্ছে সাধারণ যুক্তিতে শ্রমের পরিমাণ বা গুণভিত্তিক (Meritocratic Inequality) বৈষম্য। এ ধরনের বৈষম্য হয়তো সাম্যবাদের নিম্ন পর্যায়ে মার্ক্সবাদীরাও একধরনের বুর্জোয়া অধিকার হিসেবে গ্রহণ করে নেবেন এবং সমাজতন্ত্রের নানা এক্সপেরিমেন্টের ব্যর্থতার পর এখন বিদ্যমান সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো প্রায় পুরোপুরিই গ্রহণ করেছেন বলে আমার ধারণা। যদিও ক্রুশ্চেভকে একসময় এ জন্য সংশোধনবাদের বদনামে ভুগতে হয়েছিল। তবে এ ক্ষেত্রেও দেশে দেশে, কালে কালে প্রচুর অতিরিক্ত এবং অন্যায় পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। সমাজের সর্বোচ্চ ১ শতাংশ শ্রমজীবী টেকনোক্র্যাটরা স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশে সত্তর-আশির দশকে মোট শ্রমলব্ধ জাতীয় আয়ের ৫ শতাংশ ভোগ করতেন। পিকেটির জন্য এটা গ্রহণযোগ্য বৈষম্য, ইউরোপে ২০১০ সালে এই অংশটি ভোগ করতেন ৭ শতাংশ। আমেরিকায় ২০১০ সালে এই অংশটি ভোগ করতেন ১২ শতাংশ এবং পিকেটির প্রক্ষেপণ অনুসারে ২০৩০ সালে আমেরিকায় এটি বেড়ে গিয়ে হবে ১৭ শতাংশ। পিকেটির তথ্য অনুযায়ী, উল্টো করে আমরা যদি শ্রমজীবীদের বাকি ৯৯ শতাংশের শ্রমলব্ধ আয়ের শেয়ার মাপি তাহলে দেখব স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশে ৯৯ শতাংশ পাচ্ছেন ৯৫ শতাংশ। ইউরোপে পাচ্ছেন ৯৩ শতাংশ। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে পাচ্ছে মাত্র ৮৮ শতাংশ। ২০৩০ সালে গিয়ে এই আমেরিকায় ৯৯ শতাংশ পাবেন আরও কম অর্থাৎ ৭৭ শতাংশ। পিকেটি প্রশ্ন করেছেন শ্রমলব্ধ আয়ের ক্ষেত্রে শেষোক্ত দেশে এ রকম উচ্চ বৈষম্য হচ্ছে কেন? একটা কারণ হতে পারে শিক্ষার অধিকারে বৈষম্য অর্থাৎ white collar worker বনাম brown collar worker-এর বৈষম্য। আরেকটা কারণ হতে পারে যারা বৃহৎ বহুজাতিক কোম্পানির সর্বোচ্চ ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছেন, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের উচ্চ বেতন নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আমাদের দেশেও ব্যক্তি খাতে উচ্চ ব্র্যাকেটভুক্তদের বেতনের অস্বাভাবিক উচ্চতা এই প্রবণতারই পরিচয় বহন করে বলে আমার ধারণা। তাদের বেতনের সঙ্গে তাদের শ্রমের পরিমাণ বা

গুণের সম্পর্ক খুবই দুর্বল। তবু কেউ ইচ্ছা করলে দক্ষতার দোহাই দিয়ে এই মাত্রার বৈষম্যকে ন্যায়সংগত (Justified) বা গ্রহণযোগ্য (Acceptable) বলে আখ্যায়িত করতে পারেন। পিকেটিও তা আংশিক মেনে নিয়েছেন এবং এ ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক ফরাসি বিপ্লবের পর প্রণীত মানবাধিকার সনদের থেকে একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেই কিন্তু তার এই গ্রন্থটি শুরু হয়েছে। এই গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনাম 'ভূমিকা'র পরই প্রদত্ত এই উদ্ধৃতিটি হচ্ছে :

'Social distinctions can be based on common utility'
(Declaration of the Rights of Man and the Citizen, article I, 1789)

অর্থাৎ সমাজকে যে ব্যক্তি বা নাগরিক যত বেশি উপকার প্রদান করবেন সমাজের কাছ থেকে সেই ব্যক্তি বা নাগরিকের তত বেশি মর্যাদা প্রাপ্য হবে। তবে পিকেটি বিশেষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ বেতনবৈষম্যকে অগ্রহণযোগ্য বলে অভিহিত করেছেন। অর্থাৎ এখানে অন্যায়প্রাপ্তি ঘটেছে বলে তার বিশ্বাস। বিশেষত যখন দেখা যাচ্ছে যে ওই সব উচ্চ বেতনভোগী ১ শতাংশ ব্যক্তি মোটা অঙ্কের পুঁজিরও মালিক হয়ে পড়েছেন। তাদের স্টক শেয়ারের বদৌলতে এবং তাদের অন্যান্য পুঁজিলব্ধ আয় এতে যুক্ত হওয়াতে এ ক্ষেত্রে সব মিলিয়ে আরও অনেক বেশি বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই শেষাবধি সমাজের সর্বোচ্চ এক শতাংশ পুঁজির মালিকানা এবং তথাকথিত স্বসংজ্ঞায়িত 'দক্ষতার' বা মানব পুঁজির মালিকানার অজুহাতে সমাজে অন্যায়ভাবে বিপুল মর্যাদার ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের দেশেও বর্তমানে আমরা দেখতে পাই সর্বোচ্চ টেকনোক্র্যাটদের প্রচুর মানব পুঁজি ও অন্যান্য পুঁজিও রয়েছে কিন্তু সেই সব পুঁজির একটি বড় অংশই উৎপাদনমূলক নয়—এর চরিত্র হচ্ছে রিয়াল এস্টেট, স্টক শেয়ার, পেনশন ফান্ড, জমি, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি ধরনের। এসব জায়গায় ঝুঁকি কম ও খাজনা আয়ের নিশ্চিত ব্যবস্থা সুরক্ষিত। তবে কেউ বলতে পারেন যে এগুলোও অপ্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে হয়তো ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে তা সর্বাংশে সত্য নয়। কারণ এখানে ব্যাংকে প্রচুর অলস অর্থ রয়েছে এবং অনেক অর্থ অপঋণে পরিণত হয়েছে।

আলোচনা আর না বাড়িয়ে পিকেটির ২ ও ৩ নম্বর তালিকায় প্রদত্ত তথ্যাবলি এক সঙ্গে দেখলে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমাদের এই বিশ্বে আয়বৈষম্যের প্রধান জনক হচ্ছে পুঁজি এবং পুঁজিলব্ধ আয়ের বৈষম্য। এখানে পিকেটির অভিযোগ হচ্ছে এই পুঁজির বড় অংশটিই ব্যক্তিমালিকানা ও উত্তরাধিকারী ব্যবস্থার কারণে উপার্জিত আয় থেকে তৈরি হয়নি। বিশেষত প্রাচীন ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের প্রাথমিক প্রতিযোগিতামূলক যুগের পর থেকে তা উত্তরাধিকার প্রক্রিয়ায় এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে হস্তান্তরিত হচ্ছে মাত্র। তাই মানবাধিকারের

দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পিকেটি উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত পুঁজিলব্ধ আয়কে সমমাত্রায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেননি। পিকেটির মতে, সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী করব্যবস্থা না থাকলে বৈষম্য তাই Cumulative বৈষম্যে পরিণত হয়। তালিকাগুলো থেকে দেখা যাবে এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক শতাংশ স্ক্যান্ডিনেভীয়রা দেশে নিয়ে নেয় পুঁজির ২০ শতাংশ, ইউরোপে ১৯১০ সালে নিত ৯০ শতাংশ, এখন নেয় ২৫ শতাংশ এবং আমেরিকায় আগে নিত কম, তবে এখন নিচ্ছে ৩৫ শতাংশ। ভবিষ্যতে নেবে ৫০ শতাংশ।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৩ নম্বর তালিকায় শ্রমলব্ধ ও পুঁজিলব্ধ আয়ের সমন্বয়ে গঠিত তথ্য অনুসারে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশের অধীনে আয়ের পরিমাণ বা সামগ্রিক বৈষম্যের পরিমাণটি দাঁড়িয়েছে নিম্নরূপ। স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশে সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ পাচ্ছে ২৫ শতাংশ, ইউরোপে এই অংশটি বর্তমানে পাচ্ছে ৩৫ শতাংশ আর আমেরিকায় এই অংশটি পাচ্ছে ৫০ শতাংশ, যেটা অতীতে ইউরোপ ১৯১০ সালে পেত। অতএব ১৯১০ সালের ইউরোপের অনুরূপ ভয়াবহ অবস্থায় বর্তমানে আমেরিকা ফিরে গেছে। পিকেটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে ২০৩০ সালে এটি ৬০ শতাংশ হবে।

পিকেটির প্রদত্ত এসব তথ্য আমাদের আগাম সতর্কবাণী প্রদান করছে। এই সতর্কসংকেতটি হচ্ছে মূলত আমেরিকার প্রতি এবং তার দাবি হচ্ছে যে আমেরিকা ইতিমধ্যেই অগ্রহণযোগ্য এক বৈষম্য মাত্রায় উপনীত হয়েছে এবং তার গতিমুখও আরও বৈষম্য বৃদ্ধির দিকে। তার এ কথা সবাই গ্রহণ নাও করতে পারেন, তথ্য নিয়ে নানা প্রশ্নও থাকতে পারে কিন্তু যখন আমরা দেখি যে সেখানে ১ শতাংশের বিরুদ্ধে ৯৯ শতাংশের আন্দোলন হচ্ছে, যখন ওয়াল স্ট্রিট দখলের স্লোগান উঠতে শুরু করেছে তখন নিশ্চিতভাবেই আমাদের আরেকবার থমকে দাঁড়িয়ে ভাবতে হয় আমরা যাচ্ছি কোথায়? হয়তো এ জন্যই নোবেল বিজয়ী আমেরিকান অর্থনীতিবিদ পল ক্রুগম্যান সমাজতন্ত্র বা মার্ক্সের অনুসারী না হয়েও পিকেটির বইটির ভূয়সী প্রশংসা করে রায় দিয়েছেন, 'শুধু নিষ্ঠাবান তথ্য সংগ্রহের জন্যই পিকেটিকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত!'

পিকেটির সুপারিশ

এ কথা সহজেই অনুমেয় যে 'বৈষম্য' কমাতে হলে 'আয়বৈষম্য' এবং 'সম্পদ বা পুঁজির' মালিকানা বৈষম্য উভয়ই হ্রাস করতে হবে। যখনই শ্রমের উচ্চমূল্য প্রাপকেরা একই সঙ্গে প্রচুর সম্পদেরও মালিক হয়ে যান তখনই চরম বৈষম্যের উদ্ভব ঘটে। তবে অধিকাংশ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রেই 'আয়বৈষম্য'কে আক্রমণের জন্য প্রগতিশীল করব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়। সে ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও শ্রমলব্ধ

আয়কে তুলনামূলক বিশেষ ছাড়ও দেওয়ার বিধান থাকে। পিকেটি শ্রমলব্ধ আয় নিয়ে অত চিন্তিত নন, তাই পুঁজির বা সম্পদের ওপরই তিনি একটি বৈশ্বিক কর আরোপের প্রস্তাব করেছেন।

তাঁর মতে, এটি একটি 'ইউটোপিয়ান' কিন্তু 'ইউজফুল আইডিয়া'। পিকেটি লিখেছেন :

> *'Even if nothing resembling this ideal is put into practice in foreseeable future, it can serve as a worth while reference point, a standard aginst which alternative proposals can be measured.' (Thomas Piketty, 2014, P: 515)*

পিকেটির দ্বিতীয় পরামর্শ হচ্ছে একটি সামাজিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পুনর্নির্মাণ করা। এ জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও আধুনিকায়ন করতে হবে, সামাজিক রাষ্ট্রকে ব্যক্তিগতকরণ বা বিনিয়ন্ত্রণের নামে ভেঙে ফেলা চলবে না। মাথাব্যথা হলে মাথা কাটা যে কোনো সমাধান নয়, এটি পিকেটি ভালোভাবেই অনুধাবন করেন। তবে পিকেটি বামপন্থীদের কেন্দ্রীভূত একচেটিয়া রাষ্ট্রীয় মালিকানাও সমর্থন করেন না।

পিকেটি মনে করেন তাঁর পছন্দনীয় সামাজিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্রকে 'অধিকার'ভিত্তিক দর্শন ও চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হতে হবে। পিকেটি 'পুনর্বণ্টন' শব্দের চেয়ে 'সার্বজনীন অধিকারের' ভাষাকে অধিক পছন্দ করেন। 'পুনর্বণ্টনের' নামে খুব ধনী লোকদের কাছ থেকে কিছু 'ভিক্ষা' সংগ্রহ করে বিক্ষুব্ধ মধ্যস্তরের সরব গোষ্ঠীগুলোকে কিছু দিয়ে শান্ত রাখার কৌশলকে পিকেটি সঠিক মনে করেন না। তাই বারবার তাঁর গ্রন্থে *'Patrimonial Middle Class'* (আনুকূল্য প্রাপ্ত মধ্যবিত্ত শ্রেণি) এর বিরুদ্ধে অনেক শক্ত মন্তব্য পাওয়া যায়। আনুকূল্য বণ্টনের বিপরীতে আধুনিক বণ্টনের দর্শন সম্পর্কে বলতে গিয়ে পিকেটি বলেছেন,

> *'Modern redistribution is built around a logic of rights and a principle of equal access to a certain numbers of goods deemed to be fundamental.' (Thomas Piketty, 2014, P: 479)*

তবে এই সার্বজনীন মানবাধিকারগুলো কী হবে, সেখানে রাজনৈতিক মানবাধিকার ও অর্থনৈতিক মানবাধিকারের ভারসাম্য কতটুকু রক্ষিত হবে এবং সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তরে কোন অধিকারের কতটুকু অগ্রাধিকার থাকবে এসব সূক্ষ্ম বিতর্কের কোনো সমাধান পিকেটির মধ্যে পাওয়া যাবে না। পিকেটির মতে, একটি সামাজিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার পথে প্রধান সূচক হচ্ছে কর/জিডিপি অনুপাত যেটি অনুন্নত দেশে খুবই কম। চীনে অনেক বেশি আর ইউরোপ-আমেরিকায় (স্ক্যান্ডিনেভীয় ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে) মাঝামাঝি। এই সূচকটি না বাড়িয়ে অনুন্নত দেশ বা উন্নত ধনী দেশগুলো কখনোই বৈষম্যও কমাতে পারবে

না এবং নাগরিকদের জন্যও সার্বজনীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করতে পারবে না। এদিক থেকে বোঝা যায় যে পিকেটি অমর্ত্য সেনের সঙ্গে একমত যে বাজারব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এবং এটা সম্ভব না হলে বৈষম্যবর্ধক একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি সমাজে চির সক্রিয় থেকে যাবে।

পিকেটির সমালোচনা

পিকেটির সমালোচনা দুদিক থেকে করা সম্ভব। একটি ডান দিক থেকে, আরেকটি বাম দিক থেকে। সংক্ষেপে এই দুই ধারার সম্ভাব্য সমালোচকের মধ্য থেকে দুটি উল্লেখযোগ্য নমুনা সমালোচনা আমি নিচে তুলে ধরছি। একটি সিপিএমের তাত্ত্বিক 'সোস্যাল সায়েন্টিস্ট' পত্রিকার প্রখ্যাত সাবেক সম্পাদক রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ প্রভাত পাটনায়েকের সমালোচনা। অপরটি বিশ্ববিখ্যাত ধনী 'বিল গেটসের'। বিল গেটসের এই সমালোচনাটি অবশ্য কোথাও প্রকাশিত হয়নি। আমি তাঁর ব্যক্তিগত ব্লগে এটির সন্ধান পেয়েছি।

প্রভাত পাটনায়েক *'The Marxist'*-এর 'এপ্রিল-জুন' ২০১৪ সংখ্যায় প্রথম *'Capitalsim, Inequality and Globalization: Thomas Piketty's Capital in the Twenty-First Century'* নামে এক প্রবন্ধে এই সমালোচনাগুলো তুলে ধরেন।

১। পাটনায়েকের মতে, পিকেটি বর্তমানে পুঁজিবাদে যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের বিপদের কথা বলেছেন সে বিষয়ে মার্ক্সবাদীরাও একমত কিন্তু পিকেটি এটাকে 'r-g' এর ব্যবধান দিয়ে টেকনিক্যালি যেভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন সেটি সঠিক নয়।

২। পাটনায়েকের মতে, ক্যাপিটাল না মেপে ক্যাপিটালের রেট অব রিটার্ন মাপা সম্ভব নয়। আবার ক্যাপিটালকে যদি উৎপাদিত উৎপাদনের উপায় বলে সংজ্ঞায়িত করা হয় তাহলে তার আর্থিক মূল্য মাপতে হলেও আমাদের ক্যাপিটালের রেট অব রিটার্ন জানতে হবে। অর্থাৎ নয়া ধ্রুপদি অর্থনীতির ক্যাপিটাল তত্ত্ব এক অসংশোধনীয় অসংগতিতে ভুগছে। পিকেটি এই ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করায় তিনিও এই ভ্রান্তিতে ভুগছেন।

৩। ১৯১৪-১৯২৯ এই সময়ে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যাপক মন্দা বিরাজ করছিল। এর অর্থ হচ্ছে তখন নিশ্চিতভাবে অব্যবহৃত কলকারখানা বেশি ছিল, পুঁজির তুলনায় আয়ের পরিমাণ কম ছিল। সুতরাং সেই সময় ক্যাপিটাল-ইনকাম অনুপাতটি কম না হয়ে বেশিই হওয়ার কথা এবং তখন তাহলে ক্যাপিটালের আয়ের হিস্যা বেশিই হওয়ার কথা। তাহলে ওই সময় পিকেটি যে নিম্নতর ক্যাপিটাল-ইনকাম অনুপাতের পরিমাপ দেখাচ্ছে তা সত্য না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

৪। ক্যাপিটালের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা মাপা সম্ভব নয়, কারণ অন্য সব উপাদান কখনোই স্থির রাখা সম্ভব নয়।

৫। পিকেটির আলোচনায় সঞ্চয় হার নিয়ে আলোচনাটি অসম্পূর্ণ। সঞ্চয় যদি বিনিয়োগে পরিণত হতে না পারে তাহলে চাহিদার অভাবে মন্দা সৃষ্টি হতে পারে। এ ধরনের মন্দা অবস্থায় রাষ্ট্র কিনসীয় পলিসি গ্রহণ করতে পারে, উপনিবেশে বিনিয়োগ অভিযান চালাতে পারে। প্রাক-পুঁজিবাদী খাতগুলোতে দখল অভিযানও চালাতে পারে অর্থাৎ রাষ্ট্রের একটি সাম্রাজ্যবাদী প্রতিব্যবস্থা গ্রহণের প্রবণতা থাকতে পারে। পিকেটি এই দিকটা সম্পর্কে একদম নীরব থেকে গেছেন।

৬। পিকেটি নিজেই দাবি করেছেন যে অতি উচ্চ পদের টেকনোক্র্যাট কাম এন্টারপ্রেনাররা নিজেদের বেতন নিজেই নির্ধারণ করে থাকেন। এটা যদি সত্য হয় তাহলে শ্রমের প্রাপ্তিহার নিছক প্রান্তিক দক্ষতা তত্ত্ব দিয়ে নির্ধারণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৭। বর্তমান দুনিয়ায় শ্রমের গতিশীলতা না থাকলেও পুঁজির গতিশীলতা বিদ্যমান। এই অবস্থায় পিকেটির মডেলে যে অতিরিক্ত পুঁজির বিপদের কথা বলা হয়েছে তা নাও বিপজ্জনক হতে পারে, কারণ, উদ্বৃত্ত পুঁজি পশ্চাৎপদ এলাকায় গিয়ে r কে বাড়িয়ে তুলতে পারবে এবং মূল্য সংযোজনে পুঁজির প্রাপ্ত অংশও বাড়াতে পারবে। নিজের কেন্দ্রে r কম হলেও তার অসুবিধা নাও থাকতে পারে।

এই সমালোচনাগুলো মূলত পিকেটির নয়া ধ্রুপদি অর্থনৈতিক পদ্ধতির সমালোচনা। তবে পাটনায়েক আরেকটি মৌলিক সমালোচনা করেছেন, সেটি হচ্ছে পিকেটির 'গ্লোবাল ট্যাক্স' প্রস্তাবের সমালোচনা। এ ধরনের সংস্কার করার সক্ষমতা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর কখনোই হবে না বলে পাটনায়েক মনে করেন। আর কখনো যদি কোনো রাষ্ট্রের চরিত্র এতখানি বদলে যায় যে তারা এই সংস্কারটি করতে পারবে, তাহলে তো তারা বিপ্লবই করে ফেলবে, এটাই পাটনায়েকের বিশ্বাস। পাটনায়েক মাইকেল কালেকি কর্তৃক উদ্ধৃত জোয়ান রবিনসনের যে উদ্ধৃতিটি এখানে ব্যবহার করেছেন সেটি উল্লেখ করে পাটনায়েকের আলোচনাটির সমাপ্তি টানছি :

> *'Any government which had the power and the will to remedy the major defects of the captialist system would have the will and power to abolish it altogether, while the governments which have the power to retain the system lack the will to remedy the defects.' [Joan Robinson, 1936]*

বিশ্ববিখ্যাত ধনী মাইক্রোসফটের জনক বিল গেটস ১৩ অক্টোবর ২০১৪ সালে পিকেটির বইটির ওপর আরেকটি পর্যালোচনা তাঁর ব্লগে প্রকাশ করেন। সেটি দক্ষিণ দিক থেকে পিকেটির একটি সমালোচনা। সেখানে তিনি বলেন :

১। পিকেটির বইটি লেখার আগে স্কাইপে তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল এবং পরে আমি বইটি পড়েছি এবং আমার মতে সবারই তা পড়া উচিত। কারণ পুঁজির অসুখ এবং তার প্রতিষেধক দুইয়েরই সন্ধান মিলবে এই বইয়ে।

২। পিকেটির যে অনুসিদ্ধান্তগুলো আমি সঠিক বলে মনে করি সেগুলো হচ্ছে :

'High levels of inequality are a problem—messing up economic incentives, tilting democracies in favours of powrful interests and undercutting the ideal that all people are created equal.'

Capitalim does not self correct toward greater equality—that is excess wealth concentration can have a snowballing tendencies if and when they choose to do so.'

৩। পিকেটির যে অনুসিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত নই তা হচ্ছে

'To be clear when I say that levels of inequality are a problem, I do not want to imply that the world is getting worse.'

৪। বিল গেটস পরে বলতে চেয়েছেন যেসব পুঁজিপতি একরকম নয়, তার বিশ্বাস ও প্রদত্ত উদাহরণে তিনি তিন রকম পুঁজিপতির অস্তিত্বের কথা বলেন : একজন হচ্ছেন উদ্যোক্তা পুঁজিপতি যিনি পুঁজিকে উৎপাদনশীল নতুন কাজে ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগ করেন, ব্যবস্থাপনা, শ্রম ও বুদ্ধি প্রয়োগ করেন, উদ্বৃত্ত তৈরি ও আয় করেন, অন্য একজন পুঁজিপতি এত বেশি উদ্বৃত্তের অধিকারী যিনি উদারভাবে তা মানবহিতৈষী কর্মে ব্যয় করেন এবং তৃতীয় আরেকজন পুঁজিপতি হয়তো একটি বিলাসবহুল দ্বীপ বা জাহাজ কিনে টাকা উড়িয়ে দিচ্ছেন। বিল গেটসের মতে, পিকেটির ট্যাক্স প্রস্তাব প্রথম দুই ধরনের পুঁজিপতিদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তবে তৃতীয় ধরনের অতিরিক্ত ভোগী অথবা এবং খাজনাভোগী পুঁজিপতিদের ট্যাক্সের আওতায় আনার সুপারিশ করেছেন গেটস।

পিকেটির উল্লেখিত সমালোচনাগুলো একজন দীর্ঘমেয়াদি স্বার্থসচেতন পুঁজিপতির সমালোচনা। এটা প্রমাণ করে যে পুঁজিপতিদের মধ্যেও পৃথকায়ন ও ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম সম্ভব।

শেষ কথা

পিকেটির গ্রন্থের মাধ্যমে আজ এটা প্রমাণিত হলো যে পুঁজিবাদের প্রতিনিধিরাই স্বীকার করে নিচ্ছেন যে পুঁজিবাদের একটি কঠিন অসুখ রয়েছে। এই অসুখ সারানোর নিজস্ব ক্ষমতা পুঁজিপতিদের নেই। এই অসুখের একটি পোশাকি নামও তাঁরা দিয়েছেন *'Inequality Trap'* বা 'বৈষম্যের ফাঁদ'। বিশ্বব্যাংকও এখন এই শব্দটি তাদের লিটারেচারে ব্যবহার করছেন। এই ফাঁদে ধরা পড়লে একটি দেশের বৈষম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতাকাঠামো নিজেই নিজেকে নিরন্তর শক্তিশালী করতে থাকে এবং তাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়।

বাংলাদেশ আজ মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। বিশ্বব্যাংকের সংজ্ঞা অনুযায়ী কোনো দেশের মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ ১০২৬ থেকে ১২৪৭৫ ডলারের মধ্যে থাকলে তাকে মধ্য আয়ের দেশ বলা হয়। তবে ১০২৬-৪০৩৫ ডলার পর্যন্ত যাদের মাথাপিছু আয় তাদের নিম্ন মধ্য আয়ের দেশ বলা হয়। বাংলাদেশ এই নিম্ন মধ্য আয়ের নিম্ন প্রান্তে আজ অবস্থিত। চীন, ব্রাজিল, মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা এই দেশগুলো মাথাপিছু ৫০০০ ডলারের ওপরে আয় নিয়ে বর্তমানে মধ্য আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে কিন্তু তারা এখন *Inequality Trap* এ আটকে যেতে বসেছে। যদি তারা তাদের উচ্চ বৈষম্য কমাতে না পারে তাহলে তারা আর মধ্য আয়ের দেশ থেকে বেড়ে উচ্চ আয়ের দেশে কখনোই পৌঁছাতে পারবে না। এসব দেশের উচ্চ আয়বৈষম্য তাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে তিনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে :

ক. প্রথমত : বড় ধনিকদের একচেটিয়া আধিপত্য বিস্তারের কারণে পুঁজিবাদের প্রধান যে ইতিবাচক শক্তি ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতামূলক উদ্যোগ তা তারা এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হচ্ছেন।

খ. গণতন্ত্র অর্থনৈতিক চাপের মুখে উঠে দাঁড়াতে পারছে না। ব্যাপক জনমতের সঙ্গে নিয়ত রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা তৈরি হচ্ছে এবং বিনিয়োগ ক্ষতিগস্ত হচ্ছে। পুঁজি অনেক সময় অন্য দেশে পালিয়েও যাচ্ছে।

গ. বৈষম্যমূলক অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ চাহিদা সর্বদাই সংকুচিত থাকে এবং বাধ্য হয়ে তখন বাইরে শ্রমঘন রপ্তানি বা শ্রম শক্তি রপ্তানির দিকে মনোযোগ দিতে হয়। কিন্তু মধ্য আয়ের দেশ যখন নিম্ন প্রান্তে থাকে তখন এটা চললেও উচ্চ প্রান্তে এগোতে হলে ব্যাপক জনগণের দেশীয় ক্রয়ক্ষমতা, দক্ষতা বাড়িয়ে এবং তাদের আয় বাড়িয়ে দেশের ভেতরের বাজারকে বাড়াতেই হবে। তা না পারলে মধ্য আয়ের নিম্ন প্রান্তেই পড়ে থাকতে হবে বাংলাদেশকে।

মধ্য আয়ের যে দেশগুলো এই ফাঁদে পড়েনি তারা হচ্ছে দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, জাপান ইত্যাদি ইস্ট এশিয়ান দেশগুলো। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে এরা পুঁজিবাদী দেশ হলেও এর অর্থনৈতিক-সামাজিক বৈষম্য সাফল্যের সঙ্গে কমিয়ে রাখতে পেরেছিল। তার সামাজিক রাষ্ট্রের ভূমিকাকে নাকচ করে বাজার ও ব্যক্তিমালিকানাকে চরম বিশ্বাসে পরিণত করেনি। সুতরাং আমরা পিকেটির কথাই বলি আর মার্ক্সের কথাই বলি আমাদের যেভাবে হোক আমাদের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য আজ একটি সমতা অভিমুখী উন্নয়ননীতি গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

মার্ক্স-এঙ্গেলস (১৯৭৫-এ), *Selected Correspondence*, Progress Publishers, Moscow, Letter to Conrad Schmidt from Engels on October 27, 1890, P-402.

মার্ক্স-এঙ্গেলস (১৯৭৫-বি), *Selected Correspondence*, Progress Publishers, Moscow, Letter to Conrad Schmidt from Engels on August 5, 1890, P-393.

লেনিন (১৯১৪), 'কার্ল মার্ক্স', *গ্রানাত* বিশ্বকোষের জন্য লিখিত প্রবন্ধ।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (অনুবাদ), (১৯৭৬) 'মার্ক্স-এঙ্গেলস স্মৃতি', প্রগতি প্রকাশন, মস্কো। পৃঃ ২৫৬-২৫৭

মার্ক্স-এঙ্গেলস (১৮৮৮), *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার*, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃঃ ৫৫-৫৬

মার্ক্স-এঙ্গেলস (১৯৮৯) *কালেক্টেড ওয়ার্কস*, ভল্যুম-২৪, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, পৃঃ ৮১-৯৯

এম এম আকাশ (১৯৯৬), 'নতুন সন্ধিক্ষণে বামপন্থীরা কি করবেন?', পৃঃ-৪৪-৪৮, *শিখা অনির্বাণ*, এপ্রিল, ১৯৯৬, সংখ্যা-১, চট্টগ্রাম।

বালজাক অনরি ডি (১৮৩৫), ফাদার গরিয়ট, নিউইয়র্ক, ডব্লিউ-ডব্লিউ নরটন অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৯৮.

রবার্ট এলেন (২০০৯), 'Engel's Pause: A pessimist's guide to the British Industrial Revolution', *Exploration in Economic History*, 46, no.4 October, 2009-418-35

পল ক্রুগম্যান (২০১৪), 'Why we are in a new gilded stage', http://my books.com/articals/ archives/2014/may/08.

জোয়ান রবিনসন (১৯৩৬), 'Review of R.F. Harrod's book The Trade Cycle', *The Economic Journal*, December 1936.

নজরুল ইসলাম (২০১৪), 'Will Inequality lead China to Middle Income Trap?' *Frontiers of Economics in China*, 9(3), PP: 378-437.

Thomas Piketty, (2014) *Capital in the Twentyfirst Century*, Harvard University Press, USA.

দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক

ছিটমহল বিনিময় : পেছনের কাহিনি ও সামনের চ্যালেঞ্জ

মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী

সারসংক্ষেপ

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক স্থলসীমা চুক্তিটি দীর্ঘ ৪১ বছর পর ২০১৫ সালের মে মাসে ভারতের পার্লামেন্টের অনুসমর্থন পেল। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান অচিহ্নিত সীমানা চিহ্নিতকরণ, অপদখলীয় ভূমি হস্তান্তর ও ছিটমহল বিনিময়সহ সীমান্ত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। বাংলাদেশ সে বছরই চুক্তিটি পার্লামেন্টে অনুসমর্থন করে এবং তা বাস্তবায়ন করে। কিন্তু সেই অনুসমর্থনের কাজটি করতে ভারত সরকার ৪১ বছর সময় ব্যয় করল। এই দীর্ঘ সময়ে ছিটমহলগুলোতে সৃষ্টি হয় মানবিক সংকট। ছিটমহল সমস্যার সমাধান জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে কোনো দেশের জন্যই তেমন কোনো স্পর্শকাতর বিষয় ছিল না। ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে কোনো দেশেরই ক্ষতির কিছু ছিল না। সমস্যাটি জিইয়ে রেখে কোনো দেশ লাভবান হয়েছে, তা-ও নয়। তাহলে কেন এই বিলম্ব? স্থলসীমা চুক্তির অনুসমর্থন শেষ পর্যন্ত কীভাবে সম্ভব হলো? ছিটমহল বিনিময়ে দ্বিপক্ষীয় চ্যালেঞ্জগুলো কী? ছিটমহলের মানুষদের সংকটগুলো কী এবং তাদের পুনর্বাসনের চ্যালেঞ্জগুলো কী? এই প্রশ্নগুলোরই উত্তর খোঁজা হয়েছে এই পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা প্রবন্ধে।

শব্দগুচ্ছ

ছিটমহল বিনিময়, স্থলসীমা চুক্তি, ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অনুসমর্থন।

প্রারম্ভিক কথা

অবশেষে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক স্থলসীমা চুক্তিটি দীর্ঘ ৪১ বছর পর ২০১৫ সালের মে মাসে ভারতের পার্লামেন্টের অনুসমর্থন পেল। স্থলসীমা চুক্তি অনুসমর্থন-সংক্রান্ত ভারতের সংবিধানের এই ১০০তম সংশোধনীটি বাংলাদেশ-

ভারত সম্পর্ক এবং বিশেষ করে বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। কারণ, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যমান সীমান্ত সমস্যা নিরসন ও ছিটমহল বিনিময়ের মতো বিষয়গুলো ৪১ বছর ধরে স্থলসীমা চুক্তির অনুসমর্থনের অপেক্ষায় ছিল। উল্লেখ্য, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সীমান্ত সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের ১৬ মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় *Agreement on the demarcation of land boundary between Bangladesh and India*, যা সংক্ষেপে Land Boundary Agreement বা স্থলসীমা চুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তিটি ১৯৭৪ সালেই বাংলাদেশের পার্লামেন্টের অনুসমর্থন পায় এবং বাংলাদেশ সরকার ত্বরিতগতিতে চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের করণীয় সম্পন্ন করে, যা পরবর্তী সময়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, এই দীর্ঘ সময়ে ছিটমহলে আবদ্ধ থাকা শত শত মানুষের জীবনে যে বঞ্চনার ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে, তার সার্বিক বিবেচনায় ছিটমহল সমস্যা শুধু একটি আন্তরাষ্ট্রীয় সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; এটি এখন একটি মানবিক সংকট। ১৯৪৭ সালে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষ যখন ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি লাভ করে, তখন রাতারাতি ছিটমহলের মানুষদের নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছিল। সিরিল র‍্যাডক্লিফের সীমানা নির্ধারণের কুচিন্তাপ্রসূত প্রক্রিয়ায় তারা হয়ে যায় 'নিজভূমে পরবাসী'। কারণ, তারা ছিটমহল নামের বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডগুলোতে আবদ্ধ হয়ে যে দেশে আটকা পড়ে, সে দেশ তাদের নয়! সে দেশে তারা 'ভিনদেশি'। আর আইনত তারা যে দেশের নাগরিক, সে দেশের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ বা সম্পর্ক নেই। তাই তারা রাষ্ট্র ও নাগরিকত্বহীন মানুষ। ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের শিশুদের নাগরিক পরিচয় নিয়ে স্বাধীনভাবে বড় হওয়ার অধিকার প্রদানের দায়িত্ব—বাংলাদেশ বা ভারত—কোনো রাষ্ট্রই এড়াতে পারে না। অথচ গত প্রায় সাত দশকে ছিটমহলগুলোতে যাদের জন্ম হয়েছে, তারা কেউই কোনো রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পায়নি। কোনো রাষ্ট্রের কোথাও তারা নেই। এই 'নেই মানুষ'দের পরিচয় হলো 'ছিটের লোক'। সব ধরনের রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ও মানবাধিকার থেকে তারা বঞ্চিত; সমাজ, রাষ্ট্র তথা ছিটমহলের বাইরের সমগ্র পৃথিবী থেকে তারা বিচ্ছিন্ন।

বাংলাদেশের লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলার সীমান্ত এলাকা এবং ভারতের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্ত এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিটমহলগুলো যেন একেকটি স্থলবেষ্টিত দ্বীপ। আয়তনের দিক থেকে বড় কয়েকটি ছিটমহলে সর্বোচ্চ ১০ থেকে ১৫ হাজার লোকের বসবাস। অধিকাংশ ছিটমহলে লোকের সংখ্যা কয়েক শ বা তার চেয়েও কম। আবার কোনো কোনো ছিটমহলে মাত্র দুই থেকে তিনটি

পরিবারের বসবাস। এই অল্পসংখ্যক মানুষের বসতিবিশিষ্ট আবদ্ধ ছিটমহলগুলো একেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র সমাজ। এমনকি এক ছিটমহলের সঙ্গে অন্য কোনো ছিটমহলেরও কোনো সম্পর্ক নেই। সবকিছু থেকে তারা বিচ্ছিন্ন ও বঞ্চিত।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর ১৯৫০-এর দশকেই ছিটমহল বিনিময়ে ভারত-পাকিস্তান উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল এবং ১৯৫৮ সালে শীর্ষ পর্যায়ে একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছিল। কিন্তু সেটি বাস্তবায়িত হয়নি, যার পেছনে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিই দায়ী ছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে ছিটমহল সমস্যাটি বাংলাদেশের ওপর বর্তায় আর পাকিস্তান ছিটমহল সমস্যা থেকে অব্যাহতি লাভ করে। কারণ, ছিটমহল ছিল শুধু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে যা বর্তমান বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যে স্থলসীমা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাতে ছিটমহল বিনিময়ের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত হয়। স্থলসীমা চুক্তি স্বাক্ষরের ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে চুক্তিটি অনুসমর্থন করে ত্বরিতগতিতে তা বাস্তবায়ন করে। কিন্তু সেই অনুসমর্থনের কাজটি করতে ভারত সরকার ৪১ বছর সময় ব্যয় করল। এই ৪১ বছরে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ঘটেছে অসংখ্য অপ্রীতিকর ঘটনা আর ছিটমহলের মানুষদের জীবনে ঘটে গেছে নাগরিক ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক দীর্ঘ অধ্যায়, যা মানবসভ্যতার ইতিহাসে বিরল। অবশ্য যেমনটি আগেই বলেছি, ছিটমহলবাসীর মানবেতর জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের মধ্য দিয়েই। সেই হিসাবে ভারতের পার্লামেন্টে স্থলসীমা চুক্তি অনুসমর্থনের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ছিটমহলবাসীর জীবন থেকে ৬৮ বছরের একটি অন্ধকার যুগের অবসান ঘটতে যাচ্ছে, যেখানে তাদের না ছিল কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় পরিচয়; না ছিল খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষার মতো মৌলিক অধিকারসহ কোনো প্রকার মানবিক অধিকার; না ছিল জীবনের নিরাপত্তা। ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে সব ধরনের অধিকারবঞ্চিত ছিটমহলের অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশুদের মুক্তির আয়োজন করে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এমন একটি কাজ করলেন, যা ইতিহাসের পাতায় লেখা থাকবে। অবশেষে ছিটমহল বিনিময় হতে যাচ্ছে দেখে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের 'আই হ্যাব আ ড্রিম' বক্তব্যের একটি লাইন বারবার মনে পড়েছে : 'Now is the time to make justice a reality for all of God's children.' (এখন সময় হলো সৃষ্টিকর্তার সব সন্তানের জন্য ন্যায়বিচারকে বাস্তবতায় পরিণত করা)।

ছিটমহল সমস্যা : ঔপনিবেশিক বাঁটোয়ারার কুফল

ছিটমহলগুলোর প্রাথমিক উৎপত্তি আরও আগে এবং বিচিত্রভাবে হলেও ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উৎপত্তির সময় থেকেই সেগুলোর বর্তমান অবস্থা

সৃষ্টি হয়। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের নির্দেশনায় সিরিল র‍্যাডক্লিফ মাত্র ৭৪ দিনে (৩ জুন থেকে ১৪ আগস্ট) যেভাবে ভারতবর্ষের মতো একটি বিশাল দেশ ও বিশাল জনগোষ্ঠীকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দ্বিখণ্ডিত করেন, তাতে মানুষের সুবিধা-অসুবিধা বা ভবিষ্যৎ বিবেচিত হয়নি। লাখ লাখ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িত সীমানাভাগের মতো এত স্পর্শকাতর, জটিল, বিতর্কিত ও বিশাল কাজটি করা হয়েছিল সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা ছাড়াই। সীমানা নির্ধারণ-সংক্রান্ত কোনো অভিজ্ঞতাও কাজে লাগানো হয়নি। সীমানা কমিশনের 'টার্মস অব রেফারেন্স'-এ র‍্যাডক্লিফকে 'সংলগ্ন সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা'র (contiguous majority areas) ওপর ভিত্তি করে সীমানা আঁকার নির্দেশনা দেওয়া হয়; আবার 'অন্যান্য বিষয়'ও (other factors) বিবেচনা করতে বলা হয়, যা প্রকৃত প্রস্তাবে সীমানা নির্ধারণের কাজকে দুরূহ করেছিল। কারণ, 'contiguous', 'areas', 'other factors'—এই পদগুলো ছিল অসংজ্ঞায়িত। এবং যেহেতু কমিশনের হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতায় পৌঁছানোর মতো কোনো পরিবেশ ছিল না, সেহেতু র‍্যাডক্লিফ একক সিদ্ধান্তে যা করেছেন, তারই ফলাফল হলো ছিটমহলসহ ভারত-বাংলাদেশ ও ভারত-পাকিস্তানের মাঝে বিদ্যমান বহুবিধ সীমান্ত সমস্যা।

বাস্তবতাবিবর্জিত র‍্যাডক্লিফ সীমানারেখা সীমান্ত অঞ্চলের জনজীবনকে সবদিক থেকেই চরমভাবে ব্যাহত করে। কৃষক ও কৃষি শ্রমিকের অর্থনৈতিক জীবনে নেমে আসে এক মহাবিপর্যয়। অনেকের বসতভিটা পড়ে এক দেশে আর চাষের জমি বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান পড়ে আরেক দেশে। ফলে দেশভাগ-পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বাস্তবতায় সেই মানুষগুলো বসতভিটা আগলে রাখবে না চাষের জমি বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আগলে রাখবে, তা নিয়ে ভয়ংকর এক উভয় সংকটের মুখোমুখি হয়। এবং তাদের এ-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে রাতের আঁধারে। কারণ, তখন দাঙ্গার হাত থেকে জীবন বাঁচানোই ছিল কঠিন। তা ছাড়া নিকটতম প্রতিবেশীরা, যারা যৌথ পেশায় নিয়োজিত ছিল অথবা জীবিকার জন্য একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তারা রাষ্ট্রীয় সীমানারেখা দ্বারা রাতারাতি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী বিপর্যয় নেমে আসে ছিটমহলের মানুষদের জীবনে। কারণ, ছিটমহলগুলোকে রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে রাখার ফলে ছিটমহলের বাসিন্দারা এক দেশের নাগরিক হয়েও আবদ্ধ হয়ে পড়ে অন্য দেশে।

সীমানারেখা চাপিয়ে দিয়ে যে মানুষগুলোকে রাতারাতি ভাগ করে ফেলা হয়েছিল, বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল স্থাবর সম্পত্তি, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান, কর্মসংস্থান এবং পারিবারিক ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে, জীবনের প্রয়োজনেই তাদের সীমানার এপার-ওপার যাওয়া-আসা অব্যাহত ছিল দেশভাগের পরেও। কিন্তু পরস্পর বৈরী রাষ্ট্র দুটির কর্ণধারেরা সাধারণ মানুষের জীবনের প্রয়োজনে সে যাওয়া-আসা মেনে

নেয়নি। ফলে সীমান্তে শুরু হয় ভারতের বিএসএফ ও পাকিস্তানের রেঞ্জার্সের সশস্ত্র পাহারা। জীবনের তাগিদে এপার-ওপার করা মানুষের ওপর শুরু হয় সশস্ত্র সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। আরও পরে ভারতের পক্ষ থেকে সীমান্তে নির্মাণ করা হয় বিপজ্জনক কাঁটাতারের বেড়া। এভাবেই উভয় রাষ্ট্রের সীমান্ত অঞ্চলে অবস্থিত ছিটমহলগুলো নিজ নিজ রাষ্ট্র থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ছিটমহল বিনিময়ে ভারত-পাকিস্তান উদ্যোগ

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের জন্মই হয়েছিল পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মধ্য দিয়ে। দেশভাগ-পরবর্তী রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বাস্তবতায় দক্ষিণ বেরুবাড়ী ও দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার মালিকানা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানে তীব্র উত্তেজনা শুরু হয়। শুরু থেকেই পাকিস্তান সরকার র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুযায়ী ভারত অধিকৃত দক্ষিণ বেরুবাড়ীর মালিকানা দাবি করে ভারতের ওপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করছিল। বিষয়টি আন্তর্জাতিক আদালতে নিয়ে যাওয়ার হুমকিও পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে ছিল। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দক্ষিণ বেরুবাড়ী ও দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় সংঘটিত দাঙ্গার প্রভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-পরিস্থিতির অবনতি হলে ছিটমহল ইস্যুটি উভয় দেশের রাজনৈতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ১৯৫৮ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনের সঙ্গে ছিটমহলসহ (পরিবেষ্টিত এলাকা) বিদ্যমান অন্যান্য সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বৈঠকে বসেন। সে বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয় Agreement between India and Pakistan on Border Disputes (East Pakistan) যা সংক্ষেপে নেহরু-নুন চুক্তি হিসেবে পরিচিত। এই চুক্তির ১০ নম্বর সিদ্ধান্তে ছিটমহল বিনিময় সম্পর্কে বলা হয় যে, পাকিস্তানে ভারতের পুরোনো কোচবিহারের ছিটমহলগুলো এবং ভারতে পাকিস্তানের ছিটমহলগুলো বিনিময়ে ঐকমত্য হলো, পাকিস্তান যে বাড়তি জায়গা পাবে, তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দাবি ছাড়াই। অর্থাৎ ভারতের ভূখণ্ডে অবস্থিত পাকিস্তানের সব ছিটমহল ভারতের কাছে হস্তান্তর করা এবং পাকিস্তানের ভূখণ্ডে অবস্থিত ভারতের সব ছিটমহল পাকিস্তানের কাছে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত হয় এবং ছিটমহল বিনিময়ের ফলে পাকিস্তান যে বাড়তি জায়গা পাবে, তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। আর ১২ নম্বর দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়নকে দুই দেশের মধ্যে সমান দুই ভাগে ভাগ করার সিদ্ধান্ত হয়। অর্থাৎ দক্ষিণ বেরুবাড়ীকে উত্তর-দক্ষিণ দুই ভাগে ভাগ করার এবং দক্ষিণ অংশ পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে আর উত্তর অংশ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। চুক্তির ৩ নম্বর সিদ্ধান্তে দক্ষিণ

বেরুবাড়ী সম্পর্কে বলা হয়,

> This will be so divided as to give half the area to Pakistan and the other half adjacent to India being retained by India. The division of Berubari Union No. 12 will be horizontal starting from the North East corner of Debigang thana. The Division should be made in such a manner that the Chooch Behar enclaves between Panchagar thana of West Bengal will remain connected as at present with Indian territory and will remain with India. The Chooch Behar enclaves lower down Boda thana of East Pakistan and Berubari union No. 12 will be exchanged along with the general exchange of enclaves and will go to Pakistan.

এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতো আর দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অংশ পূর্ব পাকিস্তান তথা আজকের বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হতো। কিন্তু চুক্তিটি বাস্তবায়িত হয়নি। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের পার্লামেন্ট দক্ষিণ বেরুবাড়ী বিভক্তির বিরোধিতা করে এবং এর ফলে নেহরু-নুন চুক্তিটি ভারতে একটি স্পর্শকাতর রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। পশ্চিমবঙ্গ পার্লামেন্টের এই বিরোধিতা বেঙ্গল কংগ্রেসের মুসলিম লিগবিরোধী মানসিকতার ধারাবাহিকতা বলেই মনে হয়। এমন পরিস্থিতিতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার যদিও দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অংশ পাকিস্তানকে সমর্পণের জন্য ১৯৬০ সালে সংবিধানে একটি সংশোধনী এনেছিল কিন্তু তখন তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। কারণ বিরোধী দল থেকে নেহরু-নুন চুক্তিকে অসাংবিধানিক আখ্যা দেওয়া হয় এবং সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ওই চুক্তির বিরুদ্ধে আদালতে বেশ কিছু মামলা হয়। ১৯৭১ সালে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত যখন ওই চুক্তির বিরুদ্ধে করা মামলা খারিজ করেন, তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ চলছিল। ফলে তখন নেহরু-নুন চুক্তি বাস্তবায়নের সময় বা সুযোগ কোনোটিই ছিল না। ভারত-পাকিস্তানের ছিটমহলগুলোর সবই ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ছিল। তাই ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্য দিয়ে ভারত-পাকিস্তান ছিটমহলগুলো ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহলে পরিণত হয় এবং এই সমস্যাটি বাংলাদেশের ওপর এসে বর্তায়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ১৯৫৮ সালে স্বাক্ষরিত নেহরু-নুন চুক্তি যদি বাস্তবায়িত হতো তাহলে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ছিটমহল বলে কিছু থাকত না।

ছিটমহল ইস্যুতে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি

১৯৪৭-৭১ সময়ে ভারত-পাকিস্তান ছিটমহল সমস্যার সমাধান হয়নি শীর্ষ পর্যায়ে চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও। আর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ভারত ও

বাংলাদেশের মধ্যে ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমা চুক্তিটি ভারতের পার্লামেন্টের অনুসমর্থন পেতে সময় লাগল ৪১ বছর। ২০১৫ সালের মে মাসে ভারতের পার্লামেন্টে স্থলসীমা চুক্তি অনুসমর্থিত হওয়ার পর যদিও ছিটমহল বিনিময়ের দিনক্ষণ সব ঠিক হয়ে গেছে, তবু ছিটমহল বিনিময় ও ছিটমহলের মানুষদের পুনর্বাসনের পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে আরও ঠিক কতটা সময় লাগবে, তা সময়ই বলে দেবে। কারণ, আমি যতটুকু বুঝি, ছিটমহল বিনিময়-প্রক্রিয়ার আগামী পর্বগুলো সম্পন্ন হবে দুই দেশের আমলা ও কূটনীতিকদের হাত দিয়ে। আর এই দুই দেশের কূটনীতি ও আমলাতন্ত্রে কাঠিন্য ও কালক্ষেপণের যে সংস্কৃতি চালু আছে, তাতে ছিটমহল বিনিময়-প্রক্রিয়া যেকোনো পর্যায়ে বিলম্ব হতে পারে। তবে আশার কথা এই যে চার দশকেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর এই ইস্যুতে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অনেক বেশি দৃঢ় মনে হচ্ছে। এটি শেষ অবধি অব্যাহত থাকলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ছিটমহল সমস্যার সমাধান না হওয়ার পেছনে পাকিস্তান আমলে পাকিস্তান যেমন দায়ী ছিল না, বাংলাদেশও দায়ী নয়। পাকিস্তান সরকার যেমন এই সমস্যা সমাধানে যৌক্তিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল, বাংলাদেশ সরকারও প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করেছিল অত্যন্ত ত্বরিতগতিতেই। কিন্তু এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে বরাবরই বাধা সৃষ্টি করেছে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। ১৯৫৮ সালের নেহরু-নুন চুক্তি এবং ১৯৭৪ সালের মুজিব-ইন্দিরা চুক্তি পর্যবেক্ষণ করলে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়। নেহরু ও ইন্দিরা-পরবর্তী ভারতীয় কোনো রাজনীতিক ছিটমহল ইস্যুটি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিবেচনা করেছেন বা এই সমস্যা সমাধানে যৌক্তিক কোনো ভূমিকা রেখেছেন, এমন কোনো নজির নেই। বাম রাজনীতির কিংবদন্তি জ্যোতি বসুর সরকার দুই যুগ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় থাকলেও ছিটমহলের মানুষদের মুক্তির লক্ষ্যে তিনি কোনো পদক্ষেপ নেননি। অথচ ছিটমহল বিনিময়ে ভারতের দায়-দায়িত্ব ছিল পরিষ্কার। প্রথমত, শীর্ষ পর্যায়ে স্বাক্ষরিত দুটি চুক্তি; স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৫৮ সালের চুক্তিটি অকার্যকর হয়ে গেলেও, ১৯৭৪ সালের চুক্তিটি বাংলাদেশের পার্লামেন্টে অনুসমর্থিত এবং বাংলাদেশ কর্তৃক চুক্তিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়িত। সুতরাং আন্তর্জাতিক নীতিমালা অনুযায়ী ভারত এই চুক্তি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। দ্বিতীয়ত, ছিটমহল বিনিময় ও এ-সংক্রান্ত চুক্তিগুলোর সঙ্গে ভারতের জাতীয় নেতা জওহরলাল নেহরু ও ইন্দিরা গান্ধীর রাজনৈতিক অঙ্গীকার জড়িত।

প্রকৃত প্রস্তাবে, ভারতের রাজনীতিকেরা ছিটমহল ইস্যুটিকে তাঁদের ভোটের রাজনীতির ঘুঁটিতে পরিণত করেছিলেন। বাংলাদেশের 'অনুপ্রবেশকারী'র কাল্পনিক

সংখ্যা যেমন তাদের ভোটের রাজনীতির একটি অন্যতম উপাদান। বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচনের সময় হলেই 'অনুপ্রবেশকারী'দের কাল্পনিক সংখ্যা দাঁড় করিয়ে ভারতের কোনো কোনো রাজনৈতিক দল ভোটের রাজনীতি শুরু করে। ভারতীয় জনতা পার্টিই (বিজেপি) এ ধরনের রাজনীতির সবচেয়ে বড় পৃষ্ঠপোষক। এবং বিজেপি শুরু থেকেই ছিটমহল বিনিময়েরও বিরোধী ছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সেই বিজেপি সরকারই স্থলসীমা চুক্তি পার্লামেন্টে অনুসমর্থন করে ছিটমহল বিনিময়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯২ সালের ২৬ জুন তৎকালীন কংগ্রেস সরকার যখন বাংলাদেশকে তিনবিঘা করিডর প্রদান করে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলকে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়েছিল, তখন বিজেপি এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল। তিনবিঘা করিডর প্রদানের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ বিজেপি প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে এবং ২৬ জুনকে 'তিনবিঘা প্রতিবাদ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। তাদের সঙ্গে ছিল আরেক রাজনৈতিক দল ফরোয়ার্ড ব্লক।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি শুরু থেকেই ছিটমহল বিনিময়ের বিরোধিতা করে আসছিলেন। ছিটমহল বিনিময়কে তিনি বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক টাটা কোম্পানিকে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে জমি প্রদানের সঙ্গে তুলনা করে একই রকম ভোটের রাজনীতি শুরু করেছিলেন। উল্লেখ্য, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক পূর্ব মেদিনীপুরের সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে টাটা কোম্পানিকে জমি প্রদানের বিরুদ্ধে এক রক্ত ঝরানো আন্দোলনের মধ্য দিয়েই ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গ শাসন করা বামফ্রন্টকে হটিয়ে তিনি ২০১১ সালে প্রথমবারের মতো ক্ষমতায় এসেছিলেন। এবং তাঁর অমত ও অনুপস্থিতির কারণেই ২০১১ সালের ঢাকা শীর্ষ বৈঠকে বহুল প্রতীক্ষিত তিস্তার পানিবণ্টন ইস্যুর যেমন কোনো সুরাহা হয়নি, তেমনি ছিটমহল সমস্যারও কোনো সুরাহা হয়নি।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস যদিও কখনো ছিটমহল বিনিময়ের বিরোধিতা করেনি কিন্তু দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও তারা সময়মতো ছিটমহল বিনিময়ে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কংগ্রেস সরকার আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সঙ্গে চাইলে ছিটমহল সমস্যা শুরুতেই সমাধান করা যেত। ১৯৭৪ সালের স্থলসীমা চুক্তি তো সে বছরই বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল। এবং সেটি যে সম্ভব ছিল, তা বাংলাদেশ সরকার মাত্র ছয় মাসের মধ্যে ওই চুক্তি অনুসমর্থন ও বাস্তবায়ন করে প্রমাণ করেছে। এ কথা জোর দিয়েই বলা যায় যে বাংলাদেশে এটি সম্ভব হয়েছিল যেমন রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দৃঢ়তার কারণে, তেমনি ভারতে এটি সম্ভব হয়নি রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও দৃঢ়তার অভাবে। সুতরাং ছিটমহল বিনিময় বিলম্বিত হওয়ার পেছনে কংগ্রেসও দায় এড়াতে পারে না।

২০১১ সালে কংগ্রেস সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বাংলাদেশ সফরের সময় ছিটমহল বিনিময়ে কংগ্রেস সরকারকে দৃশ্যত তৎপর দেখালেও এই ইস্যুর অন্যমত পক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে যথাযথভাবে আলাপ-আলোচনা করা হয়নি বলেই জানা যায়। যে কারণে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মনমোহন সিংয়ের সফরসঙ্গী হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর সফরসঙ্গী হননি। ফলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে অতি আশার ঢাকা শীর্ষ বৈঠক অতি অকৃতকার্যতায় পর্যবসিত হয়। এই সফরে তিস্তার পানিবণ্টন ও ছিটমহল বিনিময়ের বিষয়ে কোনো সুরাহা না হওয়ার জন্য সংবাদমাধ্যমগুলোয় মমতা ব্যানার্জিকেই দায়ী করা হয়। যদিও তিস্তার পানিবণ্টন ইস্যুতে—যা ২০১৫ সালের ঢাকা শীর্ষ বৈঠকেও এজেন্ডাভুক্ত হয়নি মমতা ব্যানার্জির আপত্তির কারণেই—তাঁর দায় এড়ানোর সুযোগ নেই। কিন্তু ২০১১ সালে ছিটমহল বিনিময় না হওয়ার দায় শুধু তাঁর ওপর চাপানো ঠিক হবে না। কারণ, তখন পর্যন্ত স্থলসীমা চুক্তি ইস্যুতে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মপরিকল্পনা সঠিক ছিল না বলেই মনে হয়। কারণ, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সীমান্তের অনিষ্পন্ন বিষয়গুলো একটা একটা করে পর্যায়ক্রমে নিষ্পন্ন করার ইচ্ছা ছিল। সে কারণেই হয়তো স্থলসীমা চুক্তিটি পাশ কাটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কারণ, যেহেতু স্থলসীমা চুক্তিতে ছিটমহল বিনিময়, সীমানা চিহ্নিতকরণ ও অপদখলীয় ভূমি হস্তান্তরসহ সব সমস্যা একসঙ্গে সমাধান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং চুক্তিটি বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্তবায়িত সেহেতু এই চুক্তি পাশ কাটানো ছাড়া সীমান্তের অনিষ্পন্ন বিষয়গুলো আলাদাভাবে নিষ্পন্ন করার সুযোগ নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তিনবিঘা করিডর নিয়ে ১৯৮২ ও ১৯৯২ সালে আলাদাভাবে দুটি ইজারা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল স্থলসীমা চুক্তিকে পাশ কাটিয়েই। ২০১১ সালে মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরের সময়ও ভারত সরকার সে চেষ্টাই করেছে। এর পেছনেও কাজ করেছে নির্বাচনী রাজনীতি। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলাদেশের অনমনীয় অবস্থানের কারণে তা সম্ভব হয়নি। ফলে ছাপা হওয়া প্রস্তাবিত প্রটোকলে শেষ পর্যন্ত হাতে লিখে ঘষামাজা করে স্বাক্ষর করে দুই দেশ। এসব কারণেই হয়তো তখনো পর্যন্ত ভারতের পার্লামেন্টে স্থলসীমা চুক্তির অনুসমর্থনের বিষয়টি কংগ্রেস সরকার বিবেচনা করেনি। অথচ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণে স্থলসীমা চুক্তি ভারতের পার্লামেন্টে অনুসমর্থন ছাড়া ছিটমহল বিনিময়ের কোনো সুযোগ ছিল না। এই দ্বিপক্ষীয় চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের যা করণীয় ছিল, বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৪ সালেই তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করে এবং দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অংশ ভারতকে ছেড়ে দেয়। সুতরাং এই চুক্তিটি ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল বিনিময়ের ক্ষেত্রে অকাট্য ও অলঙ্ঘনীয় আন্তর্জাতিক দলিল।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর ছিটমহল ইস্যুতে বিজেপি যেমন অবস্থান পরিবর্তন করে, তেমনি ২০১৫ সাল নাগাদ মমতা ব্যানার্জির মনোভাবেরও পরিবর্তন হয়। যার ফলে অবশেষে স্থলসীমা চুক্তিটি ভারতের পার্লামেন্টে অনুসমর্থিত হয়েছে এবং ছিটমহল বিনিময়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে সর্বশেষ ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির আসাম শাখা স্থলসীমা চুক্তি নিয়ে নতুন করে ভোটের রাজনীতি শুরু করেছিল। স্থলসীমা চুক্তি পাস হলে ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য আসামের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ভোট হারাতে পারে—এই ভয় দেখিয়ে আসাম বিজেপির সভাপতি সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আসামকে বাদ দিয়ে স্থলসীমা চুক্তি বাস্তবায়নে প্রভাবিত করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের *আনন্দবাজার পত্রিকা* (১৭ এপ্রিল ২০১৫) 'বিজেপির আপত্তিতে আপাতত নেই অসম' শীর্ষক খবরে লিখে, '২০১৬ সালে অসমের বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই সে রাজ্যের বিজেপি শাখার দাবি মেনে নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে স্থলসীমা চুক্তিটি আংশিকভাবে রূপায়ণ করার নতুন ভাবনাচিন্তা চলছে।...রাজ্য নেতৃত্বের সর্বশেষ হিসাব, এই চুক্তি হলে ভরাডুবি হবে বিজেপির। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অসমের ১৪টি আসনের মধ্যে সাতটি আসন জিতে বিজেপি ইতিমধ্যেই সেখানে ক্ষমতার গন্ধ পেয়ে গিয়েছে। তাদের ভোটের শতকরা হারও যথেষ্ট ভালো (৫৬ দশমিক ৫ শতাংশ)। সে রাজ্যের সাম্প্রতিক পুর [পৌরসভা] নির্বাচনেও জিতেছে বিজেপি। ফলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্য দখল করাটা স্বাভাবিকভাবেই অগ্রাধিকার পাচ্ছে।' আসাম বিজেপির চাপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আসামকে বাদ দিয়ে স্থলসীমা চুক্তি অনুসমর্থনের অনুমোদনও দিয়েছিল। খবরটি বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলোয় ফলাও করে প্রচার হয় এবং ছিটমহল বিনিময় আন্দোলনের নেতারাসহ সংশ্লিষ্ট সবাই এতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। কিন্তু এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কূটনৈতিক তৎপরতার খবর পাওয়া যায়নি। উপরন্তু বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন যে আসামকে বাদ দিয়ে স্থলসীমা চুক্তি বাস্তবায়নে ভারতের কাছ থেকে কোনো প্রস্তাব এলে বাংলাদেশ তা বিবেচনা করতে পারে। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর এই মন্তব্য ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে—বিষয়বস্তু না বুঝেই—আগ বাড়িয়ে আত্মসমর্পণের একটি উদাহরণ।

ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণে আসামকে বাদ দিয়ে স্থলসীমা চুক্তি অনুসমর্থনের এই তৎপরতায় ছিটমহল বিনিময়ে দীর্ঘসূত্রতার নতুন আরেকটি অধ্যায় শুরু হতে যাচ্ছিল। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার কারণেই আসামকে বাদ দিয়ে স্থলসীমা চুক্তি বাস্তবায়ন করা সম্ভব ছিল না। কারণ, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করে এই চুক্তিটি অনুসমর্থন করা হয়েছে। তা ছাড়া এই চুক্তিটি ভারতের সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক বৈধ ঘোষিত। একটি দ্বিপক্ষীয়

চুক্তি এক দেশ কর্তৃক সংবিধান সংশোধন করে বাস্তবায়ন করার পর আরেক দেশ চাইলেই তাতে এককভাবে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না। সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য অবশ্য আরেকটি উদ্ভট প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তা হলো, আসামে অবস্থানকারী বাংলাদেশের ৬০ হাজার 'অনুপ্রবেশকারী'কে যদি বাংলাদেশ সরকার ফিরিয়ে নেয় তবে '৭৪-এর স্থলসীমা চুক্তি বাস্তবায়িত হতে পারে। এটি ছিল একজন রাজনীতিকের বাস্তবতাবিবর্জিত দায়িত্বজ্ঞানহীন একটি মন্তব্য। অনুপ্রবেশকারী কারা, তার কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা নেই, আসামে বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী আদৌ আছে কি নেই, থাকলে কত আছে, তার কোনো গ্রহণযোগ্য উত্তর নেই—এমন একটি বিতর্কিত ও অবস্তুনিষ্ঠ রাজনৈতিক ইস্যুর সঙ্গে জড়ানো হলো বহুল আলোচিত স্থলসীমা চুক্তিকে, যা বাংলাদেশ সরকার ৪১ বছর আগে সংবিধান সংশোধন করে বাস্তবায়ন করেছে এবং যার সঙ্গে ছিটমহলের হাজার হাজার নারী, পুরুষ ও শিশুর জীবন জড়িত। ছিটমহল নিয়ে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি এই পর্যন্ত নেমেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদির প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে কৌশলগত সুসম্পর্ক স্থাপনের বৃহত্তর কর্মসূচি আর বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেসের গঠনমূলক ভূমিকার কারণে আসাম বিজেপির ভোটের রাজনীতি হালে পানি পায়নি। ফলে সব ধরনের জল্পনা-কল্পনা ও ৪১ বছরের অবসান ঘটিয়ে নরেন্দ্র মোদির সরকার স্থলসীমা চুক্তি পার্লামেন্টে অনুসমর্থন করেছে এবং ১০০তম সংশোধনীর মাধ্যমে ছিটমহল বিনিময়ের ক্ষেত্রে এত দিন পর্যন্ত অলঙ্ঘনীয় মনে হওয়া বাধাটি অতিক্রম করেছে। এ ক্ষেত্রে আসামের মুখ্যমন্ত্রী তরুন গগৈও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে সীমান্ত বিল থেকে আসামকে বাদ না দেওয়ার অনুরোধ করেন।

নরেন্দ্র মোদির সরকার যে বিষয়গুলো সামনে এনে স্থলসীমা চুক্তি অনুসমর্থনের বিষয়ে শরিকদের সমর্থন আদায়ে সমর্থ হয়, তা-ও ছিটমহল নিয়ে ভারতের রাজনীতির চিত্রই তুলে ধরে। যে বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছিল তা হলো: ১. স্থলসীমা চুক্তি পাস করানো না গেলে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে যাদের আন্তরিক সহযোগিতায় বিগত বছরগুলোয় ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল শান্ত রয়েছে। ২. স্থলসীমা চুক্তি পাস না করা পর্যন্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণ সম্পন্ন করা যাবে না ৩. বিলটি পাস হলে সীমান্তে অনুপ্রবেশ ঠেকানো সহজ হবে; এবং ৪. এই বিলের সব দায় কংগ্রেসের ঘাড়ে বর্তাবে; আসামের ভোটারদের বোঝানো যাবে যে কংগ্রেসের কারণেই আসামকে বাদ দিয়ে স্থলসীমা চুক্তি পাস করানো যায়নি। এসব বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছার পরই ৪ মে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে স্থলসীমা চুক্তিটি হুবহু পার্লামেন্টে উত্থাপন ও অনুসমর্থনের অনুমোদন দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় সীমান্ত চুক্তিটি হুবহু

অনুমোদনের পর আসাম বিজেপির সভাপতি তাঁর প্রতিক্রিয়ায় সংবাদমাধ্যমে জানিয়েছিলেন, 'আমাদের আর কোনো দায় থাকল না। আসামকে রেখে বিল পাসের ভালো-মন্দের সব দায় এখন মুখ্যমন্ত্রী তরুন গগৈর। আসামবাসীর কাছে তাকেই জবাবদিহি করতে হবে।' স্থলসীমা চুক্তি নিয়ে এমন রাজনৈতিক মনোভাবকে ইঙ্গিত করেই *আনন্দবাজার পত্রিকা* (৫ মে ২০১৫) আসামসহ সীমান্ত বিল অনুসমর্থনের পুনঃসিদ্ধান্তের যে খবর ছেপেছিল, তার শিরোনাম ছিল: 'কংগ্রেসের ঘাড়ে বন্দুক রেখে অসম থাকছেই চুক্তিতে।' এভাবেই ছিটমহল বিনিময়ের মতো একটি মানবিক ইস্যু নিয়ে ভারতে ভোটের রাজনীতি অব্যাহত ছিল ১৯৫৮ সালে নেহরু-নুন চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে ২০১৫ সালে '৭৪-এর স্থলসীমা চুক্তি ভারতের পার্লামেন্টে অনুসমর্থনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। এবং অবশেষে স্থলসীমা চুক্তিটি অনুসমর্থনের মধ্য দিয়েই সেই রাজনীতির অবসান হয়।

স্থলসীমা চুক্তি অনুসমর্থনে ভারত সরকারের বিলম্বিত উদ্যোগ

১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমা চুক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশের আদালতে মামলা হয়েছিল। তবে বাংলাদেশ সরকার দ্রুততম সময়ের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করে। মামলার রায়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ওই চুক্তি বাস্তবায়নের আগে জাতীয় সংসদে অনুসমর্থন করানোর নির্দেশ দিলে বাংলাদেশ সরকার ত্বরিতগতিতে ১৯৭৪ সালের ২৮ নভেম্বর তৃতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে চুক্তিটি সংসদে অনুসমর্থন করে এবং দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অংশ ভারতকে হস্তান্তর করে। কিন্তু দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অংশের দখল বুঝে নেওয়ার পর থেকে এই চুক্তির বাকি অংশ বাস্তবায়নে ভারতের অনীহা দেখা দেয়। অর্থাৎ এই চুক্তির অধীনে দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অংশের দখল বুঝে নেওয়ার পর, এর বিনিময়ে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার জন্য তিনবিঘা করিডর প্রদান এবং ছিটমহল বিনিময়ের প্রসঙ্গে অত্যন্ত অন্যায্য ও বেআইনিভাবে ভারত এই চুক্তির বিষয়ে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে। ভারতেও তিনবিঘা করিডর প্রদানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়। সেই মামলার অজুহাত দেখিয়ে ভারত সরকার স্থলসীমা চুক্তিটি তখন পার্লামেন্টে উত্থাপন করেনি। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে চলা সেই মামলার রায়ে ১৯৯০ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তিনবিঘা করিডর প্রদানের মাধ্যমে ভারতের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগকে একটি "non issue" বলে মামলাটি খারিজ করে দেয়। তারপরেও স্থলসীমা চুক্তিটি পার্লামেন্টে উত্থাপন ও অনুসমর্থন করতে ভারত সরকার ২৫ বছর বিলম্ব করেছে।

দ্বিতীয়বারের মতো সরকার গঠনের পর আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০১০ সালের ভারত সফরকালে ছিটমহল বিনিময়ের বিষয়টি

দ্বিপক্ষীয় আলোচনায় গুরুত্ব পায়। এরপর ২০১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরকে সামনে রেখে ছিটমহল বিনিময়ের বিষয়ে দৃশ্যত তোড়জোড় শুরু হয়। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আশা করা হয়েছিল যে ঢাকা শীর্ষ বৈঠকে ছিটমহল বিনিময় কার্যকর হবে। আশ্বাস মিলেছিল ভারতের পক্ষ থেকেও। মনমোহনের সফরের আগ দিয়ে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে ছিটমহলগুলোয় যৌথ জরিপও হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ২০১১ সালের ঢাকা শীর্ষ বৈঠকে '৭৪-এর স্থলসীমা চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শুধু একটি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

ভারতের কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার ২০১৩ সালে স্থলসীমা চুক্তিটি অনুসমর্থনের চেষ্টা করলেও বিজেপির বিরোধিতার কারণে তা সম্ভব হয়নি। ২০১৪ সালে ভারতের রাজনৈতিক পালাবদলের ফলে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। বিজেপি শুরু থেকেই ছিটমহল বিনিময়ের বিরোধিতা করে এলেও নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার গঠনের পর ছিটমহল বিনিময় ইস্যুতে তারা তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে এবং ২০১৫ সালে স্থলসীমা চুক্তিটি অনুসমর্থনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

যেভাবে অনুসমর্থন পেল স্থলসীমা চুক্তি

২০১৫ সালের জুন মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকে সামনে রেখে স্থলসীমা চুক্তি অনুসমর্থনের বিষয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তৎপর হয়। এই বিলটি যেহেতু ২০১৩ সালে পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়েছিল এবং এই চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১১ সালে একটি প্রটোকলও স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তাই এ নিয়ে বিজেপি সরকারের তেমন কোনো কাজ ছিল না। এ-সংক্রান্ত সব প্রস্তুতি সম্পন্নই ছিল। শুধু পার্লামেন্টে উত্থাপন ও অনুসমর্থনের লক্ষ্যে শরিক দল ও বিরোধী দলগুলোর কাছ থেকে সমর্থন আদায় করাই ছিল বিজেপি সরকারের কাজ। ২০১৫ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হওয়া ভারতের পার্লামেন্টের বাজেট অধিবেশনে স্থলসীমা চুক্তিটি অনুসমর্থনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আসামে স্থলসীমা চুক্তি বিলের বিরোধিতা শুরু হয়, যা আগেই আলোচিত হয়েছে। সেই বিরোধিতা আবার কোনো বিরোধী দলের পক্ষ থেকে নয়, সরকারি দল আসাম বিজেপির পক্ষ থেকেই। তাই আসামকে বাদ দিয়েই এই চুক্তি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। কিন্তু কংগ্রেস এতে আপত্তি জানিয়ে এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নেয়। কারণ, কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারই প্রথম ২০১৩ সালে এই চুক্তিটি অনুসমর্থনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, যা বিজেপির বিরোধিতার কারণে সম্ভব হয়নি। তাই কংগ্রেস স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয় যে কংগ্রেস সরকার যেভাবে ২০১৩ সালে স্থলসীমা বিলটি অনুসমর্থন করতে চেয়েছিল, হুবহু সে রকম না হলে তারা ওই বিলের বিরোধিতা করবে। আসামের মুখ্যমন্ত্রী তরুন গগৈও

স্থলসীমা চুক্তি থেকে আসামকে বাদ দেওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেন। এ অবস্থায়, যেহেতু বিলটি পাস করানোর মতো রাজ্যসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিজেপির ছিল না, সেহেতু কংগ্রেসের দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া বিজেপি সরকারের আর কোনো উপায় ছিল না। আর চলতি অধিবেশনে বিলটি পাস করতে না পারলে সরকার সমস্যায় পড়ত। কারণ, পরবর্তী মাসেই নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। আর নরেন্দ্র মোদির সফরে বাংলাদেশের চাওয়াগুলোর মধ্যে প্রধান দুটি ছিল তিস্তার পানিবণ্টন ও ছিটমহল বিনিময়। তিস্তার পানিবণ্টনের অনিশ্চয়তা সম্পর্কে নরেন্দ্র মোদি ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ অবস্থায় স্থলসীমা চুক্তিটিও অনুসমর্থন করানো না গেলে তাঁর বাংলাদেশ সফরটি অনিশ্চয়তার মুখে পড়ত। এ অবস্থায়, বিজেপি সরকার কংগ্রেসের দাবি মেনে নিয়েই স্থলসীমা চুক্তি অনুসমর্থনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

২০১৫ সালের ৫ মে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা স্থলসীমা চুক্তিটি হুবহু অনুসমর্থনের অনুমোদন দেওয়ার পর ৬ মে সীমান্ত বিলটি রাজ্যসভায় উত্থাপিত হয় এবং সব অনিশ্চয়তা কাটিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে তা পাস হয়। রাজ্যসভার ১৮১ সদস্যের সবাই এর পক্ষে ভোট দেয়। *আনন্দবাজার পত্রিকা*, (৭ মে ২০১৫) স্থলসীমা বিল পাসের খবরে লেখে : 'ঘড়ির কাঁটা তখন সাড়ে চারটা ছুঁই ছুঁই। ভারত-বাংলাদেশ স্থলসীমা চুক্তি নিয়ে ভোটাভুটি শেষ। ফলাফল ফুটে উঠেছে রাজ্যসভার স্কোরবোর্ডে। ডেপুটি চেয়ারম্যান পি জে কুরিয়েন আবেগঘন কণ্ঠে বলেই ফেললেন, নতুন ইতিহাস তৈরি হলো আজ।' সত্যিই এটি একটি নতুন ইতিহাস। এর পরের দিন ৭ মে ভারতের লোকসভায়ও সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয় সীমান্ত বিল। তবে রাজ্যসভায় বিলটির কোনো বিরোধিতা না হলেও লোকসভায় আসামের রাজনৈতিক দল অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট এই বিলের বিরোধিতা করে। তিন সদস্যবিশিষ্ট এই রাজনৈতিক দলের নেতা সিরাজুদ্দিন আজমল বলেন, এই বিল পাস হলে আসামের বিন্দুমাত্র উপকার হবে না। রাজ্যের প্রচুর জমি বাংলাদেশ পেয়ে যাবে। তিনি বিলটি প্রত্যাহার করতে বলেন। তাঁর বক্তব্যের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ বলেন, 'আপনারা আপনাদের বক্তব্য পেশ করেছেন, তা রেকর্ডেও থাকল। তাই অনুরোধ, আপনারা বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন না। আমরা যে রাজনীতির উর্ধ্বেও উঠতে পারি, তা গোটা পৃথিবীকে দেখানো দরকার।' পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অনুরোধ মেনে তারা বিলের পক্ষেই ভোট দেন।

এর আগে, ছিটমহল বিনিময়ের ফলে নতুন করে ভারতের নাগরিকত্ব পেতে যাওয়া ছিটমহলের মানুষদের পুনর্বাসনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক অনুদানের যে প্যাকেজ দাবি করেছিল, তা কোনো প্রকার কাটছাঁট না করেই অনুমোদন দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। পররাষ্ট্রমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ লোকসভাকে জানান,

পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৩০০৯ কোটি রুপি বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এই অর্থের ৭৭৫ কোটি খরচ করা হবে অবকাঠামো উন্নয়নে। বাকি ২ হাজার ২৩৪ কোটি খরচ হবে যারা বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করবে, তাদের পুনর্বাসনে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ছিটমহল বিনিময়ে আর যেন কোনো প্রশ্ন উত্থাপন না করতে পারেন, সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ অর্থই বরাদ্দ দেওয়া হয়। তবে সংবাদমাধ্যম থেকে প্রাপ্ত সর্বশেষ সংবাদ অনুযায়ী বাংলাদেশের ভেতরের ছিটমহল থেকে প্রত্যাশিত সংখ্যক মানুষ ভারতে যেতে না চাওয়ায় এদের পুনর্বাসনের অর্থ কমিয়ে ১ হাজার কোটি রুপি করা হয়েছে।

রাজ্যসভা ও লোকসভায় সর্বসম্মতিক্রমে পাস হওয়ার পরও সীমান্ত বিল নিয়ে নতুন করে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয় বিলটিতে একটি 'টেকনিক্যাল এরর' থাকায়। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হামিদ আনসারীর চোখে ধরা পড়া 'টেকনিক্যাল এরর'টি ছিল, ২০১৩ সালে যে বিলটি উত্থাপন করা হয়েছিল, তা ছিল ১১৯তম সংশোধন বিল। কিন্তু পাসের পর তা হয় সংবিধানের ১০০তম সংশোধনী। এই পার্থক্যটি সব জায়গায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হয়। রাজ্যসভায় আলোচনাকালে সর্বত্র তা করা হলেও 'শিডিউলিং'-এ বাদ পড়ে যায়। ফলে বিলটি পাস হলেও তা গ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। তাই নতুন করে ১১ মে বিলটি রাজ্যসভায় উত্থাপিত হয় এবং ভুল সংশোধন করে পুনরায় সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়। তবে স্থলসীমা চুক্তি বাস্তবায়নের আগে এই সংশোধনীটি ভারতের রাজ্য বিধানসভাগুলোর অন্তত ৫০ শতাংশের অনুমোদন লাগবে। আর এই কাজটি শেষ করতে অন্তত ছয় মাস সময় লাগবে।

ছিটমহল বিনিময়ের যৌথ প্রক্রিয়া

২০১৫ সালের ৬ জুন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরকালীন ভারত-বাংলাদেশ শীর্ষ বৈঠকে ১৯৭৪ সালের স্থলসীমা চুক্তি ভারতের পার্লামেন্টে অনুসমর্থনের দলিল 'লেটার অব র‍্যাটিফিকেশন' এবং ওই চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত ২০১১ সালের প্রটোকল বাংলাদেশকে হস্তান্তর করা হয়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভাও ২০১১ সালের প্রটোকলটি অনুমোদন দেয়। স্থলসীমান্ত চুক্তির দলিল বিনিময়-সংক্রান্ত বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্রসচিব স্বাক্ষরিত পত্রে বলা হয়, ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমা চুক্তি এবং ২০১১ সালের প্রটোকল অনুযায়ী ২০১৫ সালের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যরাত থেকে দুই দেশের ছিটমহল বিনিময় কার্যকর হবে। অর্থাৎ ওই সময় থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ১৭ হাজার ১৬০ দশমিক ৬৩ একর আয়তনের ভারতীয় ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশের ভূখণ্ডে পরিণত হবে। অন্যপক্ষে ভারতের অভ্যন্তরে থাকা ৭ হাজার ১১০ দশমিক ২ একর

আয়তনের ৫১টি বাংলাদেশি ছিটমহল ভারতের ভূখণ্ডে পরিণত হবে। ওই পত্রে ৩১ জুলাইকে 'অ্যাপয়েন্টেড ডে' বা নিরূপিত দিন হিসেবে ধার্য করা হয়েছে। এবং ওই নিরূপিত দিনের আগেই দুই দেশের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা যৌথভাবে ছিটমহল এলাকা পরিদর্শন করবেন এবং প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাজকর্ম সম্পন্ন করবেন।

ছিটমহল বিনিময়সহ সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ২০১১ সালের প্রটোকল অনুযায়ী ছিটমহল বিনিময়সহ স্থলসীমা চুক্তি বাস্তবায়নের রূপরেখা চূড়ান্ত বলে ইতিমধ্যেই খবর বেরিয়েছে। রূপরেখা অনুযায়ী ২০১৫ সালের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যরাত থেকে ছিটমহল বিনিময় কার্যকর হবে এবং এ সময়ের মধ্যেই ছিটমহলবাসীকে তাদের পছন্দ অনুযায়ী ভারত কিংবা বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বেছে নেওয়ার আবেদন করতে হবে। ২০১১ সালের জুলাই মাসে ছিটমহলগুলোয় যৌথ জরিপের সময় যারা তালিকাবদ্ধ হয়েছে এবং ওই সময় থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যেসব শিশু ছিটমহলগুলোয় জন্মগ্রহণ করেছে, তারা এই সুযোগ পাবে।

ভারত বা বাংলাদেশের ছিটমহলে বসবাসকারী যেসব মানুষ ভূখণ্ড পরিবর্তন করতে চায় আর যারা বর্তমান ভূখণ্ডেই থাকতে চায়, তাদের চিহ্নিত করবে দুই দেশের যৌথ পরিদর্শক দল এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন। উভয় দেশের ছিটমহলবাসীর সামনে দুটি সুযোগই উন্মুক্ত আছে। ভূখণ্ড পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজ নিজ পছন্দের দেশে চিরস্থায়ীভাবে চলে যেতে হবে। অর্থাৎ যারা ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিটমহল থেকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করতে চায়, আর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিটমহল থেকে ভারতীয় নাগরিকত্ব নিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে চায়, তাদের ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বরের মধ্যেই কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। এই সময় পর্যন্ত তারা বাংলাদেশ ও ভারতের মূল ভূখণ্ডে কী ধরনের ভ্রমণ দলিল নিয়ে যাতায়াত করতে পারবে, তা উভয় দেশের সম্মতিতে ঠিক করা হবে। এই নাগরিকত্ব বিনিময়ের কর্মকৌশল ঠিক করবে ২০০০ সালে গঠিত জয়েন্ট বাউন্ডারি ওয়ার্কিং গ্রুপ জেবিডব্লিউজি। উল্লেখ্য, ২০১০ সালে এই গ্রুপ কাজ শুরু করে এবং ২০১১ সালের প্রটোকল স্বাক্ষর হয় তাদের সুপারিশের আলোকেই। নাগরিকত্ব বিনিময়ের পরও এ নিয়ে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানে ২০২০ সালের জুন মাস পর্যন্ত এ কর্মকৌশল প্রযোজ্য হবে। ২০১৬ সালের ৩০ জুনের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত অপদখলীয় জমি ও অমীমাংসিত সীমানার ম্যাপ তৈরি ও বিনিময় করা হবে।

স্থলসীমা চুক্তি অনুযায়ী, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামের সঙ্গে বাংলাদেশের ৬ দশমিক ১ কিলোমিটার স্থলসীমানা চিহ্নিত হবে। সর্বমোট ১৬২টি ছিটমহল বিনিময় হবে (১৯৯৭ সালের যৌথ হিসাব অনুযায়ী)। বাংলাদেশের

অভ্যন্তরে থাকা ১১১টি ছিটমহল (লালমনিরহাটে ৫৯টি, পঞ্চগড়ে ৩৬টি, কুড়িগ্রামে ১২টি ও নীলফামারীতে চারটি) বাংলাদেশ পাবে যার আয়তন ১৭১৫৮ একর। আর ভারতের অভ্যন্তরে থাকা ৫১টি ছিটমহল (কোচবিহারে ৪৭টি, জলপাইগুড়িতে চারটি) ভারত পাবে যার আয়োতন ৭১১০ একর। অপদখলীয় ভূমির ২২৬৭ দশমিক ৬৮২ একর থাকবে বাংলাদেশের কাছে এবং ২৭৭৭ দশমিক ০৩৮ একর থাকবে ভারতের।

নাগরিকত্ব গ্রহণের সুযোগ : ছিটমহলবাসীর উভয় সংকট

ছিটমহল বিনিময়ের প্রক্রিয়ায়, ছিটমহলের সব মানুষকে দুই দেশের যেকোনো একটির নাগরিকত্ব বেছে নেওয়ার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে অবশেষে মানবাধিকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই অপূর্ব সুযোগটিও ছিটমহলের মানুষদের জন্য উভয় সংকট সৃষ্টি করেছে। অবশ্য ছিটমহলের মানুষদের জীবনে এমন উভয় সংকট নতুন কিছু নয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের মাধ্যমে ছিটমহলসহ বাংলা ও পাঞ্জাবের লাখ লাখ মানুষের জীবনেও নেমে এসেছিল এমন উভয় সংকট। ২০১৫ সালে নাগরিকত্ব গ্রহণ-সংক্রান্ত এই সংকট অনেকটা বেদনার হলেও সেই সময়ের সংকট ছিল জীবন-মরণ সংকট। সাদাত হাসান মান্টুর বিখ্যাত ছোটগল্প *টোবা টেক সিং*-এ যার একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। এই গল্পের একটি চরিত্র লাহোরের এক হিন্দু উকিল। প্রেমে ব্যর্থ হয়ে পাগল হয়ে যাওয়ার পর তার পাগলা গারদে ঠাঁই হয়। সেখানে যখন খবর এল যে পাঞ্জাব ভাগ হয়েছে এবং পাঞ্জাবের অমৃতসর ভারতে পড়েছে তখন সে খুবই কষ্ট পায়। কারণ, তার প্রেমিকা অমৃতসরে থাকে। তাই পাকিস্তান থেকে অমৃতসর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার কথা শুনে সব হিন্দু ও মুসলমান নেতাকে সে গালমন্দ করছিল যারা দেশ ভাগ করে তাকে পাকিস্তানে ফেলেছে আর তার প্রিয়তমাকে ফেলেছে ভারতে। কিন্তু পরক্ষণেই যখন তাকে বলা হলো যে তাকে ভারতে পাঠানো হবে, তখন সে ভারতে যেতে অস্বীকার করল। কারণ, অমৃতসরে গেলে সেখানে তার ওকালতি ব্যবসা ভালো হবে না। *টোবা টেক সিং* ছোটগল্পের এই চরিত্রের উভয় সংকট—একদিকে তার প্রিয়তমা আরেক দিকে তার পেশা। ভারতবর্ষের অসংখ্য মানুষের জীবনে এমন উভয় সংকট সৃষ্টি করেছিল র‍্যাডক্লিফের সীমানারেখা। প্রায় সাত দশকের অন্ধকার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আবারও উভয় সংকটে পড়েছে ছিটমহলের অধিবাসীরা। অবশেষে তারা যখন নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ পেল, তখন এই সুযোগটি গ্রহণ করলে তাদের ছাড়তে হবে আপন ঘর ও পৈতৃক ভিটা। এখন তারা কোনটি বেছে নেবে? নিজের পৈতৃক বসত-ভিটা নাকি যে দেশটি নিজের দেশ হওয়ার কথা ছিল সেটি? এর চেয়ে বড় উভয় সংকটে কেউ

কি কখনো পড়েছে! আমার গবেষণায় যতটুকু দেখেছি, ছিটমহলের অধিকাংশ মানুষ তার আপন ঘর, পৈতৃক বসত-ভিটা এবং যে সমাজের ওপর আশ্রয় করে সাত দশক ধরে টিকে আছে, তা ছেড়ে অন্য দেশে যাবে না। সেখানে তাদের নাগরিকত্ব না থাকলেও তার চারপাশের ভিনদেশি মানুষদের সঙ্গে একটা সামাজিক সম্পর্ক ঠিকই ছিল। প্রকৃতপক্ষে, ওই সামাজিক সম্পর্কের ওপর নির্ভর করেই ওই মানুষগুলো রাষ্ট্রহীন জীবন যাপন করতে সমর্থ হয়েছে। সেখানে তাদের জন্য বহুবিধ বঞ্চনা যেমন ছিল, বেঁচে থাকার অবলম্বনও ছিল। তা ছাড়া একটি নতুন দেশে গিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করার ঝুঁকি নেওয়ার মতো মানসিক দৃঢ়তা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সেই মানুষগুলোর থাকার কথা নয়। ছিটমহলে যারা এখন ভূমিহীন, যাদের সামান্যতম কর্মসংস্থান নেই, যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয়, যাদের সেখানে কোনো আশা নেই; তারাই হয়তো নতুন দেশের উদ্দেশে পা বাড়াবে। এবং সেই সংখ্যটি খুবই কম হওয়ার সম্ভাবনা।

ছিটমহল বিনিময়ে দ্বিপক্ষীয় চ্যালেঞ্জগুলো

ছিটমহল বিনিময়ের ক্ষেত্রে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান, যেগুলোর ব্যাপারে মাঠপর্যায়ে গবেষণা ছাড়া সঠিক কর্মকৌশল ঠিক করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার টেবিল থেকে ন্যায্যতা অর্জন করাও সম্ভব নয়। বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে যৌথ বিষয়াবলিতে ভারতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত এবং এটি ধরে রাখার মতো সক্ষমতাও তাদের আছে। এমন একটি প্রতিবেশীর কাছ থেকে দর-কষাকষির মাধ্যমে ন্যায্যতা আদায় করার সক্ষমতা বাংলাদেশের অর্জন করতে হবে। যাতে প্রয়োজনে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার টেবিলে হোক, কোনো কূটনৈতিক চ্যানেলে হোক বা জন-আলোচনায় (public discourse) হোক, সঠিক তথ্য-উপাত্ত হাজির করে ন্যায্যতার দাবিতে দর-কষাকষি করা সম্ভব হয়। ছিটমহল বিনিময়ের ক্ষেত্রেও এমন কিছু বিষয় এখনো বিদ্যমান, যেগুলোর বিষয়ে যৌথ আলোচনায় সঠিক তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরে ন্যায্যতা অর্জনের চেষ্টা করা প্রয়োজন।

দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা বিতর্ক

ছিটমহল বিনিময়ের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর নতুন করে বিতর্ক শুরু হয়েছে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গের অনেকেই দাবি তুলেছেন যে সব ছিটমহলই যেহেতু বিনিময় হবে, তাহলে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতাও বিনিময় হয়ে ভারতের সঙ্গে যুক্ত হবে না কেন? দহগ্রাম-আঙ্গরপোতাকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করা এবং তিনবিঘা করিডর বন্ধের দাবিতে কুচলিবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ২৪

ঘণ্টার বন্‌ধের (হরতাল) ডাক দিয়েছিল কুচলিবাড়ী সংগ্রাম কমিটি। কোচবিহার জেলা বিজেপিও ওই দাবি সমর্থন করেছিল। এই নিয়ে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলোতে অনেক বিভ্রান্তিকর খবর ছাপা হয়েছে। বিভ্রান্তিকর খবর ছেপেছে পশ্চিমবঙ্গের দৈনিক *আনন্দবাজার পত্রিকাও*। পত্রিকাটির 'তিনবিঘা করিডর রয়েই গেল, ফের আন্দোলন' শীর্ষক একটি খবরে প্রশ্ন তোলা হয়: 'ছিটমহল বিনিময় হলে কেন দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ভারতের হবে না?' ১৯৯২ সালে কেন তিনবিঘা করিডর প্রদান করা হয়েছিল সেই প্রশ্নও তোলা হয়। কিন্তু '৭৪-এর স্থলসীমা চুক্তিতে কী আছে, তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেনি এই প্রভাবশালী পত্রিকাটি। অন্যদিকে ফরওয়ার্ড ব্লক তিনবিঘা করিডরের প্রতিবাদে আবারও আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে। তারা ১৯৯২ সালেও বিজেপির সঙ্গে যৌথভাবে তিনবিঘা করিডরের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। কিন্তু তারা এ সত্যটুকু জানে না যে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ফেরত নিতে চাইলে বাংলাদেশকে ফেরত দিতে হবে ১২ নম্বর দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ অংশের আনুমানিক ২ দশমিক ৬৪ বর্গমাইল এলাকা। এই বিভ্রান্তি দূর করার জন্য স্থলসীমা চুক্তির অনুচ্ছেদ ১ এর ১২ ও ১৪ নম্বর সেকশন দুটি আলোচনা করা দরকার। অনুচ্ছেদ ১-এর ১২ নম্বর সেকশনে বলা হয় যে ১৪ নম্বর সেকশনে উল্লিখিত ছিটমহল (দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা) ছাড়া বাংলাদেশ ও ভারতের সবগুলো ছিটমহল অনতিবিলম্বে বিনিময় করা হবে, বাংলাদেশ যে বাড়তি জায়গা পাবে, তার জন্য কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ ছাড়াই। এবং ১৪ নম্বর সেকশনে বলা হয় যে ১২ নম্বর দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণ অংশ ও সংলগ্ন ছিটমহলগুলো ভারতের থাকবে, যার আনুমানিক আয়তন ২ দশমিক ৬৪ বর্গমাইল। তার বিনিময়ে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহল বাংলাদেশের হবে। দহগ্রামকে বাংলাদেশের পাটগ্রাম থানার পানবাড়ী মৌজার সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য ভারত তিনবিঘার নিকটে ১৭৮ মিটার × ৮৫ মিটার পরিমাণ জায়গা বাংলাদেশকে চিরস্থায়ীভাবে ইজারা দেবে।

এখানে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে যে সব ছিটমহল বিনিময় হলেও দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা বাংলাদেশেরই থাকবে। কারণ দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অংশের বিনিময়ে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলকে বাংলাদেশকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অংশের সঙ্গে বিনিময় হয়েই দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এবং ভারত দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অংশের দখল বুঝে নিয়েছে ১৯৭৪ সালেই। সুতরাং এখন যারা নতুন করে দাবি করছে যে ছিটমহল বিনিময় হলে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতাও বিনিময় হয়ে ভারতের ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবে, তারা স্থলসীমা চুক্তিটি সম্পর্কে অবগত নয়। তা ছাড়া তিনবিঘা

করিডরের মাধ্যমে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর থেকে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা আর ছিটমহল নেই। ১৯৯২ সাল থেকে এটি বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা নিয়ে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করার বা ভারতের পক্ষ থেকে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা দাবি করার যেমন কোনো সুযোগ নেই, তেমনি তিনবিঘা করিডর বন্ধ করে দেওয়ারও কোনো সুযোগ নেই।

'তিনবিঘা' করিডর প্রসঙ্গ

বাংলাদেশের পাটগ্রাম উপজেলার সীমান্তবর্তী পানবাড়ী মৌজা থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেক্‌লিগঞ্জে অবস্থিত দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলের দূরত্ব ১৭৮ মিটার। 'তিনবিঘা' নামক স্থানে এই ১৭৮ মিটার দৈর্ঘ্যের ভারতীয় ভূখণ্ড অতিক্রম করেই বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় যেতে হয়। ১৯৭৪ সালে স্বাক্ষরিত স্থলসীমা চুক্তি অনুযায়ী সেই 'তিনবিঘা' নামক স্থানে ১৭৮ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৮৫ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট একটি ভূখণ্ড করিডর হিসেবে বাংলাদেশকে চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দেওয়ার কথা। তাই করিডরটি 'তিনবিঘা' করিডর নামে পরিচিতি পেয়েছে। স্থলসীমা চুক্তিতে দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অংশের বিনিময়ে 'তিনবিঘা' করিডর দেওয়ার কথা থাকলেও ১৯৯২ সাল পর্যন্ত তার বাস্তবায়ন হয়নি। বাংলাদেশের কূটনৈতিক তৎপরতায় ১৯৮২ ও ১৯৯২ সালে নতুন করে আরও দুটি ইজারা শর্ত স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ১৯৯২ সালের ২৬ জুন আনুমানিক তিন-চার মিটার প্রস্থবিশিষ্ট একটি সরু রাস্তা পার্টটাইম ভিত্তিতে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার মানুষকে দেওয়া হয় বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডে যাতায়াতের জন্য। সেই রাস্তাটিই এখনো 'তিনবিঘা' করিডর নামে পরিচিত। দুই পাশে সশস্ত্র বিএসএফের সার্বক্ষণিক পাহারায় ভারতের ফটকসমৃদ্ধ রাস্তাটি শুরুতে শুধু দিনের বেলায় প্রতি দুই ঘণ্টা পরপর এক ঘণ্টা করে দিনে মোট তিন ঘণ্টা খোলা রাখা হতো। এর তিন মাস পর থেকে প্রতি এক ঘণ্টা পর এক ঘণ্টা করে শুধু দিনের বেলায় মোট ছয় ঘণ্টা খোলা রাখা হতো। ২০০১ সালে রাস্তাটি সকাল ছয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ১২ ঘণ্টা খোলা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। অবশেষে ২০১১ সালের ঢাকা শীর্ষ বৈঠকের মাধ্যমে রাস্তাটি সার্বক্ষণিকভাবে খুলে দেওয়া হয়।

এখানে যে বিষয়টি মনে রাখা দরকার তা হলো ১৯৭৪ সালের স্থলসীমা চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অংশের ২.৬৪ বর্গমাইল এলাকার বিনিময়ে 'তিনবিঘা' নামক স্থানে ১৭৮ মিটার × ৮৫ মিটার আয়তনের একটি করিডর চিরস্থায়ীভাবে বন্দোবস্ত দিয়ে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতাকে বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করার কথা। ওই চুক্তির আর্টিকেল ১ এর ১৪ নম্বর সেকশনে বলা

হয়েছে, "India will retain the southern half of South Berubari Union no. 12 and the adjacent enclaves, measuring an area of 2.64 square miles approximately, and in exchange Bangladesh will retain Dhahagram and Angarpota enclaves. India will lease in perpetuity to Bangladesh an area of 178 meters × 85 meters near 'Tin Bigha' to connect Dhahagram with Panbari Mouza (P.S. Patgram) of Bangladesh." সে অনুযায়ী বাংলাদেশ দক্ষিণ বেরুবাড়ীর দক্ষিণ অংশ ভারতকে ১৯৭৪ সালেই ছেড়ে দিয়েছে এবং তার ওপর ভারতের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং এর বিনিময়ে ১৭৮ মিটার × ৮৫ মিটার আয়তনের একটি করিডর বাংলাদেশের পাওয়ার কথা এবং সেখানে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে দেওয়া হয়েছে মাত্র তিন-চার মিটার প্রস্থবিশিষ্ট একটি সরু রাস্তা, যার ওপর রয়েছে সশস্ত্র পাহারাধীন ভারতীয় ফটক ও ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ। দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার মানুষের ওপর ভারতীয় নিয়ন্ত্রণের উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার মানুষ এখন পর্যন্ত বিএসএফ কর্তৃক নির্দিষ্ট সংখ্যার বেশি গবাদিপশু বাংলাদেশের হাটে নিতে পারে না। একটি স্বাধীন দেশের প্রায় বিশ হাজার স্বাধীন, বেসামরিক মানুষের জন্য এ রকম ফটকসমৃদ্ধ সরু পথে সার্বক্ষণিক সশস্ত্র পাহারায় নিয়ন্ত্রিত যাতায়াতের ব্যবস্থা যৌক্তিকও নয়, মানবিকও নয়, যা '৭৪-এর স্থলসীমা চুক্তিতেও অনুধাবিত হয়েছে এবং করিডরটির প্রস্থ নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৫ মিটার। এখন যেহেতু '৭৪-এর স্থলসীমা চুক্তি বাস্তবায়ন হচ্ছে তাই সেই চুক্তি অনুযায়ী কোনো সরু রাস্তা নয়, বরং ১৭৮ মিটার × ৮৫ মিটার আয়তনের একটি করিডর দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার মানুষের জন্য অবমুক্ত করা উচিত।

স্থলসীমা চুক্তি বাস্তবায়নের পর 'তিনবিঘা' নামক স্থানে বাংলাদেশকে বন্দোবস্ত দেওয়া ১৭৮ মিটার × ৮৫ মিটার জায়গার মধ্যে ভারতীয় যেকোনো ফটক বা স্থাপনা এবং বিএসএফ বা ভারতীয় যেকোনো বাহিনীর অবস্থান বা টহল হবে '৭৪-এর স্থলসীমা চুক্তির সঙ্গে সাংঘর্ষিক। 'তিনবিঘা' করিডরের বর্তমান অবকাঠামো ও এর ব্যবস্থাপনা মানবাধিকারের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক। তাই ছিটমহল বিনিময় কার্যকরের সঙ্গে সঙ্গে ওই নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমি অবমুক্ত করে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার মানুষের যাতায়াতের জন্য সেখানে একটি বেসামরিক ও মুক্ত পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। স্থলসীমা চুক্তি বাস্তবায়ন ও ছিটমহল বিনিময়ের চলমান প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বাংলাদেশ সরকার যদি দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার মানুষের জন্য এই ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মনোযোগী না হয় তাহলে পরে আর তা সম্ভব হবে না। এবং দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার মানুষও প্রকৃত মুক্তির স্বাদ কখনোই পাবে না।

ছিটমহলের উন্নয়ন চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রায় সাত দশক ধরে রাষ্ট্রের বাইরে থাকার ফলে ছিটমহলের মানুষের যাপিত জীবনের বাস্তবতা সত্যি নির্মম। বংশপরম্পরায় সব ধরনের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত এই মানুষগুলোকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই কাজটি করার জন্য অর্থ যেমন দরকার, তেমনি দরকার সঠিক কর্মপরিকল্পনা। সেখানকার মানুষের খাদ্যনিরাপত্তা, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, যাতায়াত ও যোগাযোগব্যবস্থাসহ রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ সেবাসমূহ নিশ্চিত করার জন্য দরকার স্বল্পমেয়াদি, মধ্যম মেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা। মনে রাখতে হবে যে সব ধরনের মৌলিক অধিকারসহ রাষ্ট্র ও আধুনিক সভ্যতার কোনো ছোঁয়াই ছিটমহলের মানুষ এখন পর্যন্ত পায়নি। সুতরাং সব ধরনের মৌলিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদের জীবনমান পরিবর্তন করে তাদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার কাজটি তাৎক্ষণিকভাবে করা সম্ভব নয়। সে কারণেই ছিটমহলের মানুষের প্রয়োজনীয়তার ধরন ও সেগুলোর বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়ার ধরন বিবেচনায় ওপরে উল্লিখিত তিন স্তরের উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হবে। সমগ্র উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যেহেতু সরকারের বিভিন্ন সংস্থাকে সম্পৃক্ত হতে হবে, তাই আমলাতন্ত্রের কাঠিন্য ও কালক্ষেপণের সংস্কৃতি যেন এখানকার উন্নয়ন কর্মসূচিকে বাধাগ্রস্ত না করে সে জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক হতে হবে এবং সবার মাঝে সমন্বয় থাকতে হবে।

প্রথমেই নজর দিতে হবে তাৎক্ষণিক পুনর্বাসনে। বাংলাদেশ সরকার ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে ছিটমহলবাসীর পুনর্বাসনের জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে। এই বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দকৃত অর্থের তুলনায় খুবই কম। তবু সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্তভাবে যদি এই অর্থ ব্যয় করা যায়, তাহলে অনেক কিছুই করা সম্ভব। পাশাপাশি মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য আগামী কয়েকটি অর্থবছরেও বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ অব্যাহত রাখতে হবে। যেমন দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলের একটি বড় সমস্যা হলো এর পশ্চিম ও দক্ষিণ পাশের সীমানা নির্ধারণী তিস্তা নদীর ভাঙন। তিস্তা নদী দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা অংশে ভাঙার ফলে নদীতে বিলীন হয়ে যাওয়া অংশ ধীরে ধীরে নদীর ওপারে পড়ে ভারতের অপদখলে চলে যাচ্ছে। এই ভাঙন ঠেকাতে সরকারকে মধ্যম মেয়াদি প্রকল্প হাতে নিতে হবে। ছিটমহলের মানুষের শিক্ষা নিয়ে সরকারকে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা করতে হবে। এসব কাজে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থাগুলোর কাছ থেকেও সহযোগিতা পাওয়া সম্ভব। ইতিমধ্যেই ইউএনডিপি প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ছিটমহলের মানুষকে মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

ছিটমহল বিনিময়কে কেন্দ্র করে ভারতীয় নাগরিকত্ব পেতে একটি অসাধু চক্র ইতিমধ্যে সক্রিয় হয়েছে। ছিটমহলগুলোতে গোপনে তৈরি হচ্ছে জাল প্রমাণপত্র। এ কাজে সহায়তা করছেন কিছু আইনজীবী, রাজনীতিবিদ ও এনজিও কর্মকর্তা। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার এ-সংক্রান্ত একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন দিল্লি ও ঢাকায় প্রেরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহলকে কেন্দ্র করে এমন জালিয়াত চক্রের তৎপরতা নতুন কিছু নয়। এর আগেও এই চক্র ছিটমহলের জাল পরিচয়পত্র তৈরি করে দুই দেশে যাওয়া-আসা করত। যে কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরের ভারতীয় ছিটের নাগরিকেরা আগে ভারতে যাতায়াত করার সুযোগ পেলেও পরে ভারত সরকার তা বন্ধ করে দেয়। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে থাকা দেউলডাঙ্গা, দাশিয়ার ছড়া (কুড়িগ্রাম), শালবাড়ী, কাজলদীঘিসহ (লালমনিরহাট) বেশ কয়েকটি ছিটমহলের বাসিন্দাদের জমিজমা, ঘরবাড়ি ছেড়ে ভারতে চলে যাওয়ার জন্য হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই হুমকিদাতাদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার, ছিটমহলের বাসিন্দারা ভারতে চলে গেলেই তাদের জমিজমা, ঘরবাড়ি নির্বিঘ্নে দখল করা যাবে। এই দুষ্ট চক্রকে আইনের আওতায় আনতে হবে এবং তারা যেন ছিটমহলের মানুষদের জিম্মি করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষা ও চাকরি প্রসঙ্গ

প্রায় সাত দশক ধরে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত এই মানুষগুলোর জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে একধরনের ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ নিয়ে ভাবতে হবে। যে মানুষগুলোর শিক্ষার বয়স পেরিয়ে গেছে, তাদের জন্য গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা ছাড়া হয়তো আর কিছু করার সুযোগ নেই। কিন্তু তাদের সন্তানদের বিশেষ বিবেচনায়, যোগ্যতা শিথিল করে শিক্ষার সুযোগ দেওয়ার মাধ্যমে তাদের ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে দেওয়া সম্ভব। এসব বিবেচনায়, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছিটমহলের মানুষের জন্য শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও বয়স শিথিল করে কোটা ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। যারা ইতিমধ্যে কোনো না কোনোভাবে শিক্ষা লাভ করেছে, তাদের বিশেষ ব্যবস্থায় চাকরির সুযোগ করে দিতে হবে। ছিটমহলে অনেকেই আছে, যারা শিক্ষাজীবন শেষ করে চাকরি পাওয়ার পরও পুলিশ ভেরিফিকেশনে ছিটের লোক প্রমাণিত হওয়ায় চাকরি হারিয়েছে। তাদের খুঁজে বের করে চাকরি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

দেশ পরিবর্তনকারীদের শিক্ষাসনদ নিয়ে অনিশ্চয়তা

ছিটমহল বিনিময়ের প্রক্রিয়ায় যারা দেশ পরিবর্তন করবে, শুরুতে তারা অনেক বিষয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে সন্দেহ নেই। শিক্ষাসনদ তার মধ্যে অন্যতম। প্রায়

সাত দশক পরে যখন তারা নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন করবে, সে দেশে বর্তমান দেশের শিক্ষাসনদ গ্রহণ করা হবে কি না, এ নিয়ে ছিটমহলের মানুষের মাঝে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা শুরু হয়েছে। ছিটমহলের অনেকেই ভারত বা বাংলাদেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করেছে। তারাও চাকরি ছেড়ে দেশ পরিবর্তন করলে নতুন দেশে চাকরি পাবে কি না, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে। এই মানুষগুলোকেও যেন সমমর্যাদার চাকরির ব্যবস্থা করা হয়। নতুন দেশে আগের শিক্ষাসনদের গ্রহণযোগ্যতা যদি না থাকে তাহলে ওই শিক্ষিত মানুষগুলো রাতারাতি অশিক্ষিত মানুষে পরিণত হবে। সে ক্ষেত্রে তারা যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এই বিষয়টি উভয় দেশের সরকারকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে এবং তাদের স্ব স্ব দেশের সমমানের সনদ প্রদানের ব্যবস্থা ও যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

ছিটমহলের জমির মালিকানাসংক্রান্ত জটিলতা

ছিটমহলের জমির প্রকৃত মালিকানা নির্ধারণ করার বিষয়ে সরকারকে সতর্ক থাকতে হবে। ছিটমহলের জমির মালিকদের কাছে মালিকানাসংক্রান্ত কোনো দলিলপত্র নেই। সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসগুলোতে নেই ছিটমহলের ভূমিসংক্রান্ত কোনো নকশা বা খতিয়ান। ছিটমহলসমৃদ্ধ মৌজাগুলোর নকশায় ছিটমহলের জায়গাগুলো ফাঁকা আছে। ছিটমহলের অনেক জমির প্রকৃত মালিককে হয়তো এখন আর পাওয়াই যাবে না। ছিটমহলগুলোতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাসজমি আছে, যার অধিকাংশই স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দখলে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পরবর্তী দীর্ঘস্থায়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বাস্তবতায় ছিটমহলের বাসিন্দাদের অনেকেই জীবন বাঁচাতে ধর্মের পরিচয়ের অনুকূল দেশে পাড়ি জমায়। সীমান্তের এপার-ওপার পাড়ি জমানো ছিটমহলবাসীর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে ছিটমহলের জমিজমা ও বসতভিটা বিনিময় হয়েছে। অর্থাৎ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিটমহলগুলোর অনেক হিন্দু অধিবাসী ভারতে চলে যায় এবং ভারতের ভূখণ্ডে অবস্থিত কোনো ছিটমহলে আশ্রয় গ্রহণ করে। একইভাবে ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত ছিটমহলগুলোর অনেক মুসলমান অধিবাসী পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসে এবং পূর্ব পাকিস্তানের ভূখণ্ডে অবস্থিত কোনো ছিটমহলে আশ্রয় গ্রহণ করে। সীমান্ত অতিক্রম করা এই ছিটমহলবাসীর অনেকেই পরস্পরের সঙ্গে বসতভিটা ও জমিজমা বিনিময় করে একে অন্যের জায়গায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সেই থেকে তারা সেখানেই আছে। এসব ক্ষেত্রে তাদের কাছে জমির মালিকানাসংক্রান্ত কোনো দলিলপত্র থাকার কথা নয়। এসব মানুষকে জমির মালিকানাসংক্রান্ত বৈধ দলিলপত্র প্রদান করতে হবে। মালিকানা নির্ধারণ ও

ছিটমহলগুলোতে ভূমি জরিপ সম্পন্ন করে রেকর্ড করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট মৌজা ম্যাপগুলোতে তা অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করতে হবে।

গত সাত দশকে দুই দেশের ছিটমহলের অনেকেই অভাবে পড়ে নামমাত্র মূল্যে মৌখিকভাবে তাদের জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে। এ অবস্থায় যারা জমি ক্রয় করেছে, তাদেরও কোনো বৈধ দলিলপত্র নেই। এ প্রক্রিয়ায় ছিটমহলের বাসিন্দাদের নিজেদের মাঝে যেসব জমি কেনাবেচা হয়েছে, সেগুলো যাচাই-বাছাই করে বৈধতা দিতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে যে বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে, তা হলো দীর্ঘ সাত দশকের বঞ্চনা ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা ছিটমহলের লোকদের অনেকের জমি জবরদখল করেছে অথবা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে বা তীব্র অভাব ও নানাবিধ বিপদাপদের সুযোগ নিয়ে নামমাত্র মূল্যে তাদের জমি ক্রয় করেছেন। বাংলাদেশে তাদের নাগরিকত্ব, বাড়িঘর, জমিজমা থাকার পাশাপাশি তারা ছিটমহলের জমিরও মালিক। ছিটমহলগুলোতে এমন ধরনের মালিকানা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এবং এই প্রক্রিয়ায় যেসব ছিটমহলবাসী জমি হারিয়েছেন, তাঁদের অভিযোগ দাখিলের সুযোগ দিতে হবে এবং তা আমলে নিয়ে খতিয়ে দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে, ছিটমহলের বাসিন্দারা সব ধরনের প্রশাসনিক ও আইনি সুযোগ থেকে সাত দশক ধরে বঞ্চিত ছিল। কোনো বিষয়েই কোথাও কোনো অভিযোগ দাখিলের সুযোগ তাদের ছিল না। এ অবস্থায় তাদের ওপর কোনো জুলুম হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে হবে। ছিটমহলের জমিগুলো বর্তমানে যাদের ভোগদখলে আছে, কোনো প্রকার যাচাই-বাছাই ছাড়া তাদের মালিকানাসংক্রান্ত বৈধ দলিলপত্র দিলে ছিটমহলের অনেক মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং তারা ভূমিহীন থেকে যাবে। আর ছিটের জমির মালিকানা চলে যাবে স্থানীয় প্রভাবশালীদের হাতে। ছিটমহল বিনিময়ের পর ছিটমহলের কোনো মানুষ যেন ভূমিহীন না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

শেষ কথা

ছিটমহল সমস্যার সমাধান জাতীয় স্বার্থের দিক থেকে কোনো দেশের জন্যই তেমন কোনো স্পর্শকাতর বিষয় ছিল না। ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে কোনো দেশেরই ক্ষতি বা হারানোর কিছু নেই। সমস্যাটি জিইয়ে রেখে কোনো দেশ লাভবান হয়েছে তা-ও নয়। ভারতের সর্বোচ্চ আদালতও দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বলে দিয়েছিলেন যে ছিটমহল বিনিময়ে সংবিধান লঙ্ঘিত হবে না, সার্বভৌমত্বের কোনো ক্ষতি হবে না। অপরপক্ষে, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণের মাধ্যমে উভয় দেশের ছিটমহলগুলোকে স্ব স্ব দেশ থেকে স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করে ভারত সরকারই ছিটমহল বিনিময়ের আর কোনো বিকল্প খোলা রাখেনি। তা ছাড়া ছিটমহল

বিনিময়ের মাধ্যমে কার্যত যা ঘটবে, তা কেবলই কাগজে-কলমে মালিকানা পরিবর্তন। নতুন করে কোনো রাষ্ট্রকেই কোনো জায়গা ছাড়তে হবে না। অর্থাৎ রাজনৈতিক ভূগোলের ক্ষেত্রে নতুন করে কোনো পরিবর্তন হবে না। বরং উভয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা সমুন্নত হবে। আর ছিটমহলের রাষ্ট্রহীন অসহায় মানুষগুলো পাবে রাষ্ট্র ও নাগরিক অধিকার। তাহলে ছিটমহল বিনিময়ে কেন এত বিলম্ব হলো? উত্তর একটাই। আর তা হলো ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি। সুতরাং যে কুৎসিত রাজনীতির কারণে শত শত মানুষের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন একটি বিষয় সাত দশক ধরে অমীমাংসিত থেকেছে এবং ছিটমহলগুলোতে মানবিক সংকট সৃষ্টি করেছে সে রাজনীতি পরিত্যাজ্য হোক। রাজনীতিকদের মনে সদাজাগ্রত থাকুক চণ্ডীদাসের সে অমর বাণী, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।'

ঢাকা শীর্ষ বৈঠকে তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে কোনো আলোচনা না হওয়ায় বাংলাদেশের মানুষের মাঝে হতাশা বেড়েছে সন্দেহ নেই। তবে সাত দশক পরে ছিটমহল বিনিময়ের সুরাহা হওয়ার ফলে নরেন্দ্র মোদির সরকারের প্রতি একধরনের আস্থাও তৈরি হয়েছে। ছিটমহল বিনিময় ও সীমান্ত সমস্যা সমাধানের এ উদ্যোগ ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এর মাধ্যমে প্রতিবেশী দেশ দুটির সম্পর্ক অদূর ভবিষ্যতে আরও অর্থবহ হবে বলে আশা করা যায়। এবং এর ধারাবাহিকতায় উভয় দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণে তিস্তার পানি বণ্টনের মতো জনগুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলোরও আশু সমাধান হবে সেটাই সবার প্রত্যাশা।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

১. লালমনিরহাট জেলায় ৫৯টি (পাটগ্রাম উপজেলায় ৫৫টি, হাতিবান্ধা উপজেলায় দুটি ও লালমনিরহাট সদর উপজেলায় দুটি), পঞ্চগড় জেলায় ৩৬টি (বোদা উপজেলায় ২৩টি, সদর উপজেলায় সাতটি ও দেবীগঞ্জ উপজেলায় ছয়টি), কুড়িগ্রাম জেলায় ১২টি (ভুরুঙ্গামারী উপজেলায় ১০টি, কুড়িগ্রাম সদর উপজেলায় একটি ও ফুলবাড়ী উপজেলায় একটি) এবং নীলফামারী জেলার ডিমলা উপজেলায় চারটি ছিটমহল রয়েছে।

২. ২০১১ সালের গণনা অনুযায়ী ভারতের অভ্যন্তরে অবস্থিত ৫১টি ছিটমহলে রয়েছে ১৪ হাজার ২২১ জন বাংলাদেশি। আর বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত ১১১টি ছিটমহলে রয়েছে ৩৭ হাজার ৩৬৯ জন ভারতীয়। আর বাংলাদেশের ভেতরে ৪৩টি ও ভারতের ভেতরে ২০টি ছিটমহলে কোনো জনবসতি নেই; আছে শুধু জমিজমা। (বিস্তারিত দেখুন, *প্রথম আলো*, ৭ জুলাই ২০১৫)। তবে বাস্তবে উভয় দেশে ছিটমহলের জনসংখ্যা ২০১১ সালের হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি। এর প্রমাণও মিলছে ২০১৫ সালে ছিটমহলের জনগণনায় যখন অনেক লোক নতুন করে তালিকাবদ্ধ হতে আবেদন করছে। নানা কারণে তারা ২০১১ সালে তালিকাবদ্ধ হতে পারেনি। তাই ২০১৫ সালের চূড়ান্ত গণনায় ২০১১ সালের গণনাকে ভিত্তি হিসেবে ধরার সিদ্ধান্তে অনেকেই নতুন করে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা করছে। বাদ পড়া মানুষেরা তাদের চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়েছে। ইন্ডিয়ান এনক্লেভস পিপল্‌স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কোচবিহার জেলা প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। দাবি না মানলে ওই সংগঠনটি আন্দোলনে যাওয়ার ঘোষণাও দিয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৮ জুলাই ২০১৫)।

৩. বাংলা ও পাঞ্জাবের জন্য আলাদা দুটি কমিশন গঠন করা হয়েছিল। উভয় কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন সিরিল র‍্যাডক্লিফ, আর

উভয় কমিশনেই দুজন করে হিন্দু ও মুসলমান (অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি) সদস্য ছিলেন।

৪. বিস্তারিত দেখুন, *দৈনিক আজাদ*, ১১ ও ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮।

৫. Press Communiqué dated 12th September 1958, Page 18 (3) Berubari Union No. 12, Sl No. 16,
1965 Dept. of Home, Political, CR (Confidential Record), West Bengal State Archives.

৬. Press Communiqué dated 12th September 1958, Page 18 (3) Berubari Union No. 12, Sl No. 16,
1965 Dept. of Home, Political, CR (Confidential Record), West Bengal State Archives.

৭. বিস্তারিত দেখুন, *প্রথম আলো* ৭ মে ২০১৫।

৮. বিস্তারিত দেখুন, *সমকাল*, ৫ মে ২০১৫।

৯. বিস্তারিত দেখুন, *প্রথম আলো*, ১৮ এপ্রিল ২০১৫।

১০. বিস্তারিত দেখুন, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৪ মে ২০১৫।

১১. বিস্তারিত দেখুন, *প্রথম আলো*, ৬ মে ২০১৫।

১২. বিস্তারিত দেখুন, ঐ, ৬ মে ২০১৫।

১৩. বিস্তারিত দেখুন, ঐ, ৮ মে ২০১৫।

১৪. বিস্তারিত দেখুন, ঐ, ৮ মে ২০১৫।

১৫. বিস্তারিত দেখুন, ঐ, ৯ মে ২০১৫।

১৬. বিস্তারিত দেখুন, *সমকাল*, ১১ জুন ২০১৫।

১৭. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৮ জুন ২০১৫।

১৮. ঐ।

১৯. ঐ।

২০. বিস্তারিত দেখুন, *প্রথম আলো*, ১১ মে ২০১৫।

২১. বিস্তারিত দেখুন, *দৈনিক সমকাল*, ২০ মে ২০১৫।

২২. বিস্তারিত দেখুন, *প্রথম আলো*, ৯ মে ২০১৫।

২৩. বিস্তারিত দেখুন, M. G. Rabbani, 2007, *Statelessness in South Asia: Living in Bangladesh-India Enclaves*, (Research Monograph), *Theoretical Perspectives*, Centre for Alternatives, Dhaka, pp.36-38.

সহায়ক গ্রন্থাবলি

— খান চৌধুরী, এ. এ., ১৯৩৬, *কোচবিহারের ইতিহাস*, কোচবিহার স্টেট প্রেস।

- রব্বানী, মোহাম্মদ গোলাম, ২০১১, 'ছিটমহলের মানুষ : রাষ্ট্রহীনতার ইতিবৃত্ত', *প্রতিচিন্তা,* অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, পৃষ্ঠা : ৮৯-১৪১।
- Chatterji, J., 1999, 'The Fashioning of Frontier: The Radcliffe Line and Bengal's Border Landscape, 1947-52', *Modern Asian Studies;* vol. 33, Part 1.
- Haq, M. A. , 1999, 'Slow Progress in Land Demarcation. Settlement of Enclave Issue to Ease Border Tension', *Daily Star*, 3 October.
- Manto, Saadat Hasan, 1955, "Toba Tek Singh" (A short story).
- Philips, C.H. & Wainwright, M. D. (eds), 1970, *The Partition of India - Policies and Perspectives, 1935-1947*, George Allen And Unwin Ltd., London.
- Rabbani, M. G., 2007, *Statelessness in South Asia: Living in Bangladesh-India Enclaves*, (Research Monograph), *Theoretical Perspectives*, Centre for Alternatives, Dhaka,
- Raza, S. H. (ed), 1989, *Mount Batten And The Partition of India;* Atlantic Publishers & Distributors, New Delhi.
- Sen, A. K., 2001, 'Tales of Nowhere People', presentation made at the Symposium on 'Problems of Chhitmohal and Adverse Possession', Centre For Development Activities, Calcutta, 14-15 Sept.
- Schendel, W. van, 2002, 'Stateless in South Asia: The Making of India-Bangladesh Enclaves', *The Journal of Asian Studies,* February 2002.
- Schendel, W. van, 2001, 'Working through Partition: Making a Living in the Bengal Border-lands', *International Review of Social History*, 6 (2001), pp. 393-421.
- Spate, O.H.K., 1947, 'The Partition of the Punjab and of Bengal', *The Geographical Journal*, Vol. 110, No. 4/6, pp. 201-218.
- Spate, O.H.K., 1948, 'The Partition of India and Prospects of Pakistan', *Geographical Review*, vol. 38.
- Whyte, B. R., 2002a, 'The Cooch Behar Enclaves of India and Bangladesh: An Historical Overview And Determination of their Number, Area And Population', *Oriental Geographer*, vol. 46, No. 2, Dhaka.
- Whyte, B. R., 2002b, *Waiting for the Esquimo – A historical and documentary study of the Cooch Behar enclaves of India and Bangladesh*, The School of Anthropology, Geography and Environmental Studies, The University of Melbourne, Australia.

পর্যালোচনা নিবন্ধ

ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতভাগ : জিন্নাহ ও গান্ধীর ভূমিকা

রাহমান চৌধুরী

প্রথম আলো পুরস্কারপ্রাপ্ত আহমদ রফিকের *দেশবিভাগ : ফিরে দেখা* গ্রন্থ পাঠের প্রতিক্রিয়া এবং ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধতা।

বাংলাদেশের অনিন্দ্য প্রকাশ থেকে প্রকাশিত আহমদ রফিকের লেখা *দেশবিভাগ : ফিরে দেখা* গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে সাম্প্রতিক কালের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। বইটি বাংলা ১৪২০ সনে (২০১৫ ইং) 'প্রথম আলো বর্ষসেরা' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্তিই এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হওয়ার একমাত্র বড় কথা নয়, বইটি নিজগুণেই আলোচিত-সমালোচিত বা মূল্যায়িত হতে পারে। পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে দেশভাগ নিয়ে এ ধরনের বৃহৎ মাপের কাজ আগে হয়নি। সত্যিকারভাবে বলতে গেলে, ১৯৪৭ সালের দেশভাগকে মাথায় রেখে সুনির্দিষ্ট করে এই বাংলায় কোনো কাজ হয়নি বললেই সঠিক বলা হয়। পর্যবেক্ষণ বা গবেষণা গ্রন্থ রচনা দূরের কথা, সাধারণ মাপের কোনো ইতিহাস গ্রন্থও রচিত হয়নি। সেই বিচারে আহমদ রফিক তাঁর রচনার জন্য বিশেষভাবে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। লেখকের বইটির সঙ্গে পাঠক একমত হতে পারেন, দ্বিমত প্রকাশ করতে পারেন—কিন্তু মূলকথা হলো, তিনি দেশভাগ নিয়ে বৃহত্তর পাঠকসমাজকে নতুন করে চিন্তাভাবনার অবকাশ করে দিয়েছেন। কারণ, রফিক যে বইটি লিখেছেন, সেটা দুর্বোধ্য বা জটিল গ্রন্থ নয়—সহজ ভাষায় লেখা এই বইটি সাধারণ পাঠকেরা পড়তে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন, যদিও বইটিতে প্রচুর পুনরাবৃত্তি রয়েছে। বইটি কোনো পক্ষের হয়েও তিনি লেখেননি। নিজের বিশ্বাস বা ধারণা, পর্যবেক্ষণ-অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত সূত্র ধরেই তিনি নিজের মতামতগুলো এই গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন।

বইটি পড়তে গিয়ে বোঝা যায়, রচয়িতাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে। তিনি দেশভাগ সম্পর্কে একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড় করাতে সচেষ্ট ছিলেন। ভারতবর্ষের রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 'দেশভাগ' সম্পর্কে এ ধরনের বই পড়তে গিয়ে বিভিন্ন পাঠকের মনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া জন্ম নেবে—এটাই স্বাভাবিক। বর্তমান রচনাটি আহমদ রফিকের বই সম্পর্কে শুধু সমালোচনা বা মূল্যায়ন নয়, পাশাপাশি একজন পাঠকের প্রতিক্রিয়াও বটে। কখনো বইটি সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে, কখনো কিছু প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছে। কখনো বইটিকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে নতুন প্রসঙ্গের অবতারণাও করা হয়েছে। প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠার দীর্ঘ বইটিতে লেখক বিভিন্ন ধরনের যেসব তথ্য দিয়েছেন বা মন্তব্য করেছেন, বিভিন্ন শিরোনামে যেসব অধ্যায় লিখেছেন, স্বভাবতই তার সবগুলো নিয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। বক্ষ্যমাণ সমালোচনায় বা মূল্যায়নে গ্রন্থের সেই সব দিকে ব্যাপকভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে, যা এখনো বিতর্কিত বিষয়। পৃষ্ঠাসংখ্যার বিবেচনায় সেখানেও নানা সীমাবদ্ধতা দেখা দেবে। ফলে সামান্য পরিসরে গ্রন্থটির মূলভাবটি নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করা হবে। বহু ক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্যের সমর্থনে নতুন তথ্য থাকবে। সব সময় লেখকের সঙ্গে যে একমত হওয়া যাবে বা ভিন্নমত থাকবে না, তা-ও নয়। সে ক্ষেত্রে নতুন তথ্য পরিবেশন করা হবে। সত্যিকারভাবে দেখতে গেলে, লেখকের সঙ্গে খুব বেশি দ্বিমত প্রকাশ করার সুযোগ নেই। কিন্তু বিষয়বস্তু বা ঘটনাবলিকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরাট পার্থক্য থাকবেই। প্রতিটি গ্রন্থের মধ্যে অনেক অব্যক্ত ভাবও লুকিয়ে থাকে। রফিক যা ব্যক্ত করেছেন আর যা অব্যক্ত রেখেছেন, তার বাইরেও নানা সত্য রয়ে গেছে। সত্য দ্রৌপদীর সেই শাড়িটির মতো, যার শেষ দেখা যায় না। সত্য একের পর এক এসে উপস্থিত হতে থাকে। আর ইতিহাসে তো চিরন্তন সত্য বলে কিছুই নেই।

ইতিহাসের শেষ কথাটি বলা যাচ্ছে না বলেই ভারত ও ভারতের বাইরে দেশভাগ নিয়ে ব্যাপক লেখালেখি হয়েছে। সারা ভারতের বিভিন্ন গবেষক যেমন লিখেছেন, ব্রিটিশদের রচিত নানা গবেষণামূলক বা আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থেরও অভাব নেই। দেশভাগ নিয়ে রচিত গ্রন্থের প্রধান একটি দিক হলো এই যে বহুকাল পর্যন্ত দেশভাগের প্রধান দায় জিন্নাহর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিগত সালের সত্তর দশক পর্যন্ত 'চল্লিশের লাহোর প্রস্তাব বা জিন্নাহর পাকিস্তান দাবিই' দেশভাগের মূল কারণ বলে ব্যাপকভাবে চিহ্নিত ছিল। স্বভাবতই মুসলিম লীগ এবং জিন্নাহই সে সময় পর্যন্ত দেশভাগের প্রধান খলনায়ক। কিন্তু আবুল কালাম আজাদের *ভারত স্বাধীন হলো* গ্রন্থের অপ্রকাশিত ৩০ পৃষ্ঠা প্রকাশিত হওয়ার পর নতুন প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল বহু মানুষের মধ্যে। কারণ, আবুল কালাম আজাদের মতো কংগ্রেসের প্রথম সারির একজন নেতা যখন নতুন করে প্রকাশিত ৩০ পৃষ্ঠার

মধ্যে দেশভাগ নিয়ে কিছু ভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন, বোঝা গেল তালি এক হাতে বাজেনি। কিন্তু স্পষ্ট করে তখনো অনেক কথা বলা হয়নি। পরবর্তীকালে আশির দশকের শেষে যখন গান্ধীবাদী ও অহিংস নীতির একনিষ্ঠ সমর্থক এবং গান্ধী আশ্রমের কর্মকর্তা, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *জিন্না/পাকিস্তান : নতুন ভাবনা* গ্রন্থটি লিখে প্রকাশ করলেন, খুব হইচই পড়ে গেল। জিন্নাহকে নতুন করে আবিষ্কারের সুযোগ পেলেন অনেকে, জানলেন ভারতভাগে কংগ্রেসের প্যাটেল, নেহরু প্রমুখের নেতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে। মুসলিম লীগ শুধু নয়, ভারতভাগে কংগ্রেসের ভূমিকার সমালোচনা আরম্ভ হলো। শাসক ইংরেজদের সমালোচনা তো রয়েছেই।

হ্যাঁ, সর্বপ্রথম পাকিস্তানের গবেষক আয়েশা জালাল জিন্নাহর পক্ষে শক্তভাবে কলম ধরেছিলেন, লিখেছিলেন জিন্নাহ ভারত ভাগ করতে চাননি। কিন্তু তাঁর কথা খুব গুরুত্ব পায়নি সব মহলে, কারণ তিনি পাকিস্তানি গবেষক। জিন্নাহর পক্ষে তিনি বলতেই পারেন। কিন্তু সব চিন্তাভাবনা আয়েশা জালাল পর্যন্ত এসে থেমে থাকল না। দেশভাগ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণকারী নতুন নতুন আরও গবেষকের দেখা পাওয়া গেল খোদ ভারতেই এবং পাকিস্তানে। সন্দেহ নেই, গবেষকদের মধ্যে আজাদের ৩০ পৃষ্ঠার মতো শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটিও নতুন চিন্তার খোরাক জুগিয়েছিল। বহুকাল পর্যন্ত ভারতীয় হিসেবে শৈলেশকুমারের লেখাটি ছিল ভিন্নমত হিসেবে সবচেয়ে আলোচিত। ঠিক তারপর বোমা ফাটালেন বিজেপি নেতা যশোবন্ত সিংহ, তাঁর গ্রন্থটি দ্বারা। মুসলিমবিদ্বেষী সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে চিহ্নিত একটি দলের প্রধান সারির নেতা স্পষ্ট করে বলে বসলেন, 'জিন্নাহ অসাম্প্রদায়িক ছিলেন'। শুধু তা-ই নয়, দেশভাগের দায় চাপালেন নেহরু এবং কংগ্রেসের ঘাড়ে। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানে থেমে থাকল না। জিন্নাহর পক্ষে কলম ধরলেন ভারতের বহু ইতিহাসবিদ, জিন্নাহবিরোধী বহু গবেষকের দেখা পাওয়া গেল পাকিস্তানে। নতুন শতকের শুরুতেই জয়া চট্টোপাধ্যায় লিখলেন আরও স্পষ্ট করে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ *বাঙলা ভাগ হল*। দেশভাগ নিয়ে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নিয়ে কংগ্রেসের নতুন মূর্তি রচিত হলো তাতে। হিন্দু ভদ্রলোকেরাই যে দেশভাগের জন্য, বিশেষ করে বাংলাভাগের জন্য দায়ী, তাঁর মতো প্রমাণপত্র দিয়ে স্পষ্ট করে আর কেউ সে কথা বলতে পারেননি।

বস্তুত, দেশভাগ নিয়ে এত দিন এককভাবে জিন্নাহকে দায়ী করা হচ্ছিল—কয়েক দশক ধরে সেসব ধারণাকে নতুন আলোয় বিচার করার চেষ্টা চলছে। জিন্নাহর ভূমিকার পুনর্মূল্যায়ন হচ্ছে। দেশভাগ নিয়ে কংগ্রেসের গান্ধী, নেহরু, প্যাটেলসহ আরও অনেকের সম্পর্কে নতুন সব প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে। ঠিক এ রকম একটি পর্বে এসেই আহমদ রফিক লিখলেন, *দেশবিভাগ : ফিরে দেখা*।

যখন দেশভাগ নিয়ে প্রচুর গ্রন্থ লেখা হয়ে গেছে, ঠিক তখন ৮০-৮৫ বছর বয়সে আহমদ রফিক এ রকম একটি গ্রন্থ লিখলেন কেন? স্বভাবতই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তিনি কি মনের গভীর থেকে জয়া চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য মেনে নিতে পারেননি? নাকি তাঁর নিজেরও কিছু বলার ছিল? নাকি নতুন করে সবকিছু মূল্যায়ন করতে চেয়েছেন? বক্ষ্যমাণ মূল্যায়নে সেদিকটার দিকে নজর দেওয়া হবে। রফিক যে আয়েশা জালালের বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন, সে কথা তিনি স্পষ্টই বলে দিয়েছেন। গ্রন্থকার বারবার আয়েশা জালালের মত খণ্ডন করার সুনির্দিষ্টভাবেই চেষ্টা করেছেন। তিনি আয়েশা জালালের মত খণ্ডন করার জন্য 'জিন্নাহ পাকিস্তান চাননি : প্রশ্নবিদ্ধ মিথ' নামে একটি অধ্যায়ও লিখেছেন।

গবেষক আয়েশা জালাল মনে করেন, জিন্নাহর দাবি ছিল, সবকিছুর আগে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোর রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃতি। নিশ্চয় এখানে আয়েশা জালালের সঙ্গে একমত হতে দ্বিধা করার কারণ নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে জিন্নাহ ব্যাপক মুসলমানের কথা ভেবেছিলেন, ব্যাপক মুসলমানের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। জিন্নাহর জীবনে রাজনীতির শুরু মুসলমানদের নিয়েও নয়, তিনি রাজনীতি করেছেন ভারতের হিন্দু-মুসলিমসহ সব ভূস্বামী ও ধনীর পক্ষে। ইংরেজদের কাছ থেকে তাদের সাংবিধানিক ক্ষমতা পাইয়ে দেওয়ার জন্য। ঘটনাচক্রে তিনি পরবর্তী সময়ে বাধ্য হয়েছিলেন শুধু মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে রাজনীতির মাঠে নামতে, কিন্তু তিনি তখনো চিন্তা করেছিলেন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলমান ধনিকদের স্বার্থ রক্ষা করার কথা। খুব স্বাভাবিক যে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠিত হলে সাধারণ বা নিম্নবর্গের মুসলিমরা সেখানে স্থান পাবেই। কিন্তু মুসলমানদের জন্য রাষ্ট্র বানানো আর সব শ্রেণির মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করা দুটি এক কথা নয়। জিন্নাহ ধনী মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান বানানোর প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হ্যাঁ, প্রশ্ন উঠতেই পারে যদি পাকিস্তান না হয়ে অখণ্ড ভারত রাষ্ট্র গড়ে উঠত, সেখানে কি সাধারণের স্বার্থ দেখা হতো? প্রশ্নই ওঠে না। গান্ধী, জিন্নাহ, নেহরু, প্যাটেল, আজাদ প্রমুখ যে সাধারণ মানুষের ভাগ্য পাল্টানোর জন্য রাজনীতি করেননি স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানে তা প্রমাণিত। সবার মূল লক্ষ্যটি ছিল ইংরেজশাসিত ভারত থেকে ইংরেজকে সরিয়ে তাঁদের জায়গাটা শুধু হাতবদল করা। ইংরেজদের আইন দিয়ে ইংরেজদের মতো করেই তাঁরা ভারতকে শাসন করতে চেয়েছেন। ভারত ভূখণ্ডে যদি ইংরেজদের মতোই সাধারণ মানুষ শাসিত ও নির্যাতিত হয়, তাহলে ভারত এক থাকল, কী খণ্ড খণ্ড হলো, তাতে সাধারণ জনতার কী আসে-যায়? শুরুতেই সে জন্য এই কথাটি বলে রাখা দরকার, ভারতভাগ নিয়ে যত কান্নাকাটি, সমালোচনা বা পক্ষপাত, সবই ঘটছে ভদ্রলোক সমাজে। সাধারণ জনতার রায় জানার সুযোগ পাওয়া যায়নি।

আগেই বলা হয়েছে, আহমদ রফিক কারও পক্ষ নিয়ে *দেশবিভাগ : ফিরে দেখা* গ্রন্থটি রচনা করেননি। কারও পক্ষ না নেওয়া, তাঁর বইয়ের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, তার মানে তিনি কি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকতে পেরেছেন? নিরপেক্ষতা একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। সবার মধ্যেই নানাভাবে বিশ্বাসের কিছু জায়গা তৈরি হয়, সচেতনভাবে পক্ষপাতিত্ব না করেও সেখানে নিরপেক্ষ থাকাটা কঠিন। সন্দেহ নেই, আহমদ রফিক বর্তমান গ্রন্থে কঠোরভাবে নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছেন। তিনি গ্রন্থের 'প্রারম্ভকথা' অধ্যায়ে লিখেছেন, 'মুসলিম লীগ মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতির মতাদর্শ নিয়ে পথ চলেছে। হিন্দু মহাসভা চলেছে হিন্দুত্ববাদী অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন নিয়ে। ঠিক বিপরীতে স্বপ্ন মুসলিম লীগের চল্লিশের দশকে পৌঁছে। রাজনৈতিক অঙ্গনে সাম্প্রদায়িকতা ধারে ভারে তাই অধিকতর শক্তিমান হয়ে ওঠে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক চেতনার রাজনৈতিক বিকাশের দায় সবটুকুই স্থানীয় রাজনীতির, তথা লীগ, কংগ্রেসের ছিল না। ভারতশাসনের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ব্রিটিশ রাজের এ বিষয়ে সিংহভাগ দায়—"ভাগ কর শাসন কর" নীতির সফল প্রয়োগে। এবং তা তাদের শাসনকালের শুরু থেকেই। ইতিহাস-লেখকগণ যে-যার মতো করে ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ শেষে এর দায় ত্রিভুজের তিন কোণে স্থাপন করেছেন। জিন্নাহ ও তাঁর সংগঠন মুসলিম লীগকে একপাশে রেখে ভারতীয় রাজনীতির যে নব মূল্যায়ন তার ফলে দেশভাগের দায় কংগ্রেসের ওপরেও বর্তাচ্ছে। বিশেষ করে শেষ পর্বে এ বিষয়ে অভিযুক্ত জওহরলাল নেহরু ও সরদার বল্লবভাই প্যাটেল। দায় হিন্দু মহাসভা ও তার সহযাত্রীদের কট্টর সাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও তৎপরতা।'[১]

রচয়িতা তাঁর গ্রন্থে ভারতভাগের দায় মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং ব্রিটিশ শাসক—সবার ওপরেই চাপিয়েছেন। স্বভাবতই তাঁর একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রন্থের শুরুতেই মিলে যায়। তিনি সেখানে আজাদের উদ্ধৃতি দিয়ে আরও লিখছেন, 'দেশভাগ এড়ানো যেত যদি গান্ধী-নেহরু মুসলিম লীগ তথা জিন্নাহর দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে আরও কিছুটা উদার হতেন, সংশ্লিষ্ট ভাইসরয়গণ অধিকতর বিচক্ষণতা, নিরপেক্ষতা ও আন্তরিকতার প্রকাশ ঘটাতেন। সর্বোপরি ত্রিপক্ষীয় সংলাপে জিন্নাহ যদি পাথুরে দৃঢ়তার পরিবর্তে কিছুটা নমনীয় হতেন। এই তিন "যদি"র কারণে অখণ্ড ভারতের সব সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে দেশভাগ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।'[২] তিনি ঠিক এরপরেই মন্তব্য করছেন, 'এ বিষয়ে হডসনও কয়েকটি "যদি" ও "কিন্তু"র উল্লেখ করে দেশভাগ এড়ানোর কথা বলেছেন। যেমন ব্রিটিশরাজ যদি দু-দশ বছর আগে ভারতীয় রাজনীতিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন, তাহলে ঘটনা অন্য রকম হতো, দেশভাগ এড়ানো যেত। লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্ব তখন অপরিবর্তনীয় অবস্থায় পৌঁছায়নি। কিন্তু তেমন মনোভাব ব্রিটিশ রাজ-

এর ছিল না।'[৩] ওপরের সব কথাই তিনি গ্রন্থের প্রারম্ভে বলেছেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলোয় তিনি জিন্নাহর বিভিন্ন বক্তব্য এবং বিভিন্নজনের মতামতের ভিত্তিতে কমবেশি সেই কথাগুলোই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি দেশভাগের দায় ভারতের জাতীয় প্রধান নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রধানত জিন্নাহর ঘাড়ে ফেললেও কমবেশি এই দায় থেকে গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল ও এমনকি আবুল কালাম আজাদকেও রেহাই দেননি। সেই সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ব্রিটিশ সরকারের দায় তো রয়েছেই। তিনি মূলত দেশভাগ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে বিশেষ কয়েকজন ভারতীয় নেতার নেতিবাচক ভূমিকাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। মাউন্টব্যাটেন সেখানে বলতে গেলে তেমনভাবে সমালোচিত হননি। কিন্তু ভারতভাগে ব্রিটিশদের দায় যে সবচেয়ে প্রধান, সে কথা বহু আগে বলে গেছেন বিপান চন্দ্র তাঁর *আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ* গ্রন্থের 'ব্রিটিশ নীতির ভূমিকা অধ্যায়ে'।[৪]

বর্তমান গ্রন্থে আহমদ রফিক যে কাজটি করেছেন, তাকে বলা যায় বিভিন্ন মতের সমন্বয় সাধন, সেদিক থেকে গ্রন্থটি মূলত সংশ্লেষধর্মী। বেশ কিছু লেখকের চিন্তা বা মতামতকে তিনি বিশ্লেষণের সাহায্যে সমর্থন করার চেষ্টা করেছেন, ঠিক একইভাবে বহু লেখকের মতামত যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করার চেষ্টা নিয়েছেন। তিনি নিজেও চমৎকার চমৎকার সব মন্তব্য করে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, 'চল্লিশের দশকে বঙ্গদেশে রাজনীতির খেলা, লীগ-কংগ্রেসের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর তথাকথিত দ্বিজাতিতত্ত্বের বাহারি বেলুন, যা দেখে মুগ্ধ বাঙালি মুসলমান। এ মুগ্ধতার পেছনে আসলে ছিল বিরাজমান আর্থসামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তির স্বপ্ন। মুক্তি অর্থনৈতিক সচ্ছলতার জন্য...তাই বাঙালি মুসলমানশ্রেণি-নির্বিশেষে মুসলিম লীগ প্রধান জিন্নাহর পেছনে এককাট্টা। প্রচারের মহিমায় অভিভূত মুসলমান জনতা রাজনীতির খেলায় শ্রেণিস্বার্থের ফাঁকিটা বুঝতে পারেনি, পারার কথাও নয়। বিষয়টা আরও সহজ হয়েছিল হিন্দুপ্রধান জমিদারশ্রেণির প্রজাপীড়নে ও প্রজাশোষণের কারণে।'[৫] খুব স্পষ্ট করেই এ পর্বের মুসলিম লীগের রাজনীতি, জিন্নাহর ভূমিকা এবং পাকিস্তানের জন্য সাধারণ মানুষের জিন্নাহর পেছনে দাঁড়ানোর সমালোচনা করেছেন লেখক। জিন্নাহর পাকিস্তান প্রস্তাব নিয়ে লেখক প্রশ্ন তোলেন, 'লাহোর প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্যে কোনো অস্পষ্টতা ছিল না এবং তা হলো ভারতীয় মুসলমানদের জন্য স্বাধীন স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি আর তা ভারত ভাগ করে। কারণ? কারণ একটাই। হিন্দু-মুসলমান নানা দিক থেকে এত ভিন্ন যে তারা একসঙ্গে থাকতে পারে না। কথাটা জিন্নাহর। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, বিগত শত শত বছর ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে এল কীভাবে?'

রফিকের বক্তব্যের সঙ্গে একমত হয়ে বলা যায়, জিন্নাহর ভারতভাগের পেছনের সব যুক্তি যে বাস্তবসম্মত ছিল না সেটা পরিষ্কার। জিন্নাহর কিছু যুক্তি ছিল

খুবই হাস্যকর এবং খেলো। তিনি মুসলমানদের জন্য যে আলাদা ভূখণ্ডের কথা বলেছেন, সেটা ছিল একটি অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, ইংরেজদের শাসন থেকে মুক্তিলাভের পর শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে এবং ভারতে হিন্দু-মুসলমানকে পাশাপাশি থাকতে হয়েছিল। দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান শুধু মুসলমানের দেশ হয়ে যায়নি আবার ভারতও শুধু হিন্দু বসবাসকারীদের ঠিকানা ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে যেমন মুসলমানের পাশাপাশি সংখ্যালঘু হিসেবে হিন্দু সম্প্রদায় বাস করছিলেন, ঠিক তেমনি তিন-চার কোটি মুসলমান ভারতে থেকে গিয়েছিলেন। কথাটা আহমদ রফিক বারবার তাঁর গ্রন্থে বলেছেন। কিন্তু তাঁর এ বক্তব্য একেবারেই ঠিক নয় যে লাহোর প্রস্তাবে ভারতভাগের কথা ছিল। সেখানে ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের কথা—পাকিস্তান শব্দটিও সেখানে উচ্চারিত হয়নি। ভারত ভাগের প্রশ্নটি তখনো আসেনি। লাহোর প্রস্তাবে চাওয়া হয়েছিল মুসলমানদের জন্য সাংবিধানিকভাবে রাজনৈতিক অধিকার।

ব্যক্তিগত বিশ্বাসের জায়গা থেকে রফিক বলছেন, জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের বাহারি বেলুন দেখে বাঙালি মুসলমান মুগ্ধ। রফিকের এই বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা যেতেই পারে, বাংলার কত ভাগ মুসলমান বাহারি বেলুন দেখে মুগ্ধ ছিলেন? বা বেলুনটা দেখতে পেয়েছিলেন কত ভাগ লোক? দেশভাগের ইতিহাস রচনায় এখানেই একটা গলদ রয়ে গেছে। সবাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে খুব বড় করে দেখে থাকেন। মনে করেন, বিরাটসংখ্যক মানুষ এই সংগ্রামে যুক্ত ছিলেন। জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, 'বিশ শতকের প্রথমার্ধের গোড়ার দিকে দেখা গেল মুসলমানরা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভয়ে ভীত আর হিন্দুরা মুসলমানদের দিক থেকে বিপদের আশঙ্কায় আতঙ্কিত।'[৬] কথাটা নেহরু বলেছিলেন ঠিকই কিন্তু সেটা ছিল সুবিধাভোগীদের মধ্যকার সমস্যা। তিনি যে মিথ্যা বলেছিলেন তা নয়। কিন্তু যখন নেহরু এই ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন, আজাদ-হিন্দ বাহিনী তখন হিন্দু-মুসলমান-শিখদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল। আজাদ-হিন্দ বাহিনীর বিচারের বিরুদ্ধে বা নৌ-বিদ্রোহের পক্ষে হিন্দু-মুসলমান ছাত্র-শ্রমিকেরা একসঙ্গে মিছিল করেছেন। যখন বাংলা ভাগ হচ্ছে, হিন্দু-মুসলমান ক্ষুদ্র-ভূমিহীন কৃষকেরা তখন ভারতের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে তেভাগার জন্য আন্দোলন করছেন। বাংলায় দেখা গেছে সেখানে নিম্নবর্গের হিন্দু-মুসলমানরা এক পক্ষে, ঠিক বিপরীত পক্ষে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এককাট্টা। মুসলিম লীগ এবং মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো তেভাগা আন্দোলনকারীদের মধ্যে প্রচার করতে লাগল—তেভাগা কেন, চৌভাগা হবে—আগে পাকিস্তান হোক। সন্দেহ নেই সেই প্রচারে কিছু মুসলমান চাষি নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সব মুসলমান কৃষক সাম্প্রদায়িক পতাকার তলে দাঁড়াননি। কৃষক সমিতির নেতৃত্বে যেখানে তেভাগা আন্দোলন

চলছিল, সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতে পারেনি। নীলফামারীর মতো জায়গায় বা কুষ্টিয়াতে কৃষক-শ্রমিকের একতা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থামিয়ে দিয়েছিল। ত্রিপুরা সীমান্তে কৃষকেরা দাঙ্গা রুখে দিয়েছেন, কুমিল্লা জেলায় দাঙ্গা ছড়াতে দেননি। পূর্ব ও উত্তর বাংলায় দাঙ্গা ছড়াতে পারেনি। ব্যতিক্রম ছিল শুধু নোয়াখালী জেলার রামগঞ্জ-লক্ষ্মীপুর অঞ্চল। কিন্তু সেখানে কুমিল্লার কৃষকনেতা ইয়াকুব মিঞা এবং কৃষ্ণসুন্দরের নেতৃত্বে প্রধানত মুসলিম কৃষকেরাই পার্শ্ববর্তী কোনো অঞ্চলে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়তে দেননি।[৭] ফলে রফিক যখন বলেন, বাংলার মুসলমানরা পাকিস্তান লাভের জন্য জিন্নাহর পক্ষে এক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, কথাটা বিভ্রান্তি বা বিতর্ক সৃষ্টি করে।

জওহরলাল নেহরু শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন, হিন্দু-মুসলিম এই সব বিরোধ নিয়ে বৃহত্তর জনগণের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তিনি বলেন, যেসব উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রায়ই জাতীয় ঐক্য ও প্রগতির প্রতিবন্ধক ছিলেন, সংকীর্ণ রাজনৈতিক দাবি সেই উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটি ক্ষুদ্র অংশের পক্ষে হয়তো লাভজনক ছিল, কিন্তু জনগণের জন্য নয়। কিন্তু সুকৌশলে এটাকে একটি জনগোষ্ঠীর দাবি বলে চালানো হচ্ছে।[৮] ধর্মনিরপেক্ষ লেখকেরা সাম্প্রদায়িকতাবাদকে হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে দ্বন্দ্ব হিসেবে দেখার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ কথা কেবল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রে সত্য। কারণ, ঘটনার বাস্তবতায় বহুসংখ্যক সাধারণ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সঙ্গে জড়িয়ে যেতে বাধ্য হতো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অংশগ্রহণকারী ও শিকার যারা—সাধারণত তারা হতো লুম্পেন গুন্ডা প্রকৃতির ও শহরের দরিদ্র মানুষ। যদিও কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রামের কৃষকেরাও জড়িত ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে সংঘাতটা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ছিল না; বরং রাজনৈতিক সংঘাতটা ছিল সুবিধাভোগী মুসলিম মধ্যবিত্ত ও ভূস্বামীদের সঙ্গে হিন্দু মধ্যবিত্ত ও ভূস্বামীদের মধ্যে। নিম্নমধ্যবিত্তরাও কখনো কখনো সে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ বা নিম্নবর্গের হিন্দু-মুসলমানরা সর্বদাই এর বাইরে ছিলেন।

সুযোগ-সুবিধাপ্রাপ্ত মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই সাম্প্রদায়িক বিভেদকে সামনে আনা দরকার ছিল। জিন্নাহ, গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল প্রমুখ ছিলেন এই সুবিধাভোগীদেরই প্রতিনিধি। সাম্প্রদায়িক বিভেদে সাধারণ মানুষ বা শ্রমজীবী মানুষের কোনো স্বার্থ ছিল না—এই ধারণা স্পষ্ট হওয়া দরকার। সংখ্যালঘু আর সংখ্যাগুরুর তত্ত্বের মধ্যেই একটা বিরাট গোলমাল রয়ে গেছে। হিন্দুরা সংখ্যাগুরু আর মুসলমানরা সংখ্যালঘু—এই তত্ত্ব ভুল। সুবিধাভোগীদের তত্ত্ব এটা। সত্যিকার অর্থে সংখ্যালঘুরাই ক্ষমতায় থাকে। সংখ্যাগুরুদের লড়তে হয় সংখ্যালঘু শাসকদের বিরুদ্ধে। ভারতে সংখ্যালঘু তাই মুসলিমরা নয়। শাসকেরা। হিন্দু-

মুসলিম-শিখ সব সম্প্রদায়ের ভূস্বামী ও ধনিকেরা সংখ্যালঘু এবং তাঁরাই শাসকশ্রেণি। সংখ্যাগরিষ্ঠ হচ্ছে, নিম্নবর্গের হিন্দু ও মুসলমানরা, নিম্নবর্গের বৌদ্ধরা—অর্থাৎ নিম্নবর্গের হিন্দু-মুসলিম-শিখ-জৈন-বৌদ্ধরা সবাই মিলিতভাবে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ। জিন্নাহ সাধারণ বা শ্রমজীবীদের জননেতা না হওয়ার কারণেই সংখ্যালঘু আর সংখ্যাগুরু চিহ্নিত করতে ভুল করেছেন। ঠিক একই ভুল করেছেন হিন্দুত্ববাদী নেতারা। বহুদিনের প্রচলিত সেই ধারণাই এখন অনেকে বিশ্বাস করেন। সাম্প্রতিক সময়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের মহাপরিদর্শক নজরুল ইসলাম *মুসলমানদের করণীয়* নামে একটি গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ভারতের সাধারণ হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের বিরোধ নেই। কারণ, ভূমিপুত্র শূদ্ররাই ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছেন।[৯] ফলে বাংলার ভূমিপুত্র শূদ্র বা শ্রমজীবীরাই ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ।

স্মরণ রাখা দরকার জিন্নাহ, নেহরু, প্যাটেলরা ভারতের মূল জনসংখ্যার মাত্র ১১ থেকে ১৪ শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করতেন। কারণ, ১৯৩৭ সালের ভারত শাসন আইনের পর ১১ শতাংশ মানুষ ভোটাধিকার পেয়েছিলেন। পরে সেটা ১৪ শতাংশ হয়েছিল। ভারতের সব জনগণের তখন ভোটাধিকার ছিল না। নির্দিষ্ট মানের শিক্ষালাভ বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দেওয়ার ওপর ভোটাধিকার পাওয়া নির্ভর করত। কাজেই বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলেও সাধারণ মুসলমান বা শূদ্র ভোটারের সংখ্যা ছিলেন নগণ্য। ভারতের ভোটাধিকারপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ এবং শিখ-মুসলিম ভূস্বামী—এই রকম কতিপয় ক্ষুদ্র অংশেরই নেতা ছিলেন কংগ্রেস-মুসলিম লীগ নেতারা। ভোটাধিকার প্রাপ্ত এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীরই স্বার্থ রক্ষা করত মুখ্যত সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ। কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ কখনো সর্বসাধারণের ভোটাধিকারের জন্য সংগ্রাম করেনি। বাংলা, তথা ভারতে কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ এমন কোনো গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে পারেনি বা গড়ে তুলতে চায়নি যে বৃহত্তর জনগণ ক্ষমতা হস্তান্তর-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। মুসলিম লীগ কোনো রকম সরকারবিরোধী গণ-আন্দোলনে ছিল না। কংগ্রেস যেকোনো গণসংগ্রাম ব্যাপকতা পেতে দেখলে বা সরকারের বিরুদ্ধে সহিংস হয়ে উঠতে দেখলে মাঝপথে থামিয়ে দিত। স্বভাবতই কংগ্রেস মুসলিম লীগ আমলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান দেখা গেলেও তা চূড়ান্ত পরিণতি পায়নি উচ্চবর্গের অনীহার কারণে। জালিয়ানওয়ালাবাগের গণসমাবেশ ছিল শহুরে সাধারণ মানুষের বিরাট অভ্যুত্থানের ঘটনা। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে যখন সত্যিই ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী ধারার আন্দোলনের সূচনা ঘটতে যাচ্ছিল, গান্ধী বা কংগ্রেস তা থামিয়ে দিল। হ্যাঁ, সেটা ছিল ১৯১৯ সালের ঘটনা। জিন্নাহ-গান্ধী দুজনেই তখন কংগ্রেসের সদস্য। কিন্তু চাইলেন না ভারতে

জনসাধারণের ব্যাপক সংগ্রামের ভিত্তি তৈরি হোক। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতজুড়ে গণ-অভ্যুত্থান ছিল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের কাছে ভীতিপ্রদ। কারণ, তাহলে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস নেতাদের স্বার্থমতো ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব হতো না।

জিন্নাহর ভূমিকা ছিল এসব ব্যাপারে ভীষণ রকম রক্ষণশীল। জিন্নাহ ছিলেন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধির চুলচেরা আইনজ্ঞ। সবাই জানতেন, তাঁর আইনজ্ঞান ছিল খুব পরিপক্ব। নিজ পেশায় তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে তখন কংগ্রেস দলের অপ্রতিহত প্রাধান্য। জিন্নাহ রাজনীতি করার জন্য সেই কংগ্রেস দলেই যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন সম্পূর্ণভাবে জনবিচ্ছিন্ন এবং ভয়াবহ রকম দাম্ভিক। খুব কম লোককেই তিনি নিজের সমকক্ষ ভাবতেন। রাজনীতির অঙ্গনে যে মানুষগুলোর কাছে তিনি পয়গম্বরের সম্মান পেয়েছিলেন, তিনি নিজে সে মানুষগুলোর প্রতি সামান্য সমাদর দেখাতে পারেননি। ময়লা পোশাক পরা সাধারণ মানুষগুলোকে তিনি রীতিমতো হেয় জ্ঞান করতেন। গান্ধী আবার এ ব্যাপারে ছিলেন জিন্নাহর বিপরীত। তিনি সমাজের অস্পৃশ্য মানুষের সঙ্গে মেলামেশা-খানাপিনা করতে পারতেন। দুর্গন্ধযুক্ত বস্তির মধ্যে বসে গরিব মানুষের সঙ্গে সময় কাটাতেন, দরিদ্রদের সেবা করার মানসিকতা নিয়ে তাঁদের দুঃখকষ্টের কথা শুনতেন। কংগ্রেসের নেতাদের আর কারও এ গুণটি ছিল না। গান্ধী তাই খুব দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকেন। জিন্নাহ কিন্তু হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক, ছোটলোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার কিংবা পূতিগন্ধময় বস্তিতে বসে তাঁদের দুঃখকষ্ট শোনার কোনো যুক্তিই খুঁজে পেতেন না। জিন্নাহর তা দরকারও হতো না। জিন্নাহ কেন, তেমনটিই ছিলেন আজাদ বা প্যাটেল বা ঠিক নেহরু। কংগ্রেসের এই সব মহান নেতাই ছিলেন ভারতের ভাগ্যবিধাতা। তাঁদের মাথার ওপরে ছিলেন ব্রিটিশ শাসকেরা।

জিন্নাহর রাজনৈতিক জীবনের রয়েছে দীর্ঘ কালপর্ব। কংগ্রেসে জিন্নাহ উল্লিখিত সময়ে সবার মধ্যে ছিলেন জ্যেষ্ঠ সদস্য। কংগ্রেস-মুসলিম লীগ মিলিয়ে ৪০ বছরের রাজনৈতিক জীবন জিন্নাহর। কিন্তু শত বিচার-বিশ্লেষণ করে জিন্নাহকে জননেতা বানানো যাচ্ছে না। কারাগারও ভোগ করেননি কখনো। জিন্নাহকে জননেতা না বানানো গেলেও ভারতের কংগ্রেসের রাজনীতির এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন জিন্নাহ। রফিক এক জায়গায় লিখেছেন, 'আসলে গান্ধী ও জিন্নাহ দুজনেই অর্ধসত্য পুঁজি নিয়ে রাজনীতিতে তৎপর হয়েছিলেন। একজন অখণ্ড ভারতের নামে, অন্যজন বিভক্ত ভারতের পাকিস্তানের টানে।' কথাটা একেবারে সত্যি নয়, নির্জলা মিথ্যা। ভূস্বামীদের স্বার্থের প্রতিভূ জিন্নাহ রাজনীতির মধ্যে খুব বেশি আন্দোলনের কথা ছিল না। কিন্তু তিনি অখণ্ড ভারতের স্বায়ত্তশাসনের জন্যই রাজনীতি শুরু

করেছিলেন। তিনি বাস্তবসম্মত মানুষ হিসেবে মনে করেছেন, কংগ্রেসে ভারতের সব সুবিধাভোগী-শিক্ষিত হিন্দু-মুসলিম-শিখ বা আরও সব সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ইংরেজদের তাহলে ক্ষমতা প্রদান ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না। তিনি রক্তপাতের মধ্যে যেতে চাননি, হঠকারিতা করেননি। বুঝেছিলেন, ভদ্রলোকেরা রক্তপাতের মধ্যে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন না। রক্তপাত ছাড়াই শিক্ষিত সমাজের ঐক্যবদ্ধ দাবির মুখে, চাপের মধ্যে ইংরেজকে ক্ষমতা ছাড়তে হবে। তিনি লক্ষ্য স্থির করে ধীরে ধীরে এগোতে চেয়েছেন। তিনি ভদ্রলোকদের রাজনীতি করেছেন, কিন্তু সামান্যতম সাম্প্রদায়িক ছিলেন না।

মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কারের মাধ্যমে ১৯০৯ সালে সর্বপ্রথম সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের সূত্রপাত হয়েছিল। মুসলমানদের জন্য জনসংখ্যার হারের তুলনায় অধিক আসন বা সংরক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল এই প্রস্তাবে। জিন্নাহ এবং কংগ্রেস এই আইনের বিরোধিতা করে। বলা হলো বিশেষ ধর্মমতে অনুগামীদের মাত্রাতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব দেওয়া একান্তভাবে অনুচিত। কিন্তু তাবৎ আপত্তি সত্ত্বেও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন ভারতবাসী মর্লি-মিন্টো শাসন সংস্কারকে প্রত্যাখ্যান করেনি। ১৯১০ সালের ২৫ জানুয়ারি জিন্নাহ ভারতের রাজধানী কলকাতায় বড়লাটের কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে আসন গ্রহণ করেন। তিনি ফেব্রুয়ারি মাসে বড়লাটের সঙ্গে এক বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত ভারতবাসীদের স্বাধিকার আন্দোলনের সমর্থন করেন। তিনি বক্তব্যটি শেষ করেন প্রায় এভাবে, 'মাই লর্ড, গোড়াতেই আমি এমন একটি বিষয় সম্বন্ধে বলতে চাই, যা অত্যন্ত বেদনাজনক। বিষয়টি হলো, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসীর প্রতি অত্যন্ত রূঢ় ও নিষ্ঠুর আচরণ।' বড়লাট মিন্টো তখন বলেছিলেন, 'মান্যবর মহোদয়কে শান্ত হতে বলা হচ্ছে। আমার মতে, "নিষ্ঠুরতা" শব্দটি অত্যন্ত কঠোর।' জিন্নাহ তখন উত্তরে বলেছিলেন, 'মাই লর্ড, আমার আরও কঠোর শব্দ প্রয়োগের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু আমি এই কাউন্সিলের বিধান সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে সচেতন এবং তাই আমি এক মুহূর্তের জন্যও সে বিধান ভঙ্গ করতে চাই না।' জিন্নাহ তাঁর সেই বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনব্যবস্থার বিরোধিতা করেন।[১০]

জিন্নাহ বুঝেছিলেন, কংগ্রেস আর মুসলমান আলাদা আলাদাভাবে কাজ করলে ইংরেজরা সাম্প্রদায়িক বিভেদের সুযোগ নেবে। জিন্নাহ চার সালে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন এবং সভাপতি গোখেলের খুব প্রিয়ভাজন হিসেবে দেখা দেন। কয়েক বছর পর মুসলিম লীগ জিন্নাহকে তাদের সভ্য হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। জিন্নাহ গোখেলের কাছে মুসলিম লীগের সভ্য হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের একজন প্রধান সারির নেতা মুসলিম লীগের সভ্য হতে চাইছেন জেনে

গোখেল বিস্মিত হয়েছিলেন। জিন্নাহ বলেন, হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিতদের মধ্যে যে ধরনের নানা বিরোধ লক্ষ করা যাচ্ছে, তা দূর না করা গেলে ভারতকে স্বাধীন করা যাবে না। জিন্নাহ জানান, দুই পক্ষকে একত্র করা তাঁর রাজনীতির প্রধান লক্ষ্য এবং দুই পক্ষকে কাছে টানতে হলে তাঁর কংগ্রেসের মতো মুসলিম লীগের সদস্য হওয়া দরকার। জিন্নাহ শর্ত সাপেক্ষে মুসলিম লীগের সদস্য হয়েছিলেন। সদস্য হওয়ার আগে মুসলিম লীগের নেতাদের শর্ত দিয়েছিলেন, লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবে। যা-ই হোক, জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগ দিয়ে প্রতিষ্ঠানটিকে কংগ্রেসের কাছাকাছি নিয়ে আসার চেষ্টা করেন।[১১] গোখেল জিন্নাহ সম্পর্কে বলতেন, তিনি হলেন হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। সরোজিনী নাইডু জিন্নাহর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির জন্যই মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিয়ে 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত' কবিতাটি লিখেছিলেন। জিন্নাহ সেকালের মুসলমান সমাজের গোঁড়ামিকে অগ্রাহ্য করে পর্দাবিহীন নিজ পত্নীকে সভা-সমিতি এবং এমনকি লাট ভবনেও নিয়ে যেতেন। জিন্নাহর দুর্ভাগ্য গোখেলের দ্রুত মৃত্যু। জিন্নাহ একজন রাজনৈতিক বন্ধু হারালেন।

গান্ধী কংগ্রেসে যোগদানের কয়েক বছরের মধ্যেই জিন্নাহ কংগ্রেস ছেড়ে চলে যান গান্ধীর নানা ধরনের হঠকারী রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য। জিন্নাহ ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীর চেয়ে অনেক জ্যেষ্ঠ, গান্ধী ভারতের রাজনীতিতে অংশ নেন জিন্নাহর ১২ বছর পর। খিলাফত আন্দোলনে কংগ্রেসের যোগদান এবং গান্ধীর অসহযোগ নীতির বিরোধিতা করেন জিন্নাহ। শ্রীমতী বেসান্ত এবং অন্য উদারনীতিকেরা যে কারণে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে বিপজ্জনক মনে করতেন, জিন্নাহও সেই কারণে তার বিরোধী ছিলেন। বিশেষ করে ভারতবর্ষের মুসলমানদের ওপর খিলাফত আন্দোলনের সম্ভাব্য পরিণাম নিয়ে তাঁর মনে দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞ ও ধর্মান্ধ মুসলমানদের আন্দোলনের সহকর্মী করাকে তিনি একান্তভাবে অবিবেচনাপ্রসূত বলে মনে করতেন।[১২] রফিক হডসনের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, রাজনৈতিক ঘটনায় জিন্নাহ কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত দেখে নিয়ে তারপর সিদ্ধান্ত নিতেন।[১৩] কথাটা কতটুকু সত্যি? জিন্নাহ সম্পর্কে অন্নদাশঙ্কর রায় লিখেছেন, 'ব্রিটিশ শাসকেরা একটা চাল দিলে গান্ধীজি দিতেন তার পাল্টা চাল। আর গান্ধীজি একটা চাল দিলে জিন্নাহ সাহেব দিতেন তার পাল্টা চাল। মনে হতো জিন্নাহ সাহেব যেন ব্রিটিশ পক্ষের ডামি। সেটা কিন্তু ঠিক নয়। তিনি ছিলেন স্বাধীন খেলোয়াড়। ব্রিটিশ শাসকেরা তাঁকে পদ দিয়ে বা উপাধি দিয়ে কিনে নিতে পারেননি। তিনি ছিলেন আনপারচেজেবল। ইনকরাপটিবল। অবিকল গান্ধীজির মতো।' সংবিধানপন্থী জিন্নাহ গান্ধীর অসহযোগ কর্মসূচির সঙ্গে একমত হতে না পেরে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ১৯২১ সালে নাগপুর

সম্মেলনের পর কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন।

সরল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'গান্ধীকে নরমপন্থী অথবা চরমপন্থী অথবা জাতীয় বিপ্লবী আখ্যায় ভূষিত করা যায় না। ভারতে আগমনের তিন বছরের মধ্যেই গান্ধীজি জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তাঁর রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি ভারতের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় সংগ্রামে নতুন অধ্যায় সূচনা করেছিল।'[১৪] দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর আন্দোলনের সাফল্য তাঁকে ভারতেও অবিসংবাদী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তিনি কৃষক আন্দোলনের ভেতর দিয়েই ভারতে তাঁর রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এত দিন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন, গান্ধীর যোগদানের পর সাধারণ মানুষও কংগ্রেসের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে শুরু করেন। সাহেবদের পোশাক পরা কেতাদুরস্ত বুদ্ধিজীবী নেতাদের চেয়ে ধুতি পরিহিত গান্ধীকে তাঁরা রাজনৈতিক নেতার চেয়ে একজন সন্ত বা পুণ্যাত্মা হিসেবে অধিক মর্যাদা দিতেন। গান্ধীকে নিয়ে কৃষক-সাধারণের মধ্যে নানা অলৌকিক গল্প প্রচলিত ছিল।[১৫] কিন্তু গান্ধী সাধারণ মানুষকে রাজনীতিতে টেনে নিয়ে এলেও তাঁর রাজনীতি ছিল মহাজন-ভূস্বামী ও ধনিকদের স্বার্থে। ধরা যাক, কুখ্যাত রাওলাট আইনবিরোধী আন্দোলনের কথা। গান্ধী এই আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন। গান্ধীর সঙ্গে সরোজিনী নাইডু, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ ৪০ জন নেতা রাওলাট আইনবিরোধী ঘোষণায় স্বাক্ষর করলেন। গান্ধীকে সভাপতি করে সত্যাগ্রহ সভায় এক দিনের জন্য হরতাল পালনের আহ্বান জানানো হয়। সেই অনুযায়ী ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে একদিন সারা ভারতে অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে হরতাল পালিত হয়। দিল্লির পুলিশ জনতার ওপর গুলি চালায়। সংঘর্ষ ও অসন্তোষ দিল্লি থেকে অমৃতসরে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু রাওলাট আইনবিরোধী আন্দোলন সহিংস হয়ে উঠলে গান্ধী এই আন্দোলন স্থগিত রাখতে আহ্বান জানান। তিনি ঘোষণা করলেন, সত্যাগ্রহ আন্দোলনে হিংসার স্থান নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আন্দোলন পশ্চিম ভারতে সহিংস আকার ধারণ করে। গান্ধী এর পরিপ্রেক্ষিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দেওয়াকে ভুল সিদ্ধান্ত বলে মনে করেন। গণ-আন্দোলন কি সামরিক বাহিনীর কুচকাওয়াজ যে তা খুব সুশৃঙ্খলভাবে চলবে, আর জনগণের ওপর পুলিশের গুলি চললেও জনগণকে চুপচাপ তা মেনে নিতে হবে? এই ছিল গান্ধীর গণ-আন্দোলনের চরিত্র।'

রাওলাট আইন নিয়ে জিন্নাহর ভূমিকা অনেক গঠনমূলক ছিল গান্ধীর চেয়ে। রাওলাট আইন যখন গৃহীত হয়, জিন্নাহ তখন ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য হিসেবে যুক্তিজাল বিস্তার করে এর ব্যাপক বিরোধিতা করেন। কিন্তু তাবৎ ভারতীয়র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে এই আইন অনুমোদিত হলো। জিন্নাহ সঙ্গে সঙ্গে

ইম্পেরিয়াল কাউন্সিলের সদস্যপদে ইস্তফা দিয়ে বড়লাটকে কঠোর ভাষায় পত্র লিখে জানালেন, 'এই বিল পাস করা এবং যেভাবে তা পাস করা হয়েছে, তার প্রতিবাদে আমার ইস্তফা পাঠাচ্ছি। কারণ, আমি মনে করি, বর্তমান অবস্থায় কাউন্সিলে থেকে আমি দেশের জনসাধারণের কোনো কাজে লাগব না।...আমার মতে যে সরকার শান্তির সময়ে এ-জাতীয় আইন প্রণয়ন করে, সে আর নিজেকে সভ্য সরকার বলে দাবি করতে পারে না।'[১৬] জিন্নাহ ক্ষমতালোভী ছিলেন না, ব্রিটিশদের দালালও ছিলেন না। তিনি আইনের ছাত্র হিসেবে মনে করতেন, আইনের শক্তিতে সাংবিধানিকভাবেই ব্রিটিশ শাসনকে প্রতিহত করতে হবে। সে জন্য তিনি সবচেয়ে গুরুত্ব দিতেন হিন্দু-মুসলমানসহ সব শিক্ষিত-মেধাবীর একসঙ্গে পথচলাকে। তিনি যেমন দরিদ্রদের স্বার্থে রাজনীতি করেননি, ঠিক তেমনি তিনি কখনো নিম্নবর্গের মানুষকে আন্দোলনের ডাক দিয়ে মাঠে নামাননি—তাঁদের শাসকচক্রের বুলেটের সামনে দাঁড় করাননি। তিনি নিম্নবর্গের মানুষকে শাসকদের বুলেটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ধনীদের স্বার্থ উদ্ধারের খেলা খেলেননি। তিনি চেয়েছেন সাংবিধানিক শক্তিকে কাজে লাগাতে।

রাওলাট আইনবিরোধী আন্দোলনকে ঘিরেই জালিয়ানওয়ালাবাগে অমৃতসরের জনতা সম্মিলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো রকম হুঁশিয়ারি না দিয়ে জেনারেল ডায়ার ১০ হাজার জনতার ওপর গুলি চালায়। জালিয়ানওয়ালাবাগ ক্ষুদ্র উদ্যানে প্রবেশ ও প্রস্থানের একটি মাত্র পথ ছিল। ফলে গুলিবর্ষণে ১ হাজার ২০০-এর মতো লোক নিহত হন এবং আরও বহু মানুষ আহত হয়েছিলেন। প্রাণ বাঁচাতে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে বহু লোক প্রাণ দেন। পরদিন সামরিক শাসন জারি করে জনতার ওপর আরও অত্যাচার আরম্ভ হয়। কিন্তু গান্ধী সহিংসতার কথা বলে এই আন্দোলন তুলে নেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ সরকারের দেওয়া তাঁর স্যার উপাধি ত্যাগ করেন। কিন্তু কংগ্রেস এই ঘটনার পর নীরব ভূমিকা পালন করে। এই রকম বিরাট হত্যাকাণ্ডের পর কী করে গান্ধী বা কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়ে অহিংসার নামে নীরব হয়ে গেল! যদিও জিন্নাহ সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে ডাক দেননি, তবু তিনি ঘটনার নিন্দা জানান। গান্ধী আর অন্যরা জনতার আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন নানা বাহানায়। শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বাড়তে দিলেন না। সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ ও আন্দোলনকে মাঝপথে থামিয়ে দেওয়ার জন্য গান্ধীকে অনেকে সমালোচনা করেছিলেন। জিন্নাহ সাংবিধানিক পদ্ধতির বাইরে সরকারের বিরুদ্ধে কোনো গণ-আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন না। আর গান্ধীর গণ-আন্দোলনের চরিত্র কী ছিল? সরকারবিরোধী আন্দোলনে জনগণকে মাঠে নামিয়ে, বুলেটের সামনে জনগণ প্রাণ দেওয়ার পর তিনি মনে করলেন, জনগণের এবার

আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া দরকার। বারবার তিনি এই কাণ্ড করেছেন।[১৭]

রাওলাটবিরোধী আন্দোলনের এক বছর পর কলকাতায় যখন কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন বসে মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলন তখন তুঙ্গে। গান্ধী সে সময়ে একজন রাজনৈতিক নেতার চেয়ে পুণ্যাত্মা হিসেবে আবির্ভূত এবং বেশ জনপ্রিয়। জনগণের মধ্যে গান্ধীর সন্তসুলভ প্রভাবকে কংগ্রেস নেতারা দলের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইলেন। গান্ধীও চাইলেন ভারতের অবিসংবাদী নেতা হয়ে উঠতে। কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধীর নেতৃত্ব দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত হয় এবং অধিবেশনে গান্ধী মুসলমানদের খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে বসেন। তিনি ভারতীয় হিন্দুদের খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন দিতে আহ্বান জানান। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবে সাত দফা বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। যেমন সরকারি খেতাব প্রত্যাখ্যান, সরকার মনোনীত সদস্যদের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হতে পদত্যাগ, সর্বপ্রকার জাঁকজমকপূর্ণ সরকারি অনুষ্ঠান বয়কট, সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় বর্জন, ব্রিটিশের আদালত বর্জন, মেসোপটেমিয়ায় ব্রিটিশের সামরিক চাকরি প্রত্যাখ্যান, আইনসভার নির্বাচন ও ব্রিটিশ পণ্যদ্রব্য বয়কট ইত্যাদি।

জিন্নাহ আবেগ দ্বারা পরিচালিত না হয়ে বাস্তবসম্মত বুদ্ধি প্রয়োগ করে এটা বুঝেছিলেন, শুধু তুরস্কের সুলতান বা খলিফার কর্তৃত্বচ্যুতিকে কেন্দ্র করে ভাবাবেগের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে স্থায়ী করা যায় না। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে সুদৃঢ় করতে হলে ঐক্যবিরোধী যেসব অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ রয়েছে, তার অবসান ঘটানো দরকার। ফলে জিন্নাহ গান্ধীর ওই প্রবাহে আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিষয় নির্বাচনী সভার মুসলমানদের মধ্যে একমাত্র জিন্নাহই ছিলেন এর বিরোধী। কংগ্রেসের বিরাট বিরাট নেতার সামনে দাঁড়িয়ে জিন্নাহ বললেন, 'খিলাফত সম্মেলনের সমর্থন নিয়ে মহাত্মা তাঁর অসহযোগ কর্মসূচি উপস্থিত করেছেন। এবার আপনাদেরই স্থির করতে হবে যে আপনারা ওই মূল কর্মসূচির মূলনীতি অনুমোদন করেন কি না? আর করলে বিস্তারিতভাবে এর কার্যক্রম স্বীকার করেন কি না, তাও ভাবতে হবে।...তবে একবার যদি আপনারা সামনের দিকে কুচকাওয়াজ করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে কোনো অবস্থাতেই আর যেন পশ্চাদপসরণ না করেন।' সবাই তখন 'না না কখনোই না' বলে চিৎকার করলেন জিন্নাহ তখন বললেন, 'বসে পড়ার পূর্বে কেবল এটুকু বলতে চাই যে মনে রাখবেন—সম্মিলিত হলে আমরা খাড়া থাকব আর বিভাজিত হলে ধরাশায়ী হব।' সবাই 'সাধু সাধু' বলে এবং করতালি দিয়ে জিন্নাহকে সম্মান জানালেন।[১৮] জিন্নাহ যখন ওই বক্তৃতা দেন, নিশ্চয় তখন তাঁর মনে ছিল রাওলাট আইনবিরোধী আন্দোলন থেকে গান্ধী কীভাবে পশ্চাদপসরণ

করেছিলেন।

ঠিক এই ঘটনার সময়েই ভারত সরকারের 'সিভিল সার্ভিস' ত্যাগ করে সদ্য ইংল্যান্ডফেরত সুভাষচন্দ্র বসু গান্ধীর কাছে জানতে চান সাত দফার ভেতর দিয়ে কী করে ইংরেজরা ভারতীয়দের রাজনৈতিক দাবি মেনে নিতে বাধ্য হবেন? গান্ধী তাঁকে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে না পারায় তিনি হতাশ হন।[১৯] গান্ধীর অহিংস অসহযোগের সাত দফার সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশ একমত হতে পারেননি। মতিলাল নেহরু ও চিত্তরঞ্জন দাশ মনে করতেন, ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কার আইনে নবগঠিত আইনসভাগুলোয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ এবং জয়লাভ করে আইনসভার ভেতর গিয়ে সরকারের কাজে প্রবল বাধা সৃষ্টি করাটাই যুক্তিযুক্ত। ঠিক সে কারণে সাড়ে তিন মাস পর নাগপুরে যখন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন হয়, চিত্তরঞ্জন দলবলসহ অসহযোগের বিরোধিতা করতে উপস্থিত হলেন। কিন্তু গান্ধীর প্রভাববলয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে বসলেন। জিন্নাহ কিন্তু তা করলেন না। নাগপুর সম্মেলনের কংগ্রেস অধিবেশনে তখন গান্ধীপ্লাবন বা গান্ধীপূজা চলছে—গান্ধীর মতের বিরুদ্ধে কথা বলা এক কঠিন ব্যাপার। জিন্নাহ তার মধ্যে দাঁড়িয়েই সম্পূর্ণ এককভাবে অসহযোগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। জিন্নাহর মতে, অসহযোগ কর্মসূচি দেশের পক্ষে কেবল বিপজ্জনকই নয়, এর জনক গান্ধী বরাবরই সংগঠনে বিভাজন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছেন। তিনি কলকাতায় গান্ধীকে 'মহাত্মা' সম্বোধন করেছিলেন এবার সম্বোধন করলেন 'মিস্টার গান্ধী' বলে। প্রতিনিধিরা তাঁর বক্তৃতায় বারবার বাধা দিয়ে গান্ধীকে 'মহাত্মা' বলার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন।[২০] কিন্তু জিন্নাহ অবিচল। প্রতিনিধিদের সমর্থন উপেক্ষা করেও গান্ধী পূজার প্রবল প্লাবনের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের বিশ্বাসের কথাগুলো বলতে দ্বিধা করলেন না। জিন্নাহ খিলাফত আন্দোলনকে নিন্দা করে বলেন, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গান্ধী একদল ধর্মান্ধ মোল্লা ও উলেমাকে রাজনীতির প্রথম সারিতে নিয়ে এসেছেন। জিন্নাহর মতো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গান্ধীর খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করার কোনো যুক্তি খুঁজে পাননি।[২১]

কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে অসহিষ্ণু প্রতিনিধিদের অসম্মানজনক এবং অগণতান্ত্রিক আচরণে ক্ষুব্ধ-দুঃখিত জিন্নাহ অধিবেশন বর্জন করে সেই রাতেই মুম্বাই চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জিন্নাহর রাজনৈতিক জীবনের একটি অধ্যায়ের অবসান ঘটল। কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা হিসেবে জিন্নাহ সুখে-দুঃখে যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রায় ২০ বছর যুক্ত ছিলেন, দলে গান্ধীর স্বৈরাচারী ভূমিকার কারণে সে সংগঠন ছেড়ে চলে গেলেন। মনে রাখতে হবে, গান্ধী ব্যক্তিগত ইমেজ দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক দলের দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জায়গায় ব্যক্তিপূজার যে ধারা সৃষ্টি করেছিলেন, দলের ভেতর সব মতকে ধারণ না করার

বিরাট যে ক্ষতি সাধন করে গেলেন, তার কুফল এখনো ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলোকে বহন করতে হচ্ছে। নিজের পূজনীয় আসনটি ছেড়ে কখনো গান্ধী দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা করার সুযোগ সৃষ্টি করেননি। হয়তো ভারতভাগের সেটাও এক বড় কারণ। কিন্তু গান্ধীকেও একদিন ছুড়ে ফেলা হয়েছিল দল থেকে, প্যাটেল আর নেহরুই করেছিলেন কাজটা।

গান্ধী মনে করেছিলেন, খিলাফত আন্দোলনে হিন্দুদের যোগদানের ভেতর দিয়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য স্থাপিত হবে এবং তিনি মুসলমানদের নেতৃত্বের আসন লাভ করবেন। গান্ধীর সেই কৌশল বুমেরাং হয়ে দেখা দিয়েছিল। খিলাফত আন্দোলন ব্যাপকভাবে ভারতের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে তা কখনো কখনো হিংসাত্মক হয়ে ওঠে এবং কৃষকদের দাবিদাওয়া এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে থাকে। খিলাফত সর্বস্তরে ব্যাপকতা লাভ করলে হসরত মোহনী জঙ্গি উলেমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করে প্রস্তাব দেন যে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুই সংগঠনেরই পূর্ণ স্বরাজের জন্য আন্তরিক প্রয়াস চালানো উচিত এবং তার জন্য ব্রিটিশ সরকার যদি দেশে সামরিক আইন জারি করে, তবে মুসলমানদের হয় অসহযোগের পথ পরিহার করতে হবে অথবা বুলেটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। দ্বিতীয় পথটি গ্রহণ করলে আত্মরক্ষার জন্য হিংসাত্মক পথ অবলম্বন করা অপরিহার্য হয়ে উঠবে। কিন্তু তা হবে গান্ধীর অহিংস নীতির পরিপন্থী। তাই গান্ধী এই নীতির বিরোধিতা করে বসলেন। হসরত মোহনীর খাজনা বন্ধ আন্দোলনের প্রস্তাবটিও গৃহীত হলো না। ব্রিটিশ সরকারের ভয় ছিল, খাজনা বন্ধ আন্দোলন গৃহীত হলে তারা বিপদে পড়বে—গান্ধী সরকারকে সে বিপদ থেকে রক্ষা করলেন। বহু জেলা থেকে খাজনা বন্ধ আন্দোলন স্থানীয়ভাবে পরিচালনার জন্য গান্ধীর কাছে অনুমতি চাওয়া হলো। গান্ধী তাঁদের ভর্ৎসনা করলেন।[২২]

গান্ধী দেখতে পাচ্ছিলেন, সাত দফার অসহযোগ ক্রমে ক্রমে কৃষক-জনতার আন্দোলনে পরিণত হচ্ছে। গান্ধী চাইছিলেন না তাঁর হাত থেকে খিলাফত-অসহযোগের নিয়ন্ত্রণ সাধারণ মানুষের হাতে চলে যাক। তিনি সে জন্য আন্দোলন বন্ধ করার সুযোগ খুঁজছিলেন। ঠিক তখনই চৌরিচৌরা গ্রামের সংঘর্ষের ঘটনার খবর আসে। চৌরিচৌরা গ্রামের কৃষকদের সমাবেশের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে কৃষকেরা থানা আক্রমণ করেন, কৃষকদের হাতে ২২ জন পুলিশ সদস্যের মৃত্যু ঘটে। গান্ধী আন্দোলন বন্ধ করার সুযোগ পেলেন, তিনি চৌরিচৌরার হিংসাত্মক ঘটনাকে কারণ দেখিয়ে আন্দোলন বন্ধ করলেন। জঙ্গি উলেমার দল এই ঘটনায় গান্ধীর ওপর অসন্তুষ্ট হন। মুসলমানরা মনে করলেন, গান্ধী তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য ভেঙে গেল, বিপরীতে সারা দেশে দেখা দিল হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা।

জিন্নাহ এই ভয় করছিলেন এবং তিনি শুরুতে তা গান্ধীকে এবং কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সতর্ক করে দিয়েছিলেন। খিলাফত দাবিগুলোর গায়ে ধর্মীয় আবরণ থাকা সত্ত্বেও নিঃসন্দেহে এটা ছিল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। কিন্তু খিলাফতের গণজাগরণকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আখ্যা দেওয়ার অসুবিধা এই যে ১৯২২ সালে কামাল পাশা খিলাফত তুলে দিলে আন্দোলন বন্ধ হয়ে যায়। মুসলিমদের দিক থেকে ধর্মীয় কারণেই এর শুরু, ধর্মীয় কারণেই এর শেষ। জিন্নাহর কথাই ঠিক হলো, খিলাফতের পর থেকে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক খারাপ হতে থাকল। হিন্দু উগ্রবাদী দলগুলো মাথা চাড়া দিল, বিপরীত দিকে নানা ইসলামি সংগঠন দাঁড়িয়ে গেল।

জিন্নাহ কংগ্রেস ছেড়ে চলে গেলেও কোনো হীনম্মন্যতার পরিচয় দেননি। জিন্নাহ ১৯২৪ সালে লীগ নেতৃত্বের একাংশের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও মুম্বাইয়ের লীগ অধিবেশনে কংগ্রেসের বহু হিন্দু নেতাকে আমন্ত্রণ জানান এবং লীগ প্রতিনিধিদের সামনে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপন করার সুযোগ দেন। অনুরূপভাবে গান্ধীর সভাপতিত্বে ১৯২৫ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন জিন্নাহ। যখন ১৯২৫ সালে মাহমুদাবাদের রাজা, যিনি নিজেকে প্রথমে মুসলমান বলে ঘোষণা দেন, জিন্নাহ তখন তাঁকে কঠোরভাবে বলেছিলেন, 'না, তিনি প্রথমে ভারতবাসী পরে নিজেকে মুসলমান বিবেচনা করবেন।'[২৩] তিনি ১৯২৭ সালে লীগ অধিবেশনে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলেমিশে শাসন সংস্কারের কাজে হাত দেন এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের পথ বাতলান। জিন্নাহ ১৯৩৪ সালেও নিজেকে প্রথম ভারতবাসী এবং পরে মুসলমান বলে দাবি করছেন। তিনি খুব যুক্তিসংগতভাবে তখনো বলছেন, 'মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষা করলে কোনো ভারতবাসী কখনো তাঁর স্বদেশের সেবা করতে সমর্থ হবেন না। কারণ, মুসলমানদের উৎসাহ দিয়ে এবং তাঁদের রাষ্ট্রের জন্য সুযোগ্য নাগরিক সৃষ্টি করেই কেবল আপনারা স্বদেশের সেবা করতে সক্ষম হবেন।'[২৪] জিন্নাহর এই বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট হবে, ব্রিটিশদের বিভাজন নীতি ভারতে যেভাবে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়ে তুলছিল, তিনি তার বাস্তবতা এবং ভবিষ্যৎ রূপটা বুঝতে পারছিলেন। সেই দূরদর্শিতার কারণেই ভারতের জনসংখ্যার এক বড় অংশ মুসলমানরা যাতে কখনো আহত না হন, নিজেদের নির্যাতিত সংখ্যালঘু না ভাবেন, সেই জন্যই তিনি মুসলমানদের যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়ার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এর পেছনে তাঁর সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষা করে ব্রিটিশ শক্তিকে হিন্দু-মুসলিমবিরোধ কাজে লাগানোর সুযোগ না দিতে।

ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর

করার উদ্দেশ্যে ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশন গঠন করে। ভারতের প্রায় সব রাজনৈতিক দল সাইমন কমিশনকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং মতিলাল নেহরুকে একটি পৃথক খসড়া শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিমদের একটি বড় অংশ পৃথক নির্বাচনের পরিবর্তে শর্ত সাপেক্ষে যুক্ত নির্বাচনব্যবস্থা গ্রহণে রাজি হয়। জিন্নাহর শর্ত কংগ্রেস মেনে কথা বললেও সংবিধান রচনার সময়ে হিন্দু মহাসভা ও শিখদের বিরোধিতায় মতিলাল তা করতে পারলেন না। জিন্নাহর ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে তিনি মুসলিম লীগের রাজানুগত মহম্মদ শফি, আগা খানদের নেতৃত্বের সঙ্গে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল দুটো বিষয়ের ওপর—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের মতো ভারতে স্বশাসনের প্রচলন হোক এবং সংবিধানে যত দিন পর্যন্ত মুসলিমদের স্বার্থরক্ষার বিষয়টি সংযুক্ত না হচ্ছে, তত দিন পর্যন্ত পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা বজায় থাকুক। ১৯২৯ সালেই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার্থে জিন্নাহর বিখ্যাত ১৪ দফা দাবি উত্থাপিত হয়। জিন্নাহ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বাইরে থেকে ভারতীয় মুসলমানদের একটি ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গেও তাঁর ঠিক বনিবনা হচ্ছিল না। জিন্নাহ একপর্যায়ে বিরক্ত হয়ে রাজনীতি ছেড়ে লন্ডনে বসবাস করতে থাকেন।

জিন্নাহ ১৯৩৪ সালে লন্ডন থেকে স্থায়ীভাবে ভারতে ফিরে এসে মুসলিম লীগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জিন্নাহ মূলত রাজনীতি একেবারে ছেড়ে দিয়েই লন্ডনে থাকার জন্য মনস্থির করে ফেলেছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগের কতিপয় ব্যক্তির অনুরোধে তিনি ভারতে ফিরে এসে মুসলিম লীগের হাল ধরলেন। জিন্নাহ তখন ভিন্ন এক মানুষ, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যদিও ১৯৩৪ থেকে '৩৭ সাল পর্যন্ত জিন্নাহ কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু '৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ খুব খারাপ ফল করা সত্ত্বেও তিনি মনে করেছিলেন কংগ্রেসের মন্ত্রিসভায় মুসলিম লীগকে রাখা হবে। কিন্তু এ ব্যাপারে কংগ্রেস উদারতা না দেখালে জিন্নাহ ভিন্নপথে হাঁটতে শুরু করলেন। জিন্নাহ মনে করতে শুরু করলেন, হিন্দু-মুসলমানদের নিয়ে ঐক্য সম্ভব নয়। যা করার মুসলমানদের নিয়ে আলাদাভাবেই করতে হবে।

রফিক লিখেছেন, 'বৃহত্তর রাজনৈতিক দল হিসেবে এদিক থেকে কংগ্রেসের দায়িত্ব ছিল কিছুটা বেশি। কিন্তু কংগ্রেসের উচ্চমন্যতা, মুসলিম লীগকে বিশেষ করে জিন্নাহর প্রাথমিক প্রস্তাবগুলোকে গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে সব সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। কংগ্রেস মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা ও জিন্নাহর অবমূল্যায়ন করেছিল।'

তিনি এ পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করছেন, 'হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিরোধ সামনে নিয়ে ভারতীয় রাজনীতির পার্শ্বপরিবর্তন এবং দুই ভিন্ন পথ ধরে চলার দায় কি এককভাবে জিন্নাহর?'[২৫] জিন্নাহ সম্পর্কে তিনি লিখছেন, নওরোজি, গোখেলের ভাবশিষ্য জিন্নাহ তাঁর ৪০ বছর বয়সে জাতীয় কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকাকালীন ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের ওপর গুরুত্ব দিতে দ্বিধা করছেন না। ১৯২৪ সালের মে মাসে লাহোরে অবস্থিত মুসলিম লীগের এক সভায় তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ভারতে ইংরেজ শাসনের স্থায়িত্বের কারণ হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য।[২৬] রফিক খুব সচেতনভাবে সত্যি কথাগুলো বলতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলছেন জওহরলাল নেহরুর অপরিণামদর্শী নানা বক্তব্য সম্পর্কে, যেখানে নেহরু বলেন, 'ভারতীয় রাজনীতিতে এখন একমাত্র দুটো পার্টিই রয়েছে, যথা কংগ্রেস ও ব্রিটিশরাজ। সঙ্গে সঙ্গে জিন্নাহ উত্তর ছুড়ে দেন এই বলে যে মুসলিম লীগ তৃতীয় দল হিসেবে কংগ্রেসের সমান যুক্তিসংগত সমান অংশীদার।'[২৭]

রফিক স্বীকার করেন, নেহরু এ ধরনের অপরিণামদর্শী মন্তব্য আরও করেছেন। তিনি এ কথাও বলেন, বারবার জওহরলাল নেহরুর এ ধরনের অদূরদর্শী, অরাজনৈতিক মন্তব্য ভারতভাগকে অনিবার্য করে তোলে। এমনকি বারবার জওহরলাল নেহরুর এই ধরনের বক্তব্যে আজাদ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। কখনো কখনো গান্ধীও অপরিণামদর্শী মন্তব্য করেছেন। গ্রন্থাকার এসব বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সততা ও নিরপেক্ষতা রক্ষা করছেন। কিন্তু তিনি কংগ্রেস রাজনীতির একটি বিশেষ অধ্যায় নিয়ে কিছু বলছেন না। যখন জিন্নাহ কংগ্রেস থেকে বের হয়ে আসেন সেই সময়ে গান্ধী ও কংগ্রেস দলের সঙ্গে জিন্নাহর বিরোধটা কোথায় ছিল? তিনি বলেননি রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসের অগণতান্ত্রিক মনোভাবের কথা। বলেননি কগ্রেসের সব বড় নেতা গান্ধী নামক এক ব্যক্তির জিম্মায় দলটিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। জিন্নাহ কেন কংগ্রেস ছাড়লেন? কারণ, কংগ্রেসের পুরোনো এই নেতা দেখতে পেলেন দলের গণতন্ত্রকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে গান্ধী নামক এক ব্যক্তির কাছে। গান্ধীর প্রতি এটা জিন্নাহর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। প্রথম দিকে গান্ধীকে জিন্নাহ মহাত্মা গান্ধী বলতেন। পরে মহাত্মার ক্ষমতার লোভ দেখে চমকে উঠলেন। জিন্নাহ দেখলেন, গান্ধী নামক মহাত্মাটি কংগ্রেসকে তাঁর ব্যক্তিগত রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করে তুলতে চাইছেন। জিন্নাহ এটা মেনে নিতে পারেননি।

গান্ধীর জনপ্রিয়তা তখন এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে ১৯২১ সালে কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে কংগ্রেস কর্মপরিষদের সর্বময় কর্তৃত্ব গান্ধীর ওপর অর্পণ করা হয়। গান্ধী এ ব্যাপারে সামান্য আপত্তি তুললেন না। তিনি

কংগ্রেসের মতো একটি দলে গণতন্ত্রের চর্চা হতে না দিয়ে নিজের কর্তৃত্বকে বড় করে দেখলেন। ভয়াবহ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় এখানে এসে, আর তা হলো, অখণ্ড ভারত মানেই কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র? যারা অখণ্ড ভারত চাইছে সেই দলের মধ্যেই তো গণতন্ত্র ছিল না। দলের ভেতর সব রকম গণতন্ত্র বিদায় দিয়ে বলা হলো গান্ধীর কথাই দলের জন্য আইন। গান্ধী যাঁকে দলের সভাপতি করবেন, তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে না। দলের ভেতর গান্ধীর এই স্বৈরাচার মানতে চাননি সুভাষচন্দ্র বসু। গান্ধী সে জন্য দ্বিতীয়বার সুভাষ বসুকে দলের সভাপতি হতে দিতে চাননি। সেটা ১৯৩৯ সালের ঘটনা।

সত্যি বলতে, আহমদ রফিক ১৯৩৭ থেকে '৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালকেই প্রধানত তাঁর গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। '৩৭ সাল দিয়েই তিনি গ্রন্থের আলোচনা শুরু করেছেন। '৩৭ সাল থেকে তিনি সামনে এগিয়ে গেছেন, কখনো কখনো বা পেছনে ফিরে অতীতের ঘটনাবলির প্রসঙ্গ টেনেছেন। গ্রন্থের শুরুর দিকের কিছু ভূমিকা বাদ দিলে '৩৭ সালের নির্বাচন দিয়েই তাঁর গ্রন্থের যবনিকা উত্তোলন। বিশেষ করে বঙ্গের কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হক এবং কংগ্রেস প্রসঙ্গ এই ক্ষেত্রে গুরুত্ব পায়। তিনি দেখান, কংগ্রেসের বিভ্রান্তিকর ভূমিকার কারণে মুসলিম লীগ কীভাবে বাংলায় প্রভাব বিস্তার শুরু করে। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বঙ্গে আসন লাভ করে ৫২টি, বঙ্গীয় মুসলিম লীগ ৩৯টি, কৃষক প্রজা পার্টি ৩৬টি, স্বতন্ত্র ৪৩টি এবং ত্রিপুরা কৃষক সমিতি ৫টি। কৃষক প্রজা পার্টির প্রধান ফজলুল হক কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস তাতে রাজি না হলে ফজলুল হক বাধ্য হন মুসলিম লীগের সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করতে। কংগ্রেস কেন রাজি হয়নি? বিপান চন্দ্র এ সম্পর্কে বলছেন, ১৯৩৭ সালে কংগ্রেস যে কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করতে পারল না, তার কারণ কৃষক প্রজা পার্টির প্রস্তাবিত কৃষি আইন সমর্থনে কংগ্রেসের অনীহা ছিল। কংগ্রেস দলে জমিদারদের প্রভাবের দরুন বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের বড় অংশ কৃষি সংস্কারের বিরোধিতা করে। হিন্দু ভূস্বামীদের একাংশ, প্রধানত ছোট জমিদারেরা কংগ্রেসকে সমর্থন করতেন এবং নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীদের ওপর নির্ভর করতেন।[২৮]

কংগ্রেস যে মূলত ভূস্বামী এবং সুবিধাভোগীদের সংগঠন বা রাজনৈতিক দল ছিল, গবেষক মহলে এ নিয়ে তেমন বিতর্ক নেই। কংগ্রেস সে কারণেই জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য ফজলুল হকের মতো অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি এবং কৃষক প্রজা পার্টির মতো অসাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে সরকার গঠনে যোগ দেয়নি। মুসলিম লীগকে কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে যুক্তভাবে সরকার গঠন করতে দিয়ে কংগ্রেস ভূস্বামীদের স্বার্থে মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধি করেছিল। মুসলিম লীগও ছিল ঠিক

একইভাবে জমিদার ও জায়গিরদারদের দল। হক মন্ত্রিসভা কৃষকদের স্বার্থে বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করে, কিন্তু মুসলিম নেতৃত্ব তাঁকে খুব বেশিদূর এগোতে দেয় না। মুসলিম লীগ শেষ পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। দ্বিতীয়বার যখন কৃষক প্রজা পার্টি কংগ্রেসের সাহায্য চায়, একইভাবে কংগ্রেস নেতারা পুনরায় ব্যাপারটাকে অগ্রাহ্য করেন এবং ফজলুল হক দ্বিতীয়বার বাধ্য হন হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি হিন্দু মহাসভার সদস্যদের সঙ্গে মিলে সরকার গঠন করতে। আহমদ রফিক ১৯৩৭ সালের নির্বাচন এবং ফজলুল হকের দু-দুবার সরকার গঠনের ঘটনাগুলো সুন্দরভাবে বর্ণনা করলেও কংগ্রেসের কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে যোগ না দেওয়ার মূল কারণটি ব্যাখ্যা করেননি, যে কারণটির কথা বলেছেন বিপান চন্দ্র। কিন্তু এই ঘটনার ভেতর দিয়ে যে বাংলায় মুসলিম লীগের শক্তি ও জনপ্রিয়তা পূর্বের চেয়ে বৃদ্ধি পায়, তা চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন রফিক। কিন্তু পুনরায় স্মরণ রাখতে হবে মুসলিম লীগের এই সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশেষ একটি মহলের মধ্যে, সব জনসাধারণের মধ্যে নয়।

রফিক লিখেছেন, 'লক্ষণীয় যে ফজলুল হক ও প্রজা পার্টিকে কেন্দ্র করে বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে সুস্থ ধারা বিকশিত হচ্ছিল, তা কংগ্রেসের চিত্তরঞ্জন-সুভাষপন্থী ধারার সঙ্গে মিলে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী ধারার বিকাশ ঘটাতে পারত। আর তা শুধু বঙ্গীয় রাজনীতিরই নয়, সর্বভারতীয় রাজনীতির জন্য ভিন্ন পথনির্দেশ করতে পারতো।'[২৯] 'বঙ্গদেশে হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়ে অসাম্প্রদায়িক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠনের একটা বড় সুযোগ তৈরি হয় এবং বঙ্গের সংসদীয় রাজনীতির সম্প্রদায়নির্ভর ধারাবদলের সুযোগ কংগ্রেস দলের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য হাতছাড়া হয়ে যায়। ফজলুল হকের প্রজা পার্টি তৃণমূল স্তরের মুসলমান ও নমঃশূদ্র হিন্দু সমর্থনে একটি অসাম্প্রদায়িক দল। নীতিগত দিক থেকে মুসলিম লীগের চেয়ে কংগ্রেসের কাছাকাছি।...হুমায়ুন কবিরের বক্তব্যও এদিক থেকে ভিন্ন নয়। তাঁর ভাষায়, ফজলুল হকের অব্যাহত আহ্বানে সাড়া দেয়নি বলে বঙ্গে একটি অসাম্প্রদায়িক মন্ত্রিসভা গঠনের সব সুযোগ নষ্ট হয়ে যায়। ফজললু হককে ঠেলে দেওয়া হয় মুসলিম লীগের দিকে।'[৩০] লেখক এরপর যে ভয়াবহ সত্যটি বলেন তা হলো, কংগ্রেসের এই আঘাত বঙ্গে মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে, দেশবিভাগের ক্ষেত্র তৈরি করেছে।

গ্রন্থটিতে একটি বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে পরিষ্কার যে লেখক নিজে দেশভাগের পক্ষে নন এবং পাকিস্তান সৃষ্টির বিরুদ্ধে। প্রথম দিকে দেশভাগ চাননি গান্ধী-নেহরু এবং কংগ্রেস। যদিও ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষ তখন বেশ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত। প্রশ্ন উঠতে পারে, সেই প্রতিটি প্রদেশ যদি আলাদা আলাদাভাবে স্বাধীনতা চাইত, সমস্যা কী ছিল? প্রশ্নটি অবশ্যই গুরুত্ববহ। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী

আন্দোলন প্রসঙ্গে। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে থাকা ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলের জাতিগুলো কিন্তু প্রায় প্রতিটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে স্বাধীনতা লাভ করে। ইতিহাসে সে জন্যই সেই সময়কে ইউরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, রোমান সাম্রাজ্যের খ্রিষ্টান পোপের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে প্রতিটি জাতি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবেই নিজেদের দেখতে চেয়েছিল। বিরাট ভারতবর্ষও তেমনি অনেকগুলো জাতিতে বিভক্ত ছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রশ্নে তাদের সবারই আলাদা আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার কথাটা ভাবাই স্বাভাবিক ছিল। ভারতবর্ষ কি একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হতে পারে? ভাষা-সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিকভাবে পারে না। বহুকাল ধরে ভারতবর্ষ নামক ভূখণ্ডটি কতকগুলো রাজার রাজ্যে বিভক্ত ছিল। কখনো কখনো সাম্রাজ্য শক্তির দ্বারা বিজিত হয়েছে—বিশেষ করে করদ রাজ্য হিসেবে।

মোঘলদের পর ইংরেজরা ভারতে তার সাম্রাজ্য বিস্তার করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতীয়তাবাদী কোনো আন্দোলন কি এখানে হয়েছিল? যদি হয়ে থাকে, সেই জাতীয়তার ভিত্তি কী ছিল। ভাষাকে ঘিরে, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্টকে ঘিরে সেটা হয়নি। পাশ্চাত্যের পরিভাষায় 'জাতি' বলতে যা বোঝায়, ব্রিটিশ শাসনের আগে ভারতে সেই রকম ধারণা বিকাশ লাভ করেনি। রাজা বা সামন্তশাসিত ভারতের মানুষের মনে ছিল 'রাজ্য' বা 'দেশ' সম্পর্কে চেতনা। নিঃসন্দেহে এই দেশ চেতনার মধ্যেও সীমাবদ্ধতা ছিল, কিন্তু বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক কারণে সেখানে ভারত বিচ্ছিন্নতার কোনো স্থান ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় থেকে 'জাতি' গঠনের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, সেখানেও ভারত ভূখণ্ডের ধারণা ছিল। জাতিসত্তার প্রশ্নটি ছিল না। স্বাধীনতা আন্দোলন আর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এক নয়। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তবে স্বরূপটি কী? কিসের ভিত্তিতে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদ দানা বেঁধেছিল? রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে, জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয় নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, ভাষা, ধর্ম বা সংস্কৃতিকে ঘিরে। ভারতবর্ষের মানুষ কোন ধারণাটির পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল? সে প্রশ্নের জবাব কী? কংগ্রেস নিজেকে যতই জাতীয়তাবাদী দল বলুক না কেন কংগ্রেস এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারেনি।

ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গোড়াতেই নানা সমস্যা রয়ে গিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রথম পর্বে তাই হিন্দুত্বের জাগরণ দেখা যায়। পরে কংগ্রেস হিন্দু মহাসভার সঙ্গে কণ্ঠ মেলায়। সত্যিকার অর্থে ভারতবর্ষকে অখণ্ড জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে দেখার সুযোগ থাকে হিন্দুধর্মকে ঘিরেই। না হলে আর কোনো বিষয়ই নেই, যাকে ঘিরে ভারত এক ভূখণ্ডে মিলিত হতে পারত। সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য গান্ধীকে তাই রামরাজত্বের কথা বলতে হয়। হিন্দু

মহাসভার প্রতিনিধিদের কংগ্রেস তাই কখনো অবহেলা করতে বা দল থেকে বাদ দিতে পারেনি। হিন্দু মহাসভার সাভারকার ১৯৩৭ সালে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে বলেছিলেন, ভারতের হিন্দু জাতীয়তার মূল বনিয়াদ হলো: হিন্দু, হিন্দুধর্ম, হিন্দুত্ব ও হিন্দুরাজ।[৩১] জিন্নাহর তিন বছর আগেই তিনি আরও বলেন, ভারতের জনসাধারণকে সমসদৃশ্য দুই জাতি বলে গণ্য করা যায় না। বলতে হয় দুই জাতি—হিন্দু-মুসলমান। জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা নন। কথাটা রফিকও স্বীকার করেছেন, কিন্তু বলেননি জিন্নাহর আগে আর কে কখন সেই তত্ত্বটি দিয়েছিলেন। মুসলমানরা যখন জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আলাদা রাষ্ট্রের দাবি করেন, সাভারকার তখন আগের মত পাল্টে হিন্দুদের পবিত্র ভূমির ওপর দাবি উত্থাপনকারী মুসলমানদের 'বিদেশি' আখ্যা দিয়ে 'অখণ্ড ভারত' ধ্বনি তোলেন। সাভারকারের মতে, 'ভারতমাতা' এক এবং অবিভাজ্য। ফলে সেই ভারতমাতাকে বিভক্ত করা হিন্দুরা বরদাশত করবেন না। কংগ্রেস বা গান্ধী সে সময় কী ভূমিকা নিলেন? গান্ধী তখন সাভারকারের মতের বিরুদ্ধে বলতে চেষ্টা করেন, ভারতবর্ষে ইংরেজ আবির্ভাবের আগে থেকেই হিন্দু-মুসলমান এক জাতি। তিনি আরও বলেন, আর যদি ভারতে কোনো রাষ্ট্র হিন্দুরাষ্ট্রই হয়, তাহলে হিন্দুধর্মের পরমতসহিষ্ণুতা সেখানে মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের স্থান পাকা করে দেবে। গান্ধীও শেষ পর্যন্ত হিন্দুধর্মের পরমতসহিষ্ণুতার কথাই বললেন। হিন্দুত্বেরই জয়গান গাইলেন। কথাগুলো গান্ধী লিখেছিলেন *ইয়ং ইন্ডিয়া* পত্রিকায়। হিন্দুদের মহত্ত্বকে তিনি মুসলমান ও খ্রিষ্টানদের রক্ষাকবচ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভাকে ছাড়তে পারলেন না।

ভারতের রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরিত্র প্রশ্নবোধক। সত্যিই কি এটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল? সব সময়ই দেখা গেছে, সংগ্রামের নামে আসলে ব্রিটিশ সরকারের কাছে কিছু দাবিদাওয়া পেশ করা। মুসলিম লীগ তো বটেই, এমনকি কখনো পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে কংগ্রেসও কোনো আন্দোলনে নামেনি। কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনও ছিল সরকারের ওপর একধরনের চাপ সৃষ্টি করে কিছু সুবিধা আদায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে পটপরিবর্তন হয়, তার ঢেউ লাগে ভারতীয় রাজনীতিতে। কংগ্রেস এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে সুবিধা আদায়ের জন্য ব্রিটিশের সঙ্গে দর-কষাকষি শুরু করে। ইংল্যান্ডকে যুদ্ধে সাহায্য করার পরিবর্তে কংগ্রেসকে ভারতের স্বাধীনতার বিষয়ে দাবিদাওয়া রাখে। যার মধ্যে ছিল 'জাতীয় সরকারের' দাবি। সংগ্রামের পথ পরিহার করে সেই পুরোনো ইংরেজদের দয়া-দাক্ষিণ্য চাওয়া—এই হলো কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নমুনা। কংগ্রেসের কিছু কিছু নেতার মতের বিরুদ্ধে গান্ধী 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু

করলেন। কিন্তু কংগ্রেস এই আন্দোলন থেকে কিছুই পায়নি, গান্ধীর বা আন্দোলনের নেতাদের নরমপন্থী চরিত্রের জন্যই সরকার কঠোরভাবে তা দমন করে। মুসলমানদের বড় অংশ এই আন্দোলনে যুক্তই হয়নি। মুসলিম লীগ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ছিল। গান্ধীর এসব হঠকারী আন্দোলনের আহ্বানের শেষ পরিণতি সবাই জানতেন। কিছু সাধারণ মানুষ গান্ধীর কথায় রক্ত দেবে, অত্যাচার সহ্য করবে, অতঃপর গান্ধী আন্দোলন থামিয়ে দেবেন। ব্রিটিশ সরকার নিজের সিংহাসনে অটল থাকবে।

বিপান চন্দ্র প্রমুখ লিখেছিলেন, ১৯৪৫ সালের জুন মাসের মাঝামাঝি কংগ্রেস নেতারা জেল থেকে বের হয়ে ভেবেছিলেন, ১৯৪২ সালের চূড়ান্ত অত্যাচারের ফলে জনতা হয়তো হতোদ্যম হয়ে নিস্পৃহ রয়েছেন। কিন্তু তাঁদের ধারণাকে ভুল প্রমাণিত করে দিয়েছিলেন জনতা। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর নেতারা এমন এক জনতাকে দেখতে পেলেন, যাঁরা ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে কিছু করার জন্য উদ্‌গ্রীব এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বস্তুতপক্ষে, জনতার এই তীব্র ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব নেতৃত্বের কাছে যুগপৎ উৎসাহ ও আশঙ্কার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল। বিশেষ করে কংগ্রেস নেতারা বুঝতে পারছিলেন না এই জনতাকে পরিচালিত করার ক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা কী হবে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয়ত যে ঘটনাটি ঘটে, তা হলো আজাদ-হিন্দ বাহিনীর কয়েকজন সেনানীর বিচার শুরু করল ব্রিটিশ সরকার দিল্লির লালকেল্লায়। সারা দেশ আজাদ-হিন্দ বাহিনীর সমর্থনে ও ব্রিটিশবিরোধিতায় ক্ষোভে ফেটে পড়ল। পরিহাস এমনই যে ব্রিটিশরা আজাদ-হিন্দ বাহিনীর যে তিনজনকে বিচারের জন্য বন্দী করেছিল, তাঁদের একজন হিন্দু পি কে সায়গল, একজন মুসলমান শাহনেওয়াজ খান এবং আর একজন শিখ গুরু বক্স সিং ধিলোন। ছাত্র-শ্রমিক আন্দোলনের পর ৫ থেকে ১১ নভেম্বর ব্রিটিশ বিমানবাহিনীতে বিদ্রোহ দেখা দেয়, তবে তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যে ঘটনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে স্তম্ভিত করে দেয়, তা হলো ১৯৪৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারির নৌ-বিদ্রোহ।

সবচেয়ে লক্ষণীয় যে বিদ্রোহীরা জাহাজের মাস্তুলে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও কমিউনিস্টদের পতাকা একসঙ্গে উড়িয়ে দেন। অর্থনৈতিক দাবির সঙ্গে জড়িত হয় রাজনৈতিক দাবি। দাবিগুলোর মধ্যে ছিল ভালো খাদ্য ও সম্মানজনক ব্যবহার, আজাদ-হিন্দ ফৌজ তথা সব রাজবন্দীর মুক্তি, ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার প্রভৃতি।[৩২] মুম্বাই, কলকাতা ও করাচিতে বিদ্রোহীদের সমর্থনে লাখ লাখ লোক রাস্তায় নেমে পড়েছিলেন এবং ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে আহত ও নিহত হয়েছিলেন শত শত মানুষ। ধর্মঘট চালানোর জন্য যে পর্ষদ গঠিত হয়, তার নেতা ছিলেন এম এস খান। রাজকীয় নৌবহরের নাম পাল্টে রাখা হয় 'ভারতীয় জাতীয়

নৌবাহিনী'। কিন্তু নেতৃত্ব কে দেবেন? বিদ্রোহী নেতারা আকুল হয়ে কংগ্রেস, লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি সবার কাছে আবেদন জানালেন। কিন্তু কংগ্রেস আবার নতুন করে হিংসার নিন্দা ও অহিংসার কথা বলতে লাগল। সত্যিকার অর্থেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা লাভ ঘটেনি। ব্রিটিশরাজ বা তাঁর প্রতিনিধি মাউন্টব্যাটেনের দয়ার ওপর নির্ভর করে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে মাত্র।

রফিক লিখেছেন, 'বিপ্লবে নয়, বিদ্রোহে নয়, ভারতের ক্ষমতার হস্তান্তর আপসবাদী পথে। ব্রিটিশরাজের প্রতিনিধি হিসেবে ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন তাঁর চতুর হিসাবমাফিক ভারত বিভাগের মাধ্যমে তাদের ভারত ত্যাগের সিদ্ধান্ত কার্যকর করেন।...কংগ্রেস ও লীগের পক্ষে এ অনুষ্ঠানের নায়ক যথাক্রমে জওহরলাল নেহরু ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।...ইতিহাস পর্যালোচনায় এ সত্য অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত যে জিন্নাহই দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা নন। লাহোর প্রস্তাবের বছর দুই-তিন আগে উগ্র হিন্দুত্ববাদী হিন্দু মহাসভা নেতা সাভারকারের বক্তব্যে শোনা গেছে এমন দাবি যে "হিন্দু-মুসলমান স্বতন্ত্র জাতি"।'[৩৩] জিন্নাহকে গ্রন্থের লেখক আগের অধ্যায়গুলোয় দ্বিজাতিতত্ত্বের মূল প্রবক্তা হিসেবে চিহ্নিত করে বর্তমান অধ্যায়ে সাভারকারের প্রসঙ্গটি টেনে নিরপেক্ষ একটি জায়গায় থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি শেষবিচারে জিন্নাহকেই খলনায়ক বানিয়েছেন। ফলে তিনি নিরপেক্ষ হতে চেয়েও একপক্ষে রয়ে গেছেন। তিনি 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'—এ রকম একটা জায়গায় থেকে বহু সত্য স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। বা সেই সব তথ্য তাঁর জানা ছিল না। কিছুদিন আগে পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদীরা অহিংস গান্ধীকে এমন পূজনীয় করে তুলেছিলেন যে জিন্নাহ তাঁর পাশে খলনায়ক ছাড়া কিছুই ছিলেন না। সময়ের কালপ্রবাহে গান্ধীর কর্ম বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াচ্ছে, জিন্নাহকে জানার কিছুটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে।

রফিকের গ্রন্থটির বিশেষ কিছু দুর্বল দিক রয়েছে। দুর্বলতার মধ্যে প্রধান একটি হচ্ছে পুনরাবৃত্তি। যদিও গ্রন্থের শুরুতে লেখক এই পুনরাবৃত্তির কথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু পুনরাবৃত্তি এক-দুবার নয়—কখনো তা এতসংখ্যকবার যে গ্রন্থটি পড়তে বিরক্তি ধরে যায়। বইয়ে কিছু কিছু মন্তব্য বা ঘটনা তিনি দু-চারবার নয়, সাত-আট বা দশবার পর্যন্ত করেছেন। না হলে বইটির পৃষ্ঠার সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ কমানো যেত। গ্রন্থটি ধারাবাহিকভাবে বহুদিন ধরে লেখা হয়। সে কারণে পুনরাবৃত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। পুনরাবৃত্তি বৃদ্ধির আরেকটি কারণ লেখক তাঁর ধারণা বা বিশ্বাসগুলোকে বারবার উপস্থিত করে পাঠকের মনে গেঁথে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু সেটা দোষের মনে হতো না যদি পুনরাবৃত্তিগুলোর বারবার ব্যবহারে তা বিরক্তিকর না হয়ে উঠত। প্রথম দিকে যত দ্রুত বইটি পাঠ করে এগোনো যায়, পুনরাবৃত্তির কারণে কিছুদূর এগোনোর পর আর সেটা হয় না।

বিশেষ করে যাঁরা ভারতভাগ নিয়ে ইতিমধ্যে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন বা ভারতভাগের তথ্যগুলো যাঁদের কমবেশি জানা, পুনরাবৃত্তিগুলো স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের বিরক্তি উদ্রেক করবে। কিন্তু লেখককে এ ব্যাপারে ছাড় দিতে হয় তাঁর বয়সের কারণে। ৮৪-৮৫ বছর বয়সে এই ধরনের একটি বৃহৎ বই লেখাই বিরাট ধৈর্যের ব্যাপার। নিশ্চয় সে কারণেই ধারাবাহিকভাবে দেশভাগ নিয়ে লেখাগুলো গ্রন্থটি প্রকাশকালে খুব যত্ন নিয়ে সম্পাদনা করা গ্রন্থাকারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিন্তু গ্রন্থের এটি দুর্বলতা। গ্রন্থের দ্বিতীয় দুর্বলতা হচ্ছে, তিনি যেমন নানা ঘটনার বহুল পুনরাবৃত্তি করেছেন, ঠিক তেমনি গুরুত্বপূর্ণ বহু তথ্য প্রদান করেননি। সে জন্য দেশভাগ সম্পর্কে নতুন পাঠকদের পক্ষে জিন্নাহকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা কঠিন হবে। জিন্নাহকে ভুল বোঝার অনেক অবকাশ থেকে যাবে।

জিন্নাহ যে ধনী মুসলমানদের স্বার্থে পাকিস্তান চেয়েছেন, সেটা মিথ্যা নয়। যখন কংগ্রেস দলের বিরাট ব্যক্তিত্ব জিন্নাহকে ছুড়ে ফেলে দেয়, মুসলমান ধনীরা তাঁকে মুসলিম লীগের প্রধান আসনে বসিয়ে তাঁর পুরোনো সম্মান ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। স্বভাবতই জিন্নাহ তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। যাঁদের মাধ্যমে তিনি তাঁর হারানো গৌরব ফিরে পেয়েছিলেন, তিনি তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য লড়বেন, এটাই তো স্বাভাবিক। জিন্নাহ তবু পাকিস্তানের দাবি তোলেননি। চেয়েছিলেন মুসলমানদের জন্য কিছু অধিকার, কিন্তু কংগ্রেস তা মেনে নিতে রাজি ছিল না। জিন্নাহ এবং ভারতের এক-চতুর্থাংশ মুসলমানকে তাঁরা শক্তি হিসেবে দেখতেই রাজি ছিলেন না। জিন্নাহর জেদ বেড়ে গেল। শেক্সপিয়ারের নাটকের কোরিওলেনাসের মতো নিজের এবং মুসলমানের শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। রফিকও লিখেছেন সে কথা। রফিক রাখঢাক না করেই বলেন, তখন জিন্নাহর একটাই লক্ষ্য, যেকোনো মূল্যে মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। বিচ্ছিন্ন মুসলিম রাজনৈতিক শক্তিগুলোকে লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। তা না হলে হিন্দুপ্রধান কংগ্রেস রাজনীতির দিকে চোখে চোখ রেখে কথা বলা যাবে না।[৩৪]

বারবার দেখা যাবে তিনি সর্বভারতীয় নেতা হিসেবে জিন্নাহ, গান্ধী, নেহরু, প্যাটেল, আজাদ প্রমুখ কাউকে দেশভাগের দায় এড়াতে দেননি। কিন্তু পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না, তিনি আজাদকে এর দায় থেকে অনেকটা মুক্ত রেখেছেন—ঠিক একইভাবে ভারতভাগের মূল দায়টি চাপিয়েছেন জিন্নাহর ঘাড়ে। তিনি দেশভাগের দায় থেকে ব্রিটিশ শাসকদের মুক্তি দেননি, কিন্তু প্রধান খলনায়ক বা খলনায়ক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন জিন্নাহকে। রচয়িতা *দেশবিভাগ: ফিরে দেখা* গ্রন্থে জিন্নাহর ওপর তাঁর ব্যক্তিগত ক্রোধ লুকাতে পারেননি। তিনি সেটা চেষ্টাও করেননি। জিন্নাহ সম্পর্কে আয়েশা জালালের গবেষণাকে তিনি সামান্যতম

বিবেচনার মধ্যে রাখতে চান না। যদি কেউ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন, তাহলে দেখতে পাবেন, আহমদ রফিকের রচনাটি প্রধানত আয়েশা জালালের বক্তব্যের একটি বিরোধী তত্ত্ব হিসেবে আবির্ভূত। এ ব্যাপারে সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে। রফিক লিখেছেন, 'আয়েশা জালাল এবং পাকিস্তানবাদী লেখকদের এমন বক্তব্য যুক্তিনিষ্ঠ নয় যে জিন্নার পাকিস্তান প্রস্তাব বা দ্বিজাতিতত্ত্ব কংগ্রেস ও "রাজ"-এর সঙ্গে রাজনৈতিক চাপ ও দেনদরবারের হাতিয়ার।'[৩৫] কিন্তু আয়েশা জালালের বক্তব্যকে জয়া ব্যাখ্যা করছেন এভাবে, 'এই দৃষ্টিভঙ্গিতে জিন্নাহকে মনে হয়, তিনি পাকিস্তানের ধারণাকে একটা "দর-কষাকষির প্রতিঘাত" হিসেবে প্রসারিত করেছেন। বলা হয়, জিন্নাহ ধারণা করেছিলেন যে কংগ্রেস দেশ বিভাগ এড়াতে খুবই উদ্বিগ্ন এবং ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে রাখার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় যেকোনো ছাড় দিতে প্রস্তুত।'[৩৬]

সত্যি হলো এই যে জিন্নাহর মনে যা-ই থাকুক না কেন, তিনি মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রদায়গত জাতীয়তাবোধের চেতনা জাগ্রত করেন। ইতিহাসে খুব কম গবেষকই জিন্নাহকে এ দায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কিন্তু জিন্নাহর রাজনৈতিক ইতিহাস হঠাৎ মাঝপথ থেকে শুরু করলে সেটা খুব বিচার-বিবেচনার বিষয় হয় না। তিনি কী করে এক বিরাট সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে বিরাট ব্যক্তিত্ব হয়ে দাঁড়ালেন, সেটা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। জিন্নাহর পুরোনো দিনের রাজনীতি সম্পর্কে লেখক তাঁর গ্রন্থে কিছুই বলেননি। তিনি কয়েকবার সরোজিনী নাইডু যে জিন্নাহকে 'হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত বলেছেন', তাও স্বীকার করছেন। কিন্তু কী কারণে, কোন প্রেক্ষাপটে সরোজিনী নাইডু জিন্নাহ সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছিলেন, তা বলছেন না। যিনি একদা হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত ছিলেন, তিনি কেন হঠাৎ মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র চাইছেন, তার ব্যাখা নেই সারা গ্রন্থের কোথাও।

ইতিহাসের গতিপথে শুধু ব্যক্তি জিন্নাহ বলে কিছু নেই। সমাজের কারও না কারও দাবির বাহন হচ্ছে সেখানে ব্যক্তি। জিন্নাহ মুসলমানদের আলাদা জাতি বলার জন্য বহুজনের কাছে খলনায়ক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু জিন্নাহর বহু আগেই এই কথা উচ্চারিত হয়েছে ভারতে হিন্দু-মুসলমান আলাদা জাতি। কিন্তু পয়সার সে পিঠ উল্টে দেখতে চান না অনেকে। সম্প্রদায়গত রোয়েদাদের পর হিন্দু ভদ্রলোকদের সুযোগ-সুবিধা কমে গেল। বিশ শতক পর্যন্ত হিন্দু ভদ্রলোক এবং জমিদারদের জন্য যেসব মর্যাদার ভিত দীর্ঘদিন ধরে অক্ষুণ্ন ছিল, তা দৃশ্যত ভেঙে পড়তে শুরু করল। লর্ড জেটল্যান্ডের কাছে প্রেরিত বাংলার সব নামীদামি ও বড় বড় হিন্দু নেতার স্বাক্ষরিত এবং ব্যাপকভাবে প্রচারিত এক স্মারকলিপিতে বলা হলো, 'বাঙলার হিন্দু সম্প্রদায়; তারা হলো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং সে কারণে

অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যালঘুদের প্রদত্ত নিরাপত্তার মতো তারাও নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী। বাঙলার সংখ্যালঘু হিন্দুরা স্বীকৃত সংখ্যালঘুর অধিকার হিসেবে তাদের প্রাপ্য যথার্থ প্রতিনিধিত্বের দাবি করছে।'[৩৭] যখন সংখ্যালঘু ভদ্রলোকেরা জেটল্যান্ডের কাছে সংখ্যালঘু হিসেবে নিরাপত্তা দাবি করেন, সেটা দোষের কিছু নয়, যখন জিন্নাহ মুসলমান সংখ্যালঘুদের হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে দেনদরবার করেন, সেটা হয়ে দাঁড়ায় সাম্প্রদায়িকতা।

জিন্নাহর সাম্প্রদায়িক ভূমিকাকে খাটো করে দেখার ইচ্ছা নিয়ে এই বিতর্ক সৃষ্টি করা নয়—ইতিহাসের বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে আসার এটা একটা প্রচেষ্টা। মূল বক্তব্য হলো সমাজে বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজ নিজ চাহিদা থাকে। ইতিহাসে ব্যক্তির বা নেতার কর্মসূচি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা দরকার। যিনি ইতিহাস জানেন, তাঁর সত্য বলার দায়বদ্ধতা রয়েছে। ভারতে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রকাশ জিন্নাহর লাহোর প্রস্তাবের প্রায় ১০ বছর আগেই ঘটে গেছে। সেবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে কলকাতা টাউন হলের এক সভায় হিন্দু ভদ্রলোক সমাজের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যোগদান করেন। সেখানে রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের প্রস্তাবের সঙ্গে দ্বিজাতিতত্ত্বের অনেক মিল রয়েছে। তিনি বলেন, 'হিন্দু-মুসলমানদের পৃথক সাংস্কৃতিক সংশ্লিষ্টতা, তাদের শিক্ষা, ব্যক্তিগত আইন এবং অনুরূপ বিষয়ের প্রেক্ষিতে তাদের পৃথক জাতি হিসেবে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে...এ ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারণাই বাংলার জন্য উপযোগী হতে পারে।'[৩৮] মুখোপাধ্যায়ের উত্থাপিত প্রস্তাবে হিন্দু-মুসলমান দুই জাতির ধারণা থেকে জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের পার্থক্য কতটুকু? বরং হিন্দু-মুসলিম আইনের প্রশ্ন তুলে দ্বিজাতি বিষয়টিকে আরও জোরদার করা হয়। সন্দেহ নেই এটা ছিল সমগ্র বাংলার হিন্দু ভদ্রলোক সমাজের গভীর হতাশা ও ক্রোধ এবং রোয়েদাদের চরম অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কিন্তু শাসকদের আঘাত না করে সেটা পরিচালিত হয়েছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং শিক্ষিত হিন্দুরা মুসলমানদের তাঁদের থেকে আলাদা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন জিন্নাহর দাবির ১০ বছর আগে।

স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারতবাসীদের মধ্যকার এই লড়াই সম্পর্কে বহু কথা বলেছেন আহমদ রফিক তাঁর গ্রন্থে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বাইরে তিনি তাঁর আলোচনাকে বিস্তৃত করেননি। কিংবা বিস্তৃত করার মতো তথ্য তাঁর হাতে ছিল না। বর্তমানে দেশভাগের গবেষণা বা দেশভাগ সম্পর্কে ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি বহুদূর প্রসারিত হয়েছে। শুধু ধনিক শ্রেণির হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতির বাইরে আরও নানা দিকে তাঁরা দৃষ্টি চালিত করেছেন। সেখানে হিন্দু উচ্চবর্গের সঙ্গে হিন্দু নিম্নবর্গের বিরোধটাও গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষ করে বাংলার নেতৃস্থানীয় হিন্দু ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরা ছিলেন মোট জনসংখার মাত্র ৬ শতাংশের মতো। বাকি

চুরানব্বই শতাংশ হিন্দু শূদ্র বা শূদ্রদের থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ইত্যাদি। ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিংশ শতকের ত্রিশের দশকেও মুসলমানরা জাতীয় স্তরে সম্প্রদায়ে পরিণত হননি। বিশেষ করে বাংলা ও পাঞ্জাবে। বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দায় সব মানুষের কাছেই অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো প্রাধান্য পায়।[৩৯] সেগুলোকে সাম্প্রদায়িকতা বলা ঠিক নয়। মুসলমানরা নিজেদের আর্থিক সুবিধালাভের দিকে তাকিয়েছিলেন, হিন্দুধর্মের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেননি। জয়া চট্টোপাধ্যায় দেখাচ্ছেন যে ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছাড়া বাংলার উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বর্ণভিত্তিক সমাজের পুরোহিততন্ত্রের কাঠামোকে অক্ষুণ্ন রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ১৯৩৩ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় এম সি রাজা অস্পৃশ্যতা বিলোপ বিল উত্থাপন করলে বাংলার প্রত্যেক হিন্দু সদস্য ওই বিলের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। পণ্ডিত সত্যেন্দ্রনাথ মনে করেন, 'তাদের পেশা, তাদের আচার-আচরণ ও তাদের সংস্কৃতির জন্য তারা কখনো বর্ণহিন্দুদের সমপর্যায়ে আসতে পারে না।' অমরনাথ দত্ত ঘোষণা করেন, 'এই লোকগুলো আগে অধিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোক, অধিক পবিত্র হোক এবং জীবনের উত্তম আদর্শ লালন করুক...তখন আমি তাদের সঙ্গে মেলামেশা করব।' বি পি সিংহ রায় বিলকে প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ তা 'হিন্দুদের ধর্মীয় অধিকারের ওপর অনধিকার প্রবেশ এবং হিন্দু সমাজের ভিত্তিকে অবমূল্যায়ন করার প্রয়াস'।[৪০] ফলে অস্পৃশ্যরা বর্ণহিন্দুদের থেকে আলাদা হয়ে যেতে চেয়েছিলেন। মুসলমানদের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও সাম্প্রদায়িক বিভেদের তাহলে আরও কারণ ছিল।

আগেই রফিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু কিছু প্রশ্ন থেকে যায়। গ্রন্থের শেষের দিকে তিনি যেসব কথা বলেছেন, তা নিয়ে কিছুটা কথা বলা যেতে পারে। প্রথমত, তাঁর শেষ অধ্যায়ের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি তুলে ধরা যেতে পারে। তিনি সেখানে বলছেন, 'বিভাগোত্তর ছয় দশকেরও বেশি সময়-পর্বের রাজনৈতিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে আজ প্রশ্ন উঠতে পারে, পূর্বোক্ত পরিস্থিতি কি এতটাই নিয়তিনির্ধারিত ছিল যে দেশ বিভাগের কোনো বিকল্প ছিল না? পথ কি মাত্র একটিই ছিল যে অন্য কোনো পথে ক্ষমতার হস্তান্তর সম্ভব ছিল না?' মন্ত্রী মিশন প্রস্তাবে আজাদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল...মুসলিম স্বার্থে জিন্নাকে কিছুটা ছাড় দিয়ে হলেও ভারতের অখণ্ডতা রক্ষার চেষ্টা করা হোক। কখনো কখনো গান্ধীও এমন ধারণা পোষণ করেছেন। কিন্তু কংগ্রেসি চরমপন্থীরা ভারতমাতাকে খণ্ডিত করতে রাজি, তবু শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা হাতছাড়া করতে রাজি নন। প্যাটেল তাঁদের মধ্যমণি।...আর জিন্নাহর পথ তো একটাই ছিল যে পথের শেষে একটি মাত্র মাইলফলকে চাঁদতারাসহ আট অক্ষরে খোদিত শব্দ "পাকিস্তান"।'[৪১] কথাগুলো রফিক ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এগুলোর কোনোটিই নতুন কথা নয়। যাঁরা দেশভাগ নিয়ে গবেষণা করছেন বা প্রচুর পড়াশোনা করেছেন, তাঁরা সবাই জানেন বহু বছর ধরেই এসব বক্তব্য আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু রফিকের বলা সত্যের ভিন্ন দিকও রয়েছে।

নতুন গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের জায়গায় শুরু হয় হিন্দুত্ববাদের জয়গান, যা শুরু থেকেই শিক্ষিত মুসলমানদের হিন্দুদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা সমাজ বা আর্যসমাজ বা পরে গঠিত হিন্দুসভা, হিন্দু মহাসভা—সবই পরিচালিত হতো উচ্চবর্ণের হিন্দুদের দ্বারা। বিশেষ করে হিন্দু মহাসভা সচেতন হয়েই নানাভাবে মুসলিম বিদ্বেষ ছড়িয়েছিল, মুসলমানদের সম্প্রদায়গতভাবে খাটো করার চেষ্টা করেছিল। উচ্চবর্গের হিন্দুদের তৈরি প্রতিষ্ঠানগুলো ভারতের মুসলমান শাসকদের সম্পর্কেও নানা ধরনের কুৎসা এবং মনগড়া নেতিবাচক কথা বলে মুসলিমদের সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজটি করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ কোনো ধর্মরক্ষার সংগঠন হিসেবে আবির্ভূত হয়নি, মুসলিম লীগ ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সংগঠন। ধর্ম হিসেবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার বা হিন্দুত্বকে খাটো করার চেষ্টা কখনো মুসলিম লীগের ছিল না। জিন্নাহ যখন মুসলিম লীগের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র বা পাকিস্তান দাবি করেন, তখনো তিনি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে সামান্যতম কটু মন্তব্য করেননি। কংগ্রেসও ইসলাম সম্পর্কে কখনো সামান্য কটূক্তি করেনি। না গান্ধী, না নেহরু, না প্যাটেল। কিন্তু কংগ্রেসের নেতৃত্বের মধ্যকার হিন্দু মহাসভার নেতারা বহু সময় মুসলমানদের সম্পর্কে কটূক্তি করেছেন।

মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে সাংবিধানিক প্রশ্নে, মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে—কিন্তু ধর্মীয় প্রশ্নে নয়। কংগ্রেস কখনো মুসলমানদের বা ইসলাম ধর্মকে আঘাত করেনি। মুসলিম লীগ সম্পর্কেও ঠিক সেই রকম কোনো অভিযোগ তোলা যাবে না যে সম্প্রদায়গত প্রশ্নের বাইরে তারা কারও ধর্ম সম্পর্কে কটূক্তি করেছে। কখনোই না। ফলে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সম্পর্কে এটা সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে, ভারতে যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ, সেটা সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক-সামাজিক বা বৈষয়িক স্বার্থকে ঘিরে, কখনোই ধর্মকে ঘিরে নয়। হিন্দু মহাসভা যে কাজটি বারবার করেছে, তা হলো ধর্মকে আক্রমণ। নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার এবং ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা। ফলে ধর্মীয় বিশ্বাসের সমন্বয়কে যেসব মুসলিম নেতৃত্ব সমর্থন করতেন, তাঁরাও ক্রমেই সংখ্যালঘু হয়ে পড়তে থাকেন।[৪২] স্বভাবতই মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রথম দায়ভার শিক্ষিত হিন্দুদেরই নিতে হবে। জিন্নাহর দায়ভার সে তুলনায় কম। কারণ,

বর্ণহিন্দুদের দ্বারা নিগৃহীত মুসলমান সম্প্রদায়ের একজন হয়েও তিনিই প্রথম হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষার জন্য বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। জিন্নাহর উদ্দেশ্য যা-ই থাকুক না কেন, পরে তাঁর রাজনীতি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত জাতীয়তাবোধের চেতনা জাগ্রত করে, যা আবশ্যিকভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সন্দেহ, ঘৃণা ও উগ্রতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টিতে জিন্নাহর দায় কম নয়।

জিন্নাহর মুসলিম লীগ সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে বাড়তে সাহায্য করেছিল। কিন্তু জিন্নাহ মুসলিম লীগকে আগের মতোই অসাম্প্রদায়িক হিসেবে দাঁড় করতে পারতেন। তিনি তা করেননি। মুসলিম লীগের রাজনীতি খাকসার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার জনভিত্তিকে প্রসারিত করতে দ্রুত সাহায্য করল। সুনীল চন্দর বলছেন, এরপর থেকে মুসলিম লীগ তৃণমূল পর্যায়ে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অবস্থায় আসে। লীগের স্বেচ্ছাসেবকেরা কংগ্রেসের মতো 'ইউনিফর্ম' ব্যবহার শুরু করলেন এবং বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণকেন্দ্র গড়ে তুললেন। তাঁদের সঙ্গে থাকত ছুরি ও ছোরা। ১৯৩৯ সালের শেষ নাগাদ লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা ১৫ হাজার থেকে বেড়ে সাড়ে ১৮ হাজার হয়েছিল।[৪৩] লীগের সাম্প্রদায়িক প্রচার গুরুত্ব পেয়ে যায় কংগ্রেসের কিছু প্রতীক বা স্লোগানের জন্য, যথা বন্দেমাতরম, বিদ্যামন্দির এবং রামরাজ্য। গান্ধীর রামরাজ্যর তাৎপর্য সাধারণ মুসলমানদের কাছে স্পষ্ট ছিল না। হিন্দুদের সম্পর্কে মুসলমানদের ভীতি আরও বৃদ্ধি পেল, যখন হিন্দু মহাসভার বালাকৃষ্ণান শিবরাম মুসলমানদের প্রতিরোধ করার জন্য এক জাতীয় সামরিক বাহিনী বা 'রামসেনা' গঠনের আহ্বান জানালেন। প্রত্যুত্তরে জিন্নাহ সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ জাতীয় বাহিনী গঠনের কথা বললেন।[৪৪] নিঃসন্দেহে এর দায় জিন্নাহর একার নয়।

কিন্তু তারপরও সাম্প্রদায়িক বিভেদ বর্জন করা যেত। অথচ কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেই পথে যায়নি। ১৯৪৬ সালে আজাদ-হিন্দ বাহিনীর বিচার ও নৌ-বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে জনতার মধ্যে যে জাগরণ আরম্ভ হয়েছিল, মুন এই সময়কার আন্দোলনগুলো পর্যালোচনা করে বলেছিলেন, ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আজ আগ্নেয়গিরির কিনারায়। বিদ্রোহীরা প্রথমে গেলেন অরুণা আসফ আলীর কাছে, যিনি বিয়াল্লিশ আন্দোলনে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টির হয়ে পালন করেছিলেন অগ্নিময় ভূমিকা। তিনি আশা করেছিলেন, কংগ্রেস এই হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে কাজে লাগাবে। কিন্তু জাতীয় নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? **পুনা** থেকে ১৯৪৬ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি গান্ধী এক বিবৃতিতে বললেন, 'হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য এই যে "মিলন", তা অশুভ।...এ বিক্ষোভের শক্তি সীমাহীন সন্দেহ নেই, কিন্তু এর ব্যবহার প্রয়োজনের

অতিরিক্ত হতে দেওয়া ঠিক নয়।' নাবিকদের বিদ্রোহী পর্ষদ যখন মুম্বাইয়ের মানুষকে সাধারণ ধর্মঘট পালনের আবেদন জানায়, তখন ক্রুদ্ধ নেহরু বলেন, 'ধর্মঘট কমিটির এ ধরনের আবেদনের কোনো প্রয়োজন ছিল না। আমি এ সমস্ত জিনিস সহ্য করব না।'[৪৫] তিনি নৌবাহিনীর বীরত্বের প্রশংসা করে বলেন, 'সেনাবাহিনীতে শৃঙ্খলা রক্ষা করাই মূলকথা এবং নৌ-বিদ্রোহীরা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করুক।' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল প্রথম থেকেই এর বিরোধী ছিলেন। তিনি বললেন, 'কেন জনসাধারণ বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পথে পা বাড়িয়েছে, তা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। কংগ্রেসের নাম করে যে সমস্ত কংগ্রেসের লোক জনসাধারণকে বিদ্রোহের জন্য উস্কানি দিচ্ছে, আমি তাঁদের সম্বন্ধেও দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।'[৪৬] কী রকম ভণ্ডামি আর ইংরেজদের দাসত্ব আর নিজ ভাইদের সঙ্গে বেইমানি, যা মীর জাফরকে হার মানায়। অরুণা আসফ আলী বলেছিলেন, দেশে এই পরিস্থিতিতে ব্যারিকেড লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সংহতি ফিরে আসতে পারে। তিনি ঠিকই বলেছিলেন, হিন্দু-মুসলমানদের ঘৃণাটা মিলিতভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রবাহিত হলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ অনেকটা ঘুঁচে যেত। কিন্তু গান্ধী অরুণা আসফকে বিরোধিতা করে বললেন, যখন ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলছে, তখন এই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্তে তা বিলম্বিত হতে পারে। বিদ্রোহীদের তোপের মুখে ফেলে গান্ধীর কাছে ক্ষমতা লাভ তখন প্রধান হয়ে দাঁড়াল। বিদ্রোহ বা বিদ্রোহের পক্ষে জনতার আন্দোলন যে ন্যায়সংগত ছিল, সেটা বলতেও তাঁরা ভয় পাচ্ছিলেন। স্বাধীনতার পক্ষের মানুষগুলোকে বলির পাঁঠা বানানো হলো ক্ষমতা লাভ করে মন্ত্রী হওয়ার জন্য।

বাংলাভাগ তথা দেশভাগ ভারতের রাজনীতিতে নানা কারণেই গুরুত্ব পেয়েছে। বহুজন এই দিকের প্রতি নজর দিয়েছেন। দেশভাগ আর স্বাধীনতা একই সঙ্গে ঘটে। ব্যাপারটা একসময়ে এমন হয়ে দাঁড়াল যে দেশভাগ না হলে ভারত স্বাধীন হতে পারছে না। খুব জটিল সমীকরণ চলছিল তখন ভারতের অন্দরমহলে। ব্রিটেনের নবনির্বাচিত লেবার পার্টির প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ভারতের বড়লাট ওয়াভেলকে বিলেতে ডেকে নিয়ে তাঁকে দিয়েই প্রকাশ্যে ভারতবর্ষকে অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন ১৯৪৫ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। কিন্তু সে বছর ভারতের ভাগ্যে স্বাধীনতা ঘটেনি, আরও দুই বছর অপেক্ষা করতে হলো। কিন্তু এই দুই বছর ভারতবাসীকে প্রতিপক্ষ ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়নি। ইরেজদের পক্ষ থেকে সুস্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছিল, ক্ষমতা হস্তান্তর কীভাবে সম্পন্ন করা হবে, সে ব্যাপারে ভারতবাসীর নিজেদের মধ্যে যে মুহূর্তে ঐকমত্য স্থাপিত হবে, সেই মুহূর্তেই ব্রিটেন ভারত ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত।[৪৭] ব্রিটিশ শাসকেরা এ কথাও বলেছিলেন, ভারতবাসীর মধ্যে ঐকমত্য

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে তাঁরা খুব বেশিদিন অপেক্ষা করতে রাজি নন। ব্রিটিশ ক্ষমতা হস্তান্তর করবে কি না, এটা আর আলোচনার বিষয় ছিল না; বরং কত দ্রুত, কার কাছে এবং কী শর্তে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে, এটাই ছিল আলোচনার বিষয়। ভারত ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারে ইংরেজ সরকারের ভেতর থেকেই একটা প্রকট তাগিদ ছিল। অথচ ইতিহাসের কী নিদারুণ পরিহাস, ইংরেজ প্রবলভাবে ভারত ছেড়ে যেতে চাইলেও ভারতীয়দের অনেক প্রভাবশালী অংশই তাঁদের মনেপ্রাণে বিদায় দিতে চাননি। ঠিক এই রকম এক জনগোষ্ঠীর নেতা জগজীবন রাম বড়লাট ওয়াভেলকে বলেন, ইংরেজ ভারত ত্যাগ করলে তাঁদের মতো তফসিলি জাতির মানুষের বর্ণহিন্দুদের উৎকট আধিপত্য সহ্য করে দিনাতিপাত করতে হবে। তিনি অকপটে স্বীকার করেন যে অন্তত তাঁদের সমাজভুক্ত মানুষের কল্যাণ ও নিরাপত্তার জন্য ইংরেজদের আরও ১০ বছরের আগে ভারত ত্যাগ করা উচিত হবে না।[৪৯]

ঠান্ডা মাথায় দেশ বিভাগ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে, সমস্যাটা শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক বিভেদ ছিল না। দেশভাগ শুধু জিন্নাহর পাকিস্তান প্রস্তাবের কারণেও হয়নি, যা ছিল বহুকাল পর্যন্ত দেশ বিভাগের প্রধান তত্ত্ব। জিন্নাহ যেমন হিন্দুদের শাসনে থাকতে চাননি, ঠিক একইভাবে জগজীবন রাম হিন্দুদের শাসনে থাকতে চাননি। হিন্দুদের শাসনে থাকতে চাননি আম্বেদকর। বর্ণহিন্দুদের প্রতি বিতৃষ্ণার কারণে ১৯৩৫ সালে আম্বেদকার নিজ সম্প্রদায়কে নিয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন।[৫০] গান্ধীর অনশনের কারণে তিনি মত বদলান। বর্ণপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার ব্যাপারে গান্ধীর ধারণার সঙ্গে তফসিলি সম্প্রদায়ের মতভেদ ছিল। বর্ণহিন্দুরা বা গান্ধী মনে করতেন, তফসিলিরা হিন্দুসমাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু তফসিলিরা বর্ণহিন্দু-প্রভাবিত রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে একীভূত হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানায়। বি আর আম্বেদকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, ধর্ম ও রাজনীতির বিষয়ে হিন্দু পরিমণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরই কেবল নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা তাঁদের অবস্থার উন্নতি করতে পারবেন। তিনি যুক্তি দেখান, 'হিন্দু ও মুসলমান, হিন্দু ও শিখ এবং হিন্দু ও খ্রিষ্টানদের মধ্যকার মনোমালিন্য হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের মধ্যকার মনোমালিন্যের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই মনোমালিন্য ব্যাপক ও গভীর। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যকার মনোমালিন্য ধর্মীয়—সামাজিক নয়। আর হিন্দু ও অস্পৃশ্যদের মনোমালিন্য ধর্মীয় ও সামাজিক...।'[৫১]

বর্ণহিন্দুদের শোষণ থেকে মুক্তি বা আলাদা হওয়া শুধু জিন্নাহর একার দাবি ছিল না। দেখা যায় আরও অনেকে উচ্চবর্গের হিন্দুর থেকে আলাদা হতে চেয়েছিলেন। প্রশ্নটা হলো এই, কংগ্রেস ভারতীয়দের বা ভারতীয় সব সম্প্রদায়ের সংগঠন ছিল না। মুসলিমদের প্রশ্নে নেহরু বা কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, তার প্রমাণ মেলে আজাদের সংরক্ষিত ৩০ পৃষ্ঠার মধ্যে। সেটা মোটেই সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে ছিল

না। খুব স্পষ্ট করে সেটা দেখিয়ে দেয়, এসব রাজনীতিবিদ নিজেদের সুযোগ-সুবিধামতো যেকোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারতেন। ১৯৩৫ থেকে '৩৭ সাল পর্যন্ত জিন্নাহ চেষ্টা করেছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে একটা আপসের মধ্যে দিয়ে পথ চলতে। কংগ্রেসের অহম সেটা হতে দেয়নি বলে জিন্নাহ ভিন্ন রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলেন। জিন্নাহ তো একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, জোর করে আমাকে মুসলমানের দলে ঠেলে দেওয়া হলো। ইতিহাসের এসব সত্যিকে এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সে কারণে অনেকেই ভারতভাগের দায় থেকে জিন্নাহকে মুক্তি দিতে চান। জিন্নাহর ব্যাপারটা না হয় বাদ দেওয়া গেল। মুসলমান ছাড়াও তফসিলি মানুষ, হরিজন, শিখ প্রভৃতি কোনো পক্ষই অপর পক্ষের সঙ্গে সহমত হতে পারছিল না। ফলে ইংরেজ যে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দেয়, সেই স্বাধীনতার প্রকরণ ও সীমানা স্থির করার জন্য ভারতবাসী নিজেদের মধ্যেই লড়াই শুরু করেছিল।

মাওলানা আজাদ সম্পর্কে রফিক মন্তব্য করছেন, 'দুটো বিষয়ে তিনি নীতিগতভাবে অটল ও অনড়। যেমন সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতায়, তেমনি পাকিস্তান বিরোধিতায়। নেহরু-প্যাটেল যখন পাকিস্তান দাবির কাছে নতি স্বীকার করছেন, গান্ধী নীরব, গাফফার খান প্রবল প্রতিবাদী, তখন ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সহকর্মীদের নীতিভঙ্গে ক্ষুব্ধ, আহত আজাদ নিঃশব্দে ঘরের এক কোণে বসে ক্রমাগত সিগারেট টেনে চলেছেন মনের অস্থিরতা চাপা দিতে।...ভারতের অখণ্ডতা বজায় রেখে ক্ষমতা হস্তান্তরবিষয়ক আজাদের কোনো প্রস্তাবই গান্ধী বা নেহরু বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মনঃপূত হয়নি। অবস্থাদৃষ্টে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে নেহরু-প্যাটেল-প্রসাদ প্রমুখ সহকর্মী সবাই ক্ষমতার জন্য অস্থির হয়ে বরাবরের নীতি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত, সেখানে তাঁর একক প্রতিবাদ গ্রাহ্য হবে না। তাই ওই অমোঘ দিনটিতে নীরবতাই প্রশস্ত মনে করেছেন আজাদ। গান্ধীও অবস্থাদৃষ্টে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করেননি। তবে নেহরুকে আজাদ বলেছিলেন: "দেশভাগ মেনে নেওয়ার জন্য ইতিহাস আমাদের ক্ষমা করবে না"। কিন্তু নেহরু সে নীতিকথায় কান দেননি।[৫২] মাউন্টব্যাটেনের দেশভাগসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রথম গ্রহণ করেন বল্লভভাই প্যাটেল। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই তিনি প্রকাশ্যে বলতে থাকেন, মুসলিম লীগের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য ভারতের একাংশ ছেড়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। আজাদ লিখেছেন, 'এ কথা বলা বোধ হয় অন্যায় হবে না যে ভারত বিভাজনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল।'[৫৩]

যশোবন্ত সিং বলেই দিয়েছেন, ভারতভাগের পেছনের মূল কারণ জিন্নাহ বা তাঁর দ্বিজাতিতত্ত্ব নয়। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, কংগ্রেস নেতৃত্বের ব্যর্থতাই এর জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী। তিনি প্রধানত দোষী করেছেন জওহরলাল নেহরু ও

বল্লভভাই প্যাটেলকে। গান্ধী সম্পর্কেও তাঁর সমালোচনা রয়েছে। যশোবন্ত সিং বলতে চেয়েছেন, দেশভাগের জন্য বা পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য জিন্নাহকে যতই দোষ দেওয়া হোক, তিনি এভাবে দেশ বিভক্ত করতে চাননি। কংগ্রেসি নেতারা নিজেদের বাইরে অন্য কারও সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে চাননি বলেই শেষ পর্যন্ত জিন্নাহকে দেশভাগের পথে ঠেলে দেওয়া হয়। জিন্নাহ চেয়েছিলেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই মুসলিমদের জন্য আলাদা দেশ—মুসলিম-প্রধান অঞ্চলগুলোয় মুসলিম লীগের অধীনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনসহ সরকার গঠনের অধিকার। ভারতীয় মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার একমাত্র প্রতিনিধি মুসলিম লীগ—তিনি তাঁর এই দাবির স্বীকৃতিও চেয়েছিলেন। মুসলিম লীগের বাইরের কোনো মুসলমানকে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মুখপাত্র হিসেবে মানতে রাজি ছিলেন না। যশোবন্তের অনেক কথাই সঠিক। কিন্তু জিন্নাহর শেষের দাবি দুটির পক্ষে কোনো যুক্তি নেই। তিনি গায়ের জোরে সব মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব দাবি করতে পারেন না। বিশেষ করে তিনি ছিলেন কিছু ধনী মুসলমানের প্রতিনিধি। সকল ধনী মুসলমানও তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। জিন্নাহ এ ব্যাপারে যথেষ্ট গোঁড়ামির পরিচয় দেন। যুক্তির বাইরে গিয়ে নিজের স্বেচ্ছাচারকে প্রাধান্য দিতে থাকেন। কিন্তু তারপরও দেশভাগের সেটা আসল কারণ নয়।

রফিক দেখাচ্ছেন, যখন দেশভাগ হচ্ছে, তখন নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি হলেও প্যাটেলের ক্ষমতা তাঁর চেয়ে বেশি। এমনকি প্যাটেল তখন গান্ধীর চেয়ে বেশি ক্ষমতা ধারণ করছেন। তিনি লিখছেন, 'সেই ক্রান্তিকালে কংগ্রেস রাজনীতিতে সরদারজিই দুই নম্বর নেতা, কিন্তু শেষ চালে তিনি গান্ধীকেও ছাড়িয়ে গেছেন। ধীরস্থির স্বল্পবাক প্যাটেল।'[৫৪] প্যাটেল যে কংগ্রেসের অলিখিত প্রধান নেতা তখন, এই বক্তব্যটি ভীষণ রকম সত্য। বলতে গেলে গান্ধীর হত্যার পেছনেও রয়েছে তাঁর হাত। গান্ধীকে যখন হত্যা করা হয়, প্যাটেল তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। গান্ধী সম্বন্ধে আরেকটি সত্য উচ্চারণ করেছেন লেখক। তিনি বলছেন, গান্ধীর ভাবমূর্তি শুধু ভারতের একটি সম্প্রদায়কে মাতিয়েছিল—তিনি মুসলমান সমাজকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করতে পারেননি। যিনি নিজেকে 'সনাতনপন্থী' বলে জানান দেন এবং 'গোরক্ষাকে তার ধর্ম' বলে ঘোষণা দেন, তার পক্ষে কী করে মুসলমান হৃদয় জয় করা সম্ভব? রফিক আরও বলেন, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির সুতোটা হাতে তুলে নিয়েও তা ধরে রাখতে পারেননি গান্ধী তাঁর হিন্দুত্ববাদী প্রবণতা ও মহাসভাপন্থী সতীর্থদের প্রভাবে।[৫৪]

বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠি, বরুণ দে প্রমুখ তাঁদের *ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম* পুস্তকের প্রাসঙ্গিক অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন, এই সময়ে গান্ধীর অসহায়তার কারণ জিন্নাহর উগ্র দাবি কিংবা জিন্নাহ-অনুসারীদের ক্ষমতালিপ্সার মধ্যে পাওয়া যাবে

না। যার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে, সেটি হলো তাঁর নিজের লোকদের সাম্প্রদায়িক চরিত্রের মধ্যে। ১৯৪৭ সালের ৪ জুন গান্ধী তাঁর প্রার্থনাসভায় নিজের লোকদের বলেছিলেন, 'দেশভাগের দাবি গৃহীত হয়েছে যেহেতু তোমরা সেটি চেয়েছিলে। কংগ্রেস কখনো চায়নি এ রকম হোক। কিন্তু কংগ্রেস জনতার দাবি বুঝতে পারছে। কংগ্রেস অনুভব করছে হিন্দু ও খালসা শিখরা এটা চাইছে।'[৫৪] প্রার্থনাসভায় গান্ধীর এই ভাষণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো হিন্দু ও শিখরা এই দেশভাগ চেয়েছিলেন। পাঞ্জাব ভাগে যেমন শিখদের ভূমিকা ছিল, বাংলা ভাগে ঠিক একইভাবে হিন্দুদের ভূমিকা ছিল। হ্যাঁ, তাদের পক্ষে যুক্তি এই যে পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাব এবং বাংলায় শিখ ও হিন্দুরা মুসলমানদের শাসনে থাকতে চাননি। নিশ্চয় তাহলে একই প্রশ্ন ঠিক এভাবেও করা যেতে পারে, উত্তর প্রদেশে ও দক্ষিণ ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানরা কি হিন্দুদের শাসনে থাকবেন না? মূলকথাটি হলো, বাংলা বা পাঞ্জাব ভাগের দায় জিন্নাহ বা মুসলিম লীগের নয়।

মাউন্টব্যাটেন ভারতের ভাইসরয় হয়ে আসার পর গান্ধী ৩১ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত দিল্লির বড়লাটের সঙ্গে আলোচনা করলেন। ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য তিনি এক দুঃসাহসিক প্রস্তাব দিলেন ভাইসরয়কে। বললেন যে বড়লাট যেন তদানীন্তন অন্তর্বর্তী সরকারকে ভঙ্গ করে দিয়ে জিন্নাহকেই নিজ মনোমত সদস্যদের নিয়ে নূতন সরকার গঠন করতে আমন্ত্রণ জানান। জিন্নাহকে শুধু কথা দিতে হবে যে তাঁর মন্ত্রিসভা ভারতীয় জনগণের সামগ্রিক স্বার্থরক্ষার জন্য কাজ করবে। গান্ধী প্রতিশ্রুতি দেন যে যত দিন সেই সরকার ভারতবাসীর মঙ্গলজনক পন্থা অনুসরণ করবে, তত দিন কংগ্রেস যাতে জিন্নাহর সরকারকে আন্তরিক সমর্থন দেয়, তার ব্যবস্থা তিনি করবেন। কিন্তু কোন পন্থা দেশবাসীর জন্য হিতকর হতে পারে বা স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে, তার বিচারের ভার থাকবে স্বয়ং মাউন্টব্যাটেনের হাতে।[৫৫] ৫ এপ্রিল থেকে জিন্নাহর সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের যে আলোচনা হয়, সে সময়ে তিনি জিন্নাহর কাছে গান্ধীর প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করেননি। সম্ভাব্য কারণ, নেহরু গান্ধীর প্রস্তাব জানার পর এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত না থাকার ফলে গান্ধী এই রকম অবাস্তব সমাধানের প্রস্তাব দিয়েছেন। গান্ধী অবশ্য ১১ এপ্রিল বড়লাটকে পত্র দিয়ে জানান যে কংগ্রেস তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।[৫৬] গান্ধীর প্রস্তাবের পক্ষ সমর্থনকারী আজাদ পরবর্তীকালে জানান, দুর্ভাগ্যজনক যে প্যাটেল-নেহরু গান্ধীকে এ প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেন।

জিন্নাহর সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের টানা এক সপ্তাহ আলোচনার পর বড়লাটের ধারণা হয়, 'জিন্নাহ মানসিক রোগগ্রস্ত'। মাউন্টব্যাটেন তাঁর সচিবের কাছে মন্তব্য

করেন, প্রথম দিনের আলোচনায় মাউন্টব্যাটেন একটানা যুক্ত ভারতবর্ষের পক্ষে যুক্তির জাল বিস্তার করেন। জিন্নাহ কোনো বিরুদ্ধ যুক্তি দেখাননি। তিনি এমন ধারণা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন যে কোনো কথা যেন তিনি শুনতেই পাচ্ছিলেন না। তিনি তাঁর মনস্থির করেই রেখেছিলেন। জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের আগে মাউন্টব্যাটেন কখনো চিন্তা করতে পারেননি যে 'এ-জাতীয় সম্পূর্ণ দায়িত্ববোধের অভাববিশিষ্ট কোনো ব্যক্তির পক্ষে তাঁর মতো অত ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া' সম্ভব। মাউন্টব্যাটেনের পক্ষেই জিন্নাহকে বাতিকগ্রস্ত মনে হওয়া সম্ভব। কারণ, নিজের চোখ দিয়ে তিনি নিজেকে দেখতে পাননি। মাউন্টব্যাটেন ভুলে গেছেন, জিন্নাহকে তাঁর মত গিলাতে পারলে তিনি মহানায়ক হয়ে ফিরে যেতে পারতেন। জিন্নাহ কি ভারতকে মাউন্টব্যাটেনের চেয়ে কম বুঝতেন? বিরাট জনগোষ্ঠী নির্বোধ বলেই কি জিন্নাহকে নেতা বলে মেনে নিয়েছিলেন। জিন্নাহ মুসলিম লীগের দায়িত্ব গ্রহণের আগের ২৫ বছরে মুসলিম লীগের সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ১ হাজার ৩০০। জিন্নাহ দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় দুই বছরে সদস্যসংখ্যা দাঁড়াল এক লাখে। জিন্নাহর রাজনীতি বোঝার সাধ্য মাউন্টব্যাটেনের থাকার কথা নয়। তিনি সরকারের কাছ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক উন্নাসিক আমলা, জিন্নাহ সেখানে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত।

জিন্নাহর নীরব থাকাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, নিজ লক্ষ্যে তিনি অবিচল—হতে পারে সেটা ভুল কিংবা ঠিক। বহু বছরে যার সমাধান হয়নি, মাউন্টব্যাটেন তা সমাধান করে দেবেন, জিন্নাহ তা বিশ্বাস করবেন কী করে। সবচেয়ে বড় কথা মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের পরেই ছিলেন জওহরলাল নেহরুর দূত। মাউন্টব্যাটেন ভারতে পা দেওয়ার আগেই লন্ডনে নেহরুর বিশ্বাসভাজন কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে কিছু আলাপ সেরেই এসেছিলেন। মাউন্টব্যাটেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে পরিচিত হন। লন্ডনে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে কৃষ্ণ মেননের সাক্ষাৎ ঘটে মার্চের ১৩ তারিখে। সেদিনের সাক্ষাতে মাউন্টব্যাটেনকে মেনন জানিয়েছিলেন, 'পরিস্থিতির সমাধান হলো উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দুটি "পাকিস্তান" প্রতিষ্ঠা।' কলকাতার বদলে পূর্ব পাকিস্তানের যে বন্দরের প্রয়োজন হবে, তার জন্য যতই ব্যয় হোক, চট্টগ্রামকে উন্নত করে পাকিস্তানের হাতে দেওয়া উচিত—এই অভিপ্রায় কৃষ্ণ মেনন ব্যক্ত করেছিলেন। কৃষ্ণ মেনন এরপরও বহুবার জওহরলালের প্রতিনিধি হিসেবে বড়লাট ও অন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেন।[৫৭]

বাংলাভাগের পরিকল্পনা দেখা যাচ্ছে জিন্নাহর সঙ্গে আলোচনার বহু আগেই হয়ে ছিল। জিন্নাহর সঙ্গে ভারতে মাউন্টব্যাটেনের যে আলোচনা হয়, সেই আলোচনার শেষে মাউন্টব্যাটেন স্পষ্ট করেই জিন্নাহকে জানান যে জিন্নাহকে হয় ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব স্বীকার করতে হবে আর না হলে খণ্ডিত পাঞ্জাব ও বিভক্ত বঙ্গসহ

পাকিস্তান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। জিন্নাহ বললেন, পাঞ্জাব ও বঙ্গবিভাজনের দাবি কংগ্রেসের বড় 'ধাপ্পা'। তিনি ভাইসরয়কে মিনতি করেন যাতে প্রদেশ দুটিকে বিভক্ত করা না হয়। তিনি বলেছিলেন, 'ইয়োর এক্সিলেনসি বোধ হয় জানেন না যে একজন মানুষ আগে একজন পাঞ্জাবি বা বাঙালি, পরে সে হিন্দু বা মুসলমান। ধর্ম যা-ই হোক, তার পরিচয়, সে বাঙালি বা পাঞ্জাবি। তার ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, তার অর্থনীতি সবই এক। সে ক্ষেত্রে পাঞ্জাব বা বাংলা ভাগ করা মানে পাঞ্জাবি বা বাঙালিদের ভাগ করা। এর ফলে নতুন করে রক্তপাত হবে, দাঙ্গা হবে।'[৫৮] জিন্নাহ এ কথাও বলেছিলেন, বাংলা যদি পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে স্বাধীন অবিভক্ত থাকে, তিনি খুশি হবেন।[৫৯] সোহরাওয়ার্দীও জিন্নাহর সঙ্গে একমত ছিলেন। কিন্তু বাধা এল হিন্দু-মুসলমান দুই পক্ষ থেকেই। লীগের ভেতর থেকে আকরম খাঁ প্রভৃতিরা বাংলাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানাতে থাকেন। জিন্নাহ তখন উপায় না দেখে দাবি করলেন, পাঞ্জাবকে বিভক্ত না করে পাকিস্তানে দেওয়া হোক। পুরো পাঞ্জাব পেলে তিনি বঙ্গের ওপর দাবি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে তাঁকে খলনায়ক বানানো হলো।

স্বাধীন বঙ্গের প্রস্তাবটি কংগ্রেস নেতারা মনে করলেন তফসিলি সম্প্রদায় ও হিন্দুদের দ্বিধাবিভক্ত করার চাল। শরৎ বসুও স্বাধীন ও অবিভক্ত বাংলার পক্ষে ছিলেন। গান্ধী শরৎ বসুকে লেখেন, 'এটা আমার মনে হয় অর্জন করা তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না...তোমার উচিত হবে বাংলার অখণ্ডতার জন্য সংগ্রাম পরিত্যাগ করা এবং বঙ্গভঙ্গের জন্য যে পরিবেশ রচিত হয়েছে তাতে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি না করা।'[৬০] পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের দায় সত্যিকার অর্থে কাকে নিতে হবে? রফিক আহমেদ তাঁর গ্রন্থে বহু সত্য কথা বললেও, খুব নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করলেও, বাংলা আর পাঞ্জাব ভাগের প্রশ্নে বহু সত্য বলে যেতে পারেননি। গ্রন্থের রচয়িতা রফিক বলছেন, 'ঘটনা স্পষ্টই বলে দেয় মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্ব, তথা ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারত ভাগ করেছিলেন।' কথাটি কি সত্যি? তিনি নিজেই তো বলছেন, 'প্যাটেলদের মতো রক্ষণশীল সনাতনপন্থীরাও একই হাতির পিঠের সওয়ার।' লেখকের পরের কথাটি কি প্রথম বক্তব্যকে নস্যাৎ করে দেয় না?

মাউন্টব্যাটেনকে লেখক ভারত ভাগের দায় থেকে রক্ষা করতে চাইছেন। কংগ্রেসকে ভারত ভাগের জন্য মৃদু তিরস্কার করে দেশবিভাগের সব দায় চাপাতে চাইছেন জিন্নাহর ওপর। কিন্তু জিন্নাহ কে, কতটুকু শক্তি তাঁর মাউন্টব্যাটেনের বিরুদ্ধে। মাউন্টব্যাটেনই তো বাংলা আর পাঞ্জাব ভাগের হোতা। মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলা ভাগের জন্য বর্ণহিন্দুরা নানা রকম পথ বেছে নিয়েছেন। ১৯৪৭ সালে বাংলা ভাগের প্রধান দায় যে হিন্দু ভদ্রলোকদের, এ নিয়ে বিতর্ক

নেই। জয়া চট্টোপাধ্যায় সেখানে নতুন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে স্পষ্টই দেখাচ্ছেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার জন্য আগে থেকেই যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল ভদ্রলোকদের। জয়া মনগড়াভাবে কিছু বলছেন না, বহু ভয়াবহ সব তথ্য দিচ্ছেন, যা বহুকাল জানা ছিল না। মাউন্টব্যাটেন যখন জিন্নাহর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বাংলা-পাঞ্জাব ভাগ করতে পেরেছেন, তিনি ভারত বিভাগও ঠেকাতে পারতেন। মাউন্টব্যাটেন ভারতের সবগুলো প্রদেশকে স্বাধীন রাজ্য হিসেবে ঘোষণা দিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলে কে আপত্তি করত। ব্রিটিশরা চায়নি বলেই সেটা ঘটেনি—ভারত ভাগ হয়েছে। দেশ বিভাগের প্রধান দায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের। খলনায়ক তারাই। পাকিস্তান সৃষ্টিতে এবং দেশ ভাগের জন্য জিন্নাহর আচরণকে সমালোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু জিন্নাহকে খলনায়ক বানানো যুক্তিসংগত নয়। মাউন্টব্যাটেন জিন্নাহকে নয়, কংগ্রেসকে খুশি করতে বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করেছিলেন। ব্রিটিশরা যদি ভারতবাসীর ওপর রোয়েদাদ চাপিয়ে দিতে পারে, ভারত ছাড় আন্দোলনে কংগ্রেসের সব নেতাকে জেলে পুরতে পারে, সেসব যদি নির্বিঘ্নে করতে পারে, ভারতকে স্বাধীনতা দিতে গিয়ে এত নাটক করতে হলো কেন?

রফিক বিচ্ছিন্নভাবে হঠাৎ এক জায়গায় মন্তব্য করেন, বাংলার ক্ষেত্রে নেহরুর ভূমিকা বিস্ময়করভাবে বাংলাবিরোধী। গ্রন্থাকার মিথ্যা বলেননি। ভারতের রাজনীতিতে বাংলার যে অগ্রণী ভূমিকা ছিল বাংলা যেভাবে একদা ভারতের রাজনীতিতে নেতৃত্বের স্থান দখল করেছিল, সেখান থেকে ভারতের অবস্থান নড়বড়ে করতে চায় দিল্লি এবং উত্তর ভারত-মহারাষ্ট্র। বাংলার বিরুদ্ধে বহু আগেই বিদ্বেষ প্রকাশ করেছিলেন সৈয়দ আহমদ। তিনি যেমন বলেছিলেন, 'মুসলিম ও হিন্দু, উভয়কে একত্রে নিয়ে, তাদের প্রশ্ন করি, তারা কি বাঙালিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে, না পারবে না? অতি অবশ্যই না।...ফলাফল কী হবে যদি সমস্ত নিয়োগ করা হতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে। সমস্ত জাতির ওপর, কেবল মুসলিমদের ওপর নয়, বরং উচ্চ মর্যাদাশালী রাজাদের এবং যে বীরত্বব্যঞ্জক রাজপুতরা, যাঁরা পূর্বপুরুষের তরবারির কথা ভোলেননি, তাঁদেরও শাসনকর্তা হিসেবে রাখা হবে এক বাঙালিকে...সুতরাং, যদি আপনারা কেউ—সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষেরা, ধনী ব্যক্তিরা, মধ্যশ্রেণির মানুষেরা, অভিজাত পরিবারের মানুষ যাঁদের ঈশ্বর দিয়েছেন মর্যাদাবোধের অনুভূতি—আপনারা যদি স্বীকার করে নেন যে দেশ গোছাতে থাকবে বাঙালি শাসনের জোয়াল পরে, এবং দেশের জনগণ বাঙালিদের জুতো চাটবে...।'[৬১] ব্যাপারটা বোঝাই যায় বাংলা সম্পর্কে বাইরের প্রদেশগুলো একটি দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে নিয়েছিল এবং সেটা স্বাভাবিক ছিল। বাংলার অগ্রগতিকে থামিয়ে দিতে চাওয়া হয়েছিল নিজ নিজ প্রদেশের স্বার্থে।

রফিক তাঁর গ্রন্থে বারবার সাম্প্রদায়িক মানসিকতার কথা বলছেন। গ্রন্থটি পাঠ

করে মনে হয়, তিনি মনে করেন সাম্প্রদায়িক বিভেদ শুধু ধর্মকেই ঘিরে হতে পারে। ব্যাপারটা তা নয়, ভাষা বা আরও নানা প্রশ্নে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হতে পারে। বাঙালি-বিহারিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল ধর্মকে ঘিরে নয়। কারণ, উভয় পক্ষই ছিল মুসলমান। সামাজিক-প্রশাসনিক স্বার্থ নিয়ে দাঙ্গা বা সাম্প্রদায়িক মানসিকতা চাড়া দিতে পারে, বাংলা সম্পর্কে সৈয়দ আহমদের বক্তব্যে সেই দিকটাই টের পাওয়া যায়। সেখানে ধর্ম নয়, চাকরি-বাকরি সুযোগ-সুবিধার প্রশ্নে তিনি বাঙালিদের বিরোধী হয়ে ওঠেন। বাঙালিদের অধীন না থাকার জন্য তিনি বাংলার বাইরের হিন্দু-মুসলমান-রাজপুত সবাইকে সঙ্গী হিসেবে পেতে চান। কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল? বিভিন্ন প্রদেশের কিছু নেতা বাংলা সম্পর্কে কিছুটা বিদ্বেষ প্রকাশ করতে আরম্ভ করল। স্বভাবতই বিভিন্ন প্রদেশের সাধারণ মানুষ তা করেনি, করেছিল অভিজাত এবং মধ্যশ্রেণি মিলিতভাবে। মুসলিম লীগের রাজনীতি ১৯৩৭ সাল থেকেই বাংলাকে গ্রাস করে এবং বাংলার সংখ্যাগুরু মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী হয়ে ওঠে। জিন্নাহর পাকিস্তান দাবি বাংলা থেকেই সবচেয়ে জোর কণ্ঠে উচ্চারিত হতে থাকে। ঘটনাপরম্পরায় বাংলাভাগের দিকে ভারতের ইতিহাস ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে। কথাগুলো রফিকের। কিন্তু ইতিহাসের আশ্চর্য বৈপরীত্য হলো, মাত্র ৪২ বছর আগে ১৯০৫ সালে যে বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য দাবি উঠেছিল, কংগ্রেস এবং বাংলার হিন্দু নেতৃত্ব সেই বাংলাভাগে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান চাইলেও ১৯৪৭ সালে বাংলাভাগ চায়নি।

১৯৪৬ সালের দাঙ্গা সম্পর্কে মুসলিম লীগকে দোষারোপ করা হলেও বাংলাভাগে হিন্দু ভদ্রলোকদের কতিপয়ের দায়দায়িত্ব যে অনেক বেশি, সেটা বহুদিন ধরে স্বীকৃত। কারণ, এ বিষয়ে বহু দলিলপত্র রয়েছে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, বাংলার সাধারণ হিন্দুরা নয়, বর্ণহিন্দুরা বা সুবিধাভোগীরা ছিলেন এর জন্য দায়ী। বিশেষ করে হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং কংগ্রেসের ভদ্রলোক হিন্দু নেতারা মুসলিম লীগের শাসনে অবিভক্ত বাংলায় থাকতে চাননি। বাংলা কংগ্রেসের শরৎ বসুর ভূমিকা ছিল ভিন্ন, তিনি শেষ পর্যন্ত বাংলাকে ভাগ করা থেকে বিরত ছিলেন। বাংলাভাগ সম্পর্কে হিন্দু ভদ্রলোকদের ভূমিকা নিয়ে মাত্র এক যুগ আগে চমৎকার সব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছেন জয়া চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, 'হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গার ফলে ১৯৪৭ সালে বাংলা আবার ভাগ হয়। কিন্তু এ সময় প্রায় কারও কণ্ঠেই প্রতিবাদের ধ্বনি উচ্চারিত হল না, বরং, দ্বিতীয় বার বাংলা ভাগ নিশ্চিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে একটা সংঘবদ্ধ আন্দোলন পরিচালিত হল—যার লক্ষ্য ছিল ধর্মের ভিত্তিতে প্রদেশকে ভাগ করা।'[৬২] তিনি তাঁর বিশ্লেষণে এমন সব তথ্য-উপাত্ত দিয়েছেন, যা ভয়াবহ। ফলে বাংলাভাগ বা

দেশভাগ নিয়ে নতুন করে বহু পুরোনো মত বা ধারণাগুলো পাল্টে ফেলতে হয়।

গ্রন্থকার আহমদ রফিক জয়া চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণার এক যুগ পর লিখছেন তাঁর *দেশবিভাগ : ফিরে দেখা*। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, তিনি কি নতুন করে কিছু জানাতে চাইছেন পাঠকদের? গ্রন্থটির রচয়িতা রফিক তাঁর রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'প্রারম্ভকথা'য় জানাচ্ছেন, 'দেশভাগ ও ক্ষমতার হস্তান্তরবিষয়ক রচনার পক্ষে সুযোগ বৃদ্ধি করেছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধিকতর তথ্যাদির প্রকাশ, নয়া দলিলপত্র, তৎকালীন শাসনকর্তাদের গোপন চিঠিপত্র, দিনলিপি, তারবার্তা, স্মৃতিকথা ইত্যাদি। সেই সঙ্গে নব্য সমাজচিন্তার আলোয় বিষয়টি নিয়ে নানামাত্রিক পুনর্বিবেচনাও নতুন করে লেখার কারণ বা প্রেরণা দুই-ই।'[৬৩] তিনি নতুন কী বলতে পেরেছেন, তা সাধারণ পাঠকদের কাছে খুব গ্রাহ্য না হলেও একজন গবেষক বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তুলতেই পারেন। কারণ, দেশভাগ নিয়ে শেষ কথা বলার সময় এখনো আসেনি। কিন্তু দেশভাগ নিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেতে গবেষকমাত্রই আগ্রহী। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা সম্পর্কে রফিক তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করলেও কেন যেন তিনি জয়ার দেওয়া তথ্যগুলো ব্যবহার করেননি। তিনি শুধু বহু পুরোনো বিশ্বাসের মতো দাঙ্গার সব দায় সোহরাওয়ার্দী আর নাজিমউদ্দীনের ঘাড়ে চাপাতে চেয়েছেন। জয়ার দেওয়া তথ্য জানার আগে পর্যন্ত বহু মানুষের সে ধারণাই ছিল। কিন্তু বাংলাভাগে জয়ার দেওয়া নানা তথ্য মানুষকে নতুন করে ভাবনাচিন্তার সুযোগ করে দিয়েছে।

জয়া চট্টোপাধ্যায় দেখাচ্ছেন যে ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার জন্য সোহরাওয়ার্দীকে দায়ী করা হয়। কিন্তু হিন্দু নেতারাও যে এই ঘটনায় গভীরভাবে জড়িত ছিল, এ সত্যটা তেমন সুবিদিত নয়। সেবারের দাঙ্গায় হিন্দুর চেয়ে অনেক বেশি মুসলমান নিহত হন। প্যাটেল ছিলেন নিরুদ্বিগ্ন এবং তিনি বিষয়টিকে এভাবে মূল্যায়ন করেছেন, 'হিন্দুরা এতে তুলনামূলকভাবে বেশি লাভবান হয়েছেন'। জয়া বলছেন, শক্তির এই বীভৎস প্রতিযোগিতায় ১৯৪৬ সালে হিন্দুদের প্রস্তুতি কম ছিল না। কারণ মনে রাখা দরকার, চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে কলকাতা ও মফস্বল শহরগুলোয় হিন্দু স্বেচ্ছাসেবক গ্রুপের সংগঠন প্রতিষ্ঠার আধিক্য দেখা যায়। এই সব প্রতিষ্ঠান ভদ্রলোক যুবকদের দৈহিক যোগ্যতা অর্জন করতে এবং আধা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে উৎসাহ দিত। সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে সুসংগঠিত সংগঠন ছিল ভারত সেবাশ্রম সংঘ—এটা ছিল হিন্দু মহাসভার স্বেচ্ছাসেবক শাখা।[৬৪] বাংলায় যখন দাঙ্গা সত্যি সত্যি আসন্ন হয়ে দাঁড়াল, তখন মহাসভার স্বেচ্ছাসেবীরা প্রস্তুত ছিলেন বাঁশের লাঠি, ছোরা ও দেশীয় পিস্তল নিয়ে নেতাদের পরামর্শমতো কাজ করতে। মুসলমানদের মতো হিন্দুরাও ১৬ আগস্ট যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, উভয় পক্ষই ছিল অস্ত্রসজ্জিত, তবে দলেবলে হিন্দুদেরই ভারী দেখা যায়। মুসলমান দাঙ্গাকারীদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিলেন পল্লি এলাকা থেকে শহরে আসা ভাসমান শ্রেণির লোক। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে দাঙ্গায় জড়িত থাকায় বহু ভদ্রলোক হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

নজরুল ইসলাম বলেন, বলা হয় মুসলমানরা বাংলা ভাগ করেছেন। বাংলাকে মুসলমানরা ভাগ করেননি, শূদ্ররাও ভাগ করেননি। নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য বাংলা ভাগ করেছেন ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ নেতারা। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্যাটেল ও নেহরুকে চিঠিতে লেখেন যে, পাকিস্তান হোক আর নাই হোক, বাংলার সীমানার মধ্য থেকে দুটো রাজ্য তৈরি করতেই হবে। কংগ্রেসের নেতা বি সি সিনহা লিখলেন, পুরো বাংলা ভারতে থেকে গেলেও মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় বাংলায় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। হিন্দুদের নেতৃত্ব স্থাপিত হবে না। কাজেই জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাকে ভাগ করতেই হবে। বাংলাকে ভাগ করার জন্য কংগ্রেসের হিন্দু নেতারা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে একত্রে আন্দোলন করেছিলেন।[৬৫]

দাঙ্গায় জড়িত হিন্দু জনতার গঠন সম্পর্কে আলোচনাকালে সুরঞ্জন দাশ লক্ষ করেন যে বাঙালি হিন্দু ছাত্র ও অন্যান্য পেশাজীবী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোক সক্রিয় ছিলেন। ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, প্রভাবশালী সওদাগর, শিল্পী, দোকানদার দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। মধ্য কলকাতায় একটি সভা ভেঙে দেওয়ার জন্য সাধারণের সঙ্গে ভদ্রলোকেরাও অংশগ্রহণ করেন। চক্ষুচিকিৎসক মোহাম্মদ জামাল হত্যাকারী জনতার মধ্যে ছিলেন শিক্ষিত যুবকেরাও, যাঁরা পুলিশ কর্মকর্তাদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলেন।[৬৬] বিস্ময়ের ব্যাপার যে হত্যাযজ্ঞের পর অব্যাহতভাবে অসন্তোষের মধ্যে মুসলমান জনতার মাঝে বোমা নিক্ষেপের জন্য হিন্দুদের মধ্য থেকে গ্রেপ্তারকৃত একজন ছিলেন বর্ধমানের বিশিষ্ট চিকিৎসক মহেন্দ্রনাথ সরকার। তিনি স্বীকার করেন, 'এখন আমি একজন কংগ্রেস নেতা। আগে ছিলাম হিন্দু মহাসভার সদস্য। বাংলা বিভাগের পক্ষে আমি এ আন্দোলনে যোগ দিয়েছি।' জয়া ঘটনা বিশ্লেষণ করে বলেন, এটাই বাংলা বিভাগ এবং একটা পৃথক হিন্দু আবাসভূমি গঠনের জন্য হিন্দু আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি করেছিল। জয়া আরও জানাচ্ছেন, কিন্তু হিন্দুদের এই জঘন্য কাজকে কখনো স্বীকার করা হয়নি। হিন্দু সংবাদপত্র এই আক্রমণের জন্য দোষারোপ করে সোহরাওয়ার্দী সরকার ও মুসলিম লীগকে; আর এই হত্যাযজ্ঞকে গণ্য করা হয় ভবিষ্যতে মুসলমান শাসনের অধীনে বাঙালি হিন্দুদের ভাগ্যের ভয়াবহ অশুভ লক্ষণ হিসেবে।[৬৭]

জয়া চট্টোপাধ্যায় আবিষ্কার করেছেন, হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখাগুলোর সহায়তায় বাংলার অধিক সংখ্যক হিন্দু ১৯৪৭ সালে বাংলাভাগ ও ভারতের অভ্যন্তরে একটা পৃথক হিন্দু প্রদেশ গঠনের জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার চালান। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার শাসন গ্রহণে একশ্রেণির হিন্দুদের অস্বীকৃতি

ছিল।[৬৮] হিন্দুরা ভারত ভাগ করে হলেও মুসলমান শাসনের অধীন থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চেয়েছিলেন এবং এই দাবিকে ন্যায্য মনে করতেন। কিন্তু এই বর্ণহিন্দুরা ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ মেনে নিতে চাননি আর হিন্দুদের কর্তৃত্ব পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করেননি। তখন বঙ্গভঙ্গ তাঁরা চাননি, কারণ বাংলার শাসনক্ষমতায় তখন ইংরেজদের পর হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ১৯৪৬-৪৭ সালে বর্ণহিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করে। নিশ্চয় বর্ণহিন্দুদের যুক্তি ছিল। বাংলাকে পাকিস্তান বানাতে চাইলে, হিন্দু বাঙালিদের পাকিস্তানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া মানে চিরকালের জন্য রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব হারানো এবং তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের অধীন থাকা। ফলে বাংলার ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে। রফিক বাংলা ও পাঞ্জাবভাগ নিয়ে, বিশেষ করে দাঙ্গায় প্রাণনাশ, মানুষের অসম্মান ইত্যাদি ব্যাপারে কথা বলেছেন, কিন্তু যে সত্যটা বলতে পারেননি, তা হলো বাংলা ও পাঞ্জাবভাগের জন্য সামান্যতম দায়ী ছিলেন না জিন্নাহ। ভারতভাগের জন্য জিন্নাহকে কমবেশি দায়ী করা গেলেও বাংলাভাগের সম্পূর্ণ দায় ছিল মাউন্টব্যাটেন, নেহরু ও প্যাটেল এবং পশ্চিমবঙ্গের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়সহ বর্ণহিন্দুদের। পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে কথাটা প্রায় একইভাবে সত্য। জিন্নাহই তো একমাত্র জোরালোভাবে পাঞ্জাব আর বাংলাভাগের বিরোধিতা করেছিলেন। বলতে হবে, হয় এই সত্য গ্রন্থকারের জানা ছিল না, নতুবা এখানে তিনি নিরপেক্ষ হতে পারেননি। জিন্নাহর যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা ছিল প্রদেশ দুটিকে ভাগ না করার ব্যাপারে।

জয়ার মতো বাংলাভাগ তথা ভারত বিভাগ সম্পর্কে নতুন কথা শোনাচ্ছেন বহুজন। নতুনভাবে বিশ্লেষণ করছেন ভারতভাগের ঘটনাকে। বাংলাকে ভাগ করেছিলেন বর্ণহিন্দুদের একটি বড় অংশ, ঠিক তেমনিভাবে ভারতভাগ ও বাংলাভাগ নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা—জিন্নাহকে দায়মুক্ত করে সত্যি কথা বলা, নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখার কাজটিও করেছে বর্ণহিন্দুদের নতুন প্রজন্ম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন মহাভারতের খলনায়ক দুর্যোধনের পক্ষে কলম ধরেন 'গান্ধারীর শেষ আবেদন' রচনায়, মধুসূদন দত্ত যেমন রামায়ণের খলনায়ক রাবণকে মহৎ হিসেবে প্রমাণ করে রামকে পররাজ্য গ্রাসকারী বলে প্রতিষ্ঠা দেন, ভারতভাগের খলনায়ক জিন্নাহর সম্পর্কে না জানা বহু সত্য বলে গিয়েছেন বর্ণহিন্দু পরিবারে জন্ম নেওয়া ইতিহাসবিদেরা এবং আরও অনেকে। উল্লিখিত ইতিহাসবিদদের সেই উদারতা শ্রদ্ধা পাওয়ার ব্যাপার তো বটেই, একই সঙ্গে তুলনাহীন। শেক্সপিয়ারের *মার্চেন্ট অব ভেনিস* নাটকে শাইলককে বহুদিন পর্যন্ত খলনায়ক মনে করা হতো। সেভাবেই অভিনয় করতেন অভিনেতারা। কিন্তু লরেন্স যখন শাইলকের ভূমিকায় অভিনয় করলেন, শাইলকের জন্য দর্শকের চোখে জল এসে যেত। লরেন্স শেক্সপিয়ারের

নাটককে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করে দেখালেন, ইহুদি শাইলকের নিষ্ঠুরতার কারণ। দিনের পর দিন খ্রিষ্টানদের দ্বারা অপমানিত হতে হতে তাদের প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ হতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি।

জিন্নাহর রাজনীতির প্রথম দিকটি আর গান্ধীর রাজনীতির শেষ দিকটি সবার মনোযোগের অকর্ষণের বিষয় হতে পারে। রাজনীতির শুরুতে জিন্নাহর আর রাজনীতির শেষে গান্ধীর ছিল খুবই প্রগতিশীল ভূমিকা। গান্ধী প্রাণ দেন দেশভাগ হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রাপ্য সম্পদের ভাগ পাকিস্তানকে অর্পণ করার দাবি জানিয়ে—সে ভিন্ন ইতিহাস। বিশাল ব্যক্তিত্ব, ভীষণ জনপ্রিয় ভারতের জাতির পিতার শেষ পরিণাম বড়ই নির্মম। স্বাধীনতার পরপরই প্রাণ দেন গান্ধী, জিন্নাহ প্রাণ দেন স্বাধীনতার বছর ঘুরতে না ঘুরতেই। জিন্নাহ প্রাণ দেন আততায়ীর হাতে, গান্ধী প্রাণ দেন অসুস্থ অবস্থায় এবং খুবই অবহেলার মধ্যে। জিন্নাহর মৃতদেহ বিমানবন্দরে পড়ে ছিল বেওয়ারিশ লাশের মতো। বিশাল ব্যক্তিত্বের এই পরিণতি কে বিশ্বাস করবে! জিন্নাহ-গান্ধীর মধ্যে কে কতটা খারাপ আর ভালো, সে বিচারে না গিয়ে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য ভারতীয় ভদ্রলোকদের রাজনৈতিক ঘটনাবলির ভিন্ন একটি দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। জিন্নাহ জীবনের প্রথম দিকে যখন প্রগতিশীল রাজনীতি করেন, তিনি তখন সেভাবে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে দেখা দিতে পারেননি। তিনি জোরালোভাবে ভারতের স্বায়ত্তশাসনের কথা বলে এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসার ঘটাতে গিয়ে নানা ধরনের অবহেলার শিকার হয়েছেন, কখনো অপমানিত হয়েছেন। পুণ্যাত্মা গান্ধীর সামনে যুক্তি নিয়ে দাঁড়াতেই পারলেন না। কিন্তু যেইমাত্র তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বা বিভেদের রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়লেন, যুক্তির বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি হয়ে উঠলেন অবিসংবাদী নেতা। যখন তিনি সমগ্র ভারতের জন্য স্বরাজ দাবি করলেন, কংগ্রেসে তাঁর জায়গা হলো নিচের সারিতে। রাজনীতি থেকে একবার অবসর নিয়ে পুনরায় যেই মাত্র জিন্নাহ মুসলমানদের জন্য খণ্ডিতভাবে স্বার্থ সংরক্ষণের কথা বললেন, তিনি হয়ে উঠলেন 'কায়েদে আযম'। ব্রিটিশ শাসকেরা পর্যন্ত তাঁকে সমীহ করতে শুরু করলেন। গান্ধীর ক্ষেত্রে কী ঘটল? যখন তিনি ভূস্বামীদের স্বার্থে ভারতের শ্রমিকশ্রেণির রাজনীতির বিপক্ষে 'রামরাজত্ব' গড়তে চাইলেন, তিনি হলেন সর্বমান্য। ঠিক জীবনের শেষে এসে যখন তিনি অখণ্ড ভারতের জন্য জিন্নাহকে শাসনক্ষমতায় বসার মতো উদারতা দেখালেন, ভারতভাগের পর পাকিস্তানের জনগণের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিতে চাইলেন—কংগ্রেস তাঁকে ছুড়ে ফেলল। পৃথিবীর ইতিহাসের অন্যতম জনপ্রিয় এক রাজনৈতিক নেতা প্রাণ দিলেন দুর্ভাগ্যজনকভাবে। কংগ্রেসের তখন আর তাঁকে দরকার নেই।

ফিরে আসা যাক আবার আহমদ রফিকের গ্রন্থ প্রসঙ্গে। তিনি গ্রন্থে দেশভাগের

পর দাঙ্গা, হত্যা ও হাজার হাজার নারীর অপমান নিয়ে দুঃখবেদনার কথা বলেছেন, নিশ্চয় সব পাঠক তাঁর সঙ্গে একমত হবেন। হতেই হবে, দেশভাগের সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা সেটাই। মানুষের সেই হাহাকার, সেই সব আর্তি ভারতভাগের ইতিহাস থেকে কখনো মুছে ফেলা যাবে না। গ্রন্থের শেষে এসে লেখকও স্বীকার করছেন, বিষয়টা আসলে জাতিরাষ্ট্র গঠনের প্রশ্ন। বহুজাতি ও বহুভাষী-অধ্যুষিত বিরাট জনগোষ্ঠীকে নিয়ে একটি জাতিরাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়। তিনি দেশভাগের সবটাকে নেতিবাচক মনে করছেন না। কিছু অর্জন তিনি দেখতে পান, আর তা হলো স্বদেশি রাজনীতিকদের হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর। কিন্তু তিনি শেষ কথা বলছেন এভাবে, বিদেশি শাসকদের মর্জিমাফিক একটি দেশকে বিভক্ত করা হয়। জিন্নাহ ও গান্ধীর মনে যে এ কারণে দেশভাগের পর অনুতাপ হয়েছিল, তিনি সে কথাও উপসংহারে এসে পাঠকদের বলতে ভুলে যাননি। গ্রন্থকার সবার শেষে দেশভাগ সঠিক ছিল কি ছিল না, সেই বিচারের ভার ছেড়ে দেন পাঠকদের ওপর। গ্রন্থটির মাহাত্ম্য এখানেই। গ্রন্থকার আহমদ রফিক দেশভাগ নিয়ে পাঠকদের মধ্যে আবার যে চিন্তার সূত্রটি ধরিয়ে দেন, সে জন্য তাঁর রচনাটি বিশেষভাবে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

তথ্যসূত্র

১. আহমদ রফিক, *দেশবিভাগ : ফিরে দেখা*, ঢাকা : অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১৫, পৃ. ১১-১২
২. ওই, পৃ. ১৪-১৫
৩. ওই, পৃ. ১৫
৪. দ্রষ্টব্য, বিপান চন্দ্র, *আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতা*, কুনাল চট্টোপাধ্যায় অনূদিত, কলকাতা : কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৮৯, পৃ. ২৪৭-২৯৯
৫. আহমদ রফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭-১৮
৬. দ্রষ্টব্য, এ জি বেলস্কি, 'হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ : ঐতিহাসিক উৎস এবং তত্ত্বাদর্শগত ও রাজনৈতিক নীতি', *হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সমাজ*, সুনীল ঘোষ ও প্রদ্যোত গুহ অনূদিত, কলকাতা : ভস্তক ১৯৯১, পৃ. ৩৮-৩৯
৭. অবনী লাহিড়ী, *তিরিশ চল্লিশের বাংলা*, কলকাতা : সেরিবান ২০০৬, পৃ. ৯৩
৮. দ্রষ্টব্য, এ জি বেলস্কি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫০
৯. নজরুল ইসলাম, *মুসলমানদের করণীয়*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ ১৪১৯, পৃ. ৩০, ৪১
১০. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *জিন্না : পাকিস্তান নতুন ভাবনা*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি. ১৩৯৪, পৃ. ১৯
১১. ওই, পৃ. ১৯
১২. ওই, পৃ. ৫
১৩. আহমদ রফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১
১৪. সরল চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ, পৃ. ১৫৫
১৫. সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারত : পলাশী থেকে নেহরু*, কলকাতা : প্রগতিশীল প্রকাশক ২০১১, পৃ. ৫৬৭-৫৭০
১৬. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
১৭. সরল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮
১৮. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
১৯. সরল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭১
২০. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭
২১. সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, *আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস*, কলকাতা : প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স ২০১২, পৃ. ৬৯৪
২২. সরল চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫
২৩. ওই
২৪. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২
২৫. আহমদ রফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬
২৬. ওই, পৃ. ৩৬
২৭. ওই, পৃ. ৩৭
২৮. বিপান চন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯
২৯. আহমদ রফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯
৩০. ওই, পৃ. ৪২
৩১. এ জি বেলস্কি, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪
৩২. বলাই দত্ত, *নৌবিদ্রোহ*, পান্নালাল দাশগুপ্ত অনূদিত, কলকাতা ১৯৫৮, পৃ. ৫৩
৩৩. ওই, পৃ. ৪৪৫-৪৪৬
৩৪. আহমদ রফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬
৩৫. ওই, পৃ. ৩৭২
৩৬. জয়া চ্যাটার্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪
৩৭. ওই, পৃ. ২৯
৩৮. ওই
৩৯. শুচিব্রত সেন ও অমিয় ঘোষ, *আধুনিক ভারত*, কলকাতা : মিত্রম ২০০৮, পৃ. ২৭৪
৪০. জয়া চ্যাটার্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২-৪৩
৪১. আহমদ রফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭
৪২. শুচিব্রত সেন ও অমিয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৯
৪৩. ওই, পৃ. ৪১৭
৪৪. ওই, পৃ. ৪১৭-৪১৮
৪৫. দ্রষ্টব্য, সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯৫
৪৬. দ্রষ্টব্য, শুচিব্রত সেন ও অমিয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৬
৪৭. লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, *ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ*, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং ২০০৪, পৃ. ৯
৪৮. জয়া চ্যাটার্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯
৪৯. লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
৫০. নজরুল ইসলাম, *মুসলমানদের করণীয়*, কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ ১৪১৯, পৃ. ৩৮
৫১. জয়া চ্যাটার্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭

৫২. আহমদ রফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৫
৫৩. দ্রষ্টব্য, সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও সুরঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১১
৫৪. আহমদ রফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৫
৫৫. ওই, পৃ. ৩৬৯
৫৬. দ্রষ্টব্য. শুচিব্রত সেন ও অমিয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯৪
৫৭. লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
৫৮. শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১-২৬২
৫৯. ওই, পৃ. ২৬১
৬০. ল্যারি কলিন্স ও দোমিনিক লাপিয়ের, *ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট*, রবিশেখর সেনগুপ্ত অনূদিত, কলকাতা : এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১৩৯৭, পৃ. ১২৩
৬১. শুচিব্রত সেন ও অমিয় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৪
৬২. ওই, পৃ. ৪৪৫
৬৩. দ্রষ্টব্য, বিপান চন্দ্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪
৬৪. জয়া চ্যাটার্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১
৬৫. আহমদ রফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
৬৬. জয়া চ্যাটার্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭১-২৭২
৬৭. নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১-৬৩
৬৮. জয়া চ্যাটার্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৬-২৭৭
৬৯. ওই, ২৭৭
৭০. জয়া চ্যাটার্জী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬

আঞ্চলিক রাজনীতি

দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তসীমান্ত 'রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ'-এর ধারণা ও ধরন যাচাই

নেপালের 'মাধেস আন্দোলন' : পূর্বাপর

আলতাফ পারভেজ

সারসংক্ষেপ

নেপালকে ভৌগোলিকভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয় : পর্বতময় চীন-সন্নিহিত অঞ্চল, স্বল্প উঁচু পাহাড়ি মধ্যাঞ্চল এবং ভারত-সন্নিহিত সমতল অঞ্চল। শেষোক্ত এলাকাটিই তরাই নামে পরিচিত। নেপালি ভাষায় 'তরাই' শব্দের অর্থ নিচু সমতলভূমি। সংস্কৃতে এর অর্থ 'পাহাড়ের পাদদেশ'। পাহাড় আর পুরো সমতলের মাঝামাঝি হিসেবে এই এলাকাটি 'মধ্যদেশ' হিসেবে চিহ্নিত হতো অতীত থেকে। সেই 'মধ্যদেশ'-এর বাসিন্দারাই কালক্রমে 'মধ্যদেশি' তথা 'মাধেসি'। তরাইয়ের অ-পাহাড়িরাই মূলত মাধেসি 'আইডেনটিটি' ধারণ করে। এ প্রবন্ধে এই মাধেসিদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত, তরাইয়ের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য, ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, আন্দোলনের মূলধারা, মাওবাদীদের উত্থান-পতন, পাহাড়িদের ভূমিকা, প্রতিবেশী দেশগুলোর ভূমিকা ইত্যাদি আলোচনা করা হয়েছে। মাধেসিরা মূলত তিনটি ধারায় আন্দোলন করে। নেপাল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থাগুলোকে আক্রমণ করা; মাওবাদীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা এবং তরাইয়ের জনসমাজকে এমনভাবে বিভক্ত করে ফেলা, যাতে 'মাধেসি বনাম অন্যান্য' সমীকরণের আবহ তৈরি হয়। এ আন্দোলনের প্রধান দাবি এখন তিনটি : সকল মাধেসিকে নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট দিতে হবে, পুরো মাধেসকে এক শাসনতান্ত্রিক 'ইউনিট' হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং সেই ইউনিটকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। এর মধ্যে প্রথম দাবিটি অনেকাংশে পূরণ হয়েছে। বাকি দুটির ভবিষ্যৎ নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে তরাই এবং পুরো নেপালও।

শব্দগুচ্ছ

মাধেস আন্দোলন, থারু, তরাই, মাওবাদী, নেপাল ফেডারেশন অব নেশনালিটিজ, সিএ-টু।



প্রারম্ভিক কথা

বাংলাদেশের খুব দূরের দেশ নয় নেপাল। বৃহত্তর দিনাজপুর থেকে তো শীতের দিনে হিমালয়ের চূড়াও দেখা যায়। রাস্তার দূরত্ব পঞ্চাশ মাইলেরও কম। বাংলাদেশ-নেপাল সীমান্তের মাঝের ভারতীয় এলাকাটি স্বল্প দূরত্ব ও ভৌগোলিক ধরনের কারণে 'চিকেনস নেক' নামে পরিচিত। বাংলাদেশের বাংলাবান্ধা এবং নেপালের কাকরভিটার মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ইতিহাসও বহু পুরোনো। যদিও মধ্যবর্তী অন্যদের অসহযোগিতায় তা স্বচ্ছন্দ হতে পারেনি কখনোই। ভারত ও চীনের মাঝামাঝি থাকায় নেপাল বর্তমান বিশ্বে অন্যতম কৌশলগত ভূখণ্ড, তবে 'ল্যান্ডলক কান্ট্রি'। মানচিত্র দেখলে মনে হয় ভারত-চীনের মাঝে চ্যাপ্টা হয়ে শুয়ে আছে ভূখণ্ডটি। ভারত আছে তার তিন দিকে, উত্তরে চীন। সুউচ্চ হিমালয়ের কারণে চীন-নেপাল যোগাযোগ ঐতিহাসিকভাবে কম। ঠিক উল্টোটি ঘটেছে ভারতের সঙ্গে। ভারত-নেপাল সীমান্ত সমতল, সহজ, অনেকখানি উন্মুক্ত। নেপালের 'মাধেস' সংকটেরও শুরু অনেকখানি এই যোগাযোগপর্বেরই পার্শ্বফল। ধীরে ধীরে আমরা যে আলোচনার দিকে এগোব।

এই লেখায় আমরা মূলত দেখতে চাইব কীভাবে আঞ্চলিক অশান্তি এবং তাতে প্রতিবেশী ভারতের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সংশ্লিষ্টতা নেপালকে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক সংকটে ফেলে রেখেছে। নেপালের এই 'সংকট'-এর সঙ্গে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম, শ্রীলঙ্কার জাফনা, পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, ভারতের কাশ্মীর ইত্যাদি অঞ্চলের চলমান অস্থিরতার কিছু মিল লক্ষ করবেন। যদিও এসব প্রতিটি সংগ্রামেই ব্যাপক স্বাতন্ত্র্যও রয়েছে। একই সঙ্গে এই লেখার মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ায় আন্তসীমান্ত রাজনৈতিক 'প্রভাব'-এর ধারণা ও ধরনও যাচাই করে দেখা হবে।

নেপাল : পূর্ব ইতিহাস

নেপালের সুপরিচিত একটি এলাকা গোর্খা জেলা। বহু আগে (১৭৬৮ সালে) স্বাধীন গোর্খা রাজ্যের রাজা পৃথ্বি নারায়ণ শাহ আশপাশের ছোট-বড় বিভিন্ন রাজ্য জয় করে নেপাল নামের দেশটির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে দেশটি 'শাহ' বংশ দ্বারা শাসিত। এই শাহ রাজারা আবার একপর্যায়ে (১৮৮৬ থেকে) 'রানা' বংশজাত প্রধানমন্ত্রীদের কাছে পুতুল হয়ে ছিলেন দীর্ঘদিন। এভাবে দেশটি দুই শক্তিশালী বংশের রাজত্বে কাটিয়েছে ইতিহাসের দীর্ঘ সময়। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি দেশটিতে গণতন্ত্রের সংগ্রাম শুরু হয় নেপালি কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। যার ফলে ১৯৫৯ সালে প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচন হয় এবং বি পি কৈরালার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে কংগ্রেস। ১৯৬০-এ ডিসেম্বরে রাজা মহেন্দ্র আবারও সেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে দেন। তারপর আবারও সংগ্রাম শুরু হয় এবং যার চূড়ান্ত অধ্যায়ে নির্বাহী রাজতন্ত্র উৎখাত হয় দেশটি থেকে।

মাধেসের ভৌগোলিক ও জনতাত্ত্বিক ধরন

নেপালের জনসংখ্যা প্রায় ২.৭ কোটি। জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ হিন্দুধর্মাবলম্বী, ১০ শতাংশ বৌদ্ধ এবং ৪.৫ শতাংশ মুসলমান। প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নেপালি ভাষায় কথা বলে। রাজতন্ত্র উৎখাত হওয়ার পর দেশটিকে ফেডারেল রিপাবলিক বলা যায়। রাজতন্ত্রের মধ্যেই ১৯৩৫-এ 'প্রজা পরিষদ' এবং ১৯৪৭-এ নেপালি কংগ্রেস নামে দুটি রাজনৈতিক পার্টি-সত্তা গড়ে উঠেছিল দেশটিতে। তবে আজও, আট দশক পরও, রাজনৈতিকভাবে ক্রান্তিকাল চলছে দেশটিতে। রাজনৈতিক প্রশাসনের চূড়ান্ত চেহারা এখনো সেখানে বাস্তব রূপ পায়নি। পাশাপাশি আছে সাংস্কৃতিক টানাপোড়েনও। একসময়কার 'হিন্দুরাষ্ট্র' নেপালে রাজাকে বিষ্ণুর প্রতিনিধি মনে করা হতো। রাজতন্ত্রবিরোধী সংগ্রাম তাই দেশটির সংস্কৃতিতে সর্বগ্রাসী হিন্দুকরণের বিরুদ্ধে নৃগোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক সংগ্রামও ছিল বটে। একশর অধিক নৃগোষ্ঠী রয়েছে নেপালে। তবে 'মাধেসি'রা প্রচলিত অর্থে কোনো নৃগোষ্ঠী নয়। তাদের অবস্থান নেপালের তরাই অঞ্চলে।

পুরো নেপালকে সাধারণত ভৌগোলিকভাবে তিন ভাগে ভাগ করা হয়: পর্বতময় চীন-সন্নিহিত অঞ্চল, স্বল্প উঁচু পাহাড়ি মধ্যাঞ্চল এবং ভারত-সন্নিহিত সমতল অঞ্চল। শেষোক্ত এলাকাটিই তরাই নামে পরিচিত। নেপালি ভাষায় 'তরাই' শব্দের অর্থ নিচু সমতলভূমি। সংস্কৃতে এর অর্থ 'পাহাড়ের পাদদেশ'। পাহাড় আর পুরো সমতলের মাঝামাঝি হিসেবে এই এলাকাটি 'মধ্যদেশ' হিসেবে চিহ্নিত হতো অতীত থেকে। সেই 'মধ্যদেশ'-এর বাসিন্দারাই কালক্রমে 'মধ্যদেশি' তথা 'মাধেসি'।

মাধেস বলতে কার্যত কোনো গ্রাম বা শহরের অস্তিত্ব নেই বা ছিল না। তরাইয়ের অ-পাহাড়িরাই মূলত মাধেসি 'আইডেনটিটি' ধারণ করে। অর্থাৎ যাঁরাই তরাইয়ের অপাহাড়ি এবং ভারত থেকে ১-২-৩ প্রজন্ম আগে তরাইয়ে এসেছেন তাঁরাই মাধেসি, পরিচয়টি এভাবেই গড়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু। গত শতাব্দীতে তরাইয়ে মূলত থারু জনগোষ্ঠীর বাস থাকলেও ধীরে ধীরে এখানে জমির সন্ধানে আসে পাহাড়িরাও। থারুরা তরাইয়ের সবচেয়ে পুরোনো জনগোষ্ঠী। দেশের জনসংখ্যার প্রায় সাত ভাগ তারা। সংখ্যার হিসাবে ১৭-১৮ লাখ হবে। ভারতের বিহারেও আছে থারুরা। সংখ্যাগরিষ্ঠ (প্রায় ৮৭ ভাগ) থারু হিন্দুধর্মাবলম্বী। তা সত্ত্বেও স্বার্থের প্রশ্নে তরাইয়ের মাধেসিদের সঙ্গে প্রবল ভিন্নমত রয়েছে তাদের। পাহাড়ি হিন্দু ও মাধেসি হিন্দুদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য অনেক। ১৮৫৪ সালে নেপালের তৎকালীন হিন্দু রাজা থারুদের প্রথাগত ভূমি অধিকার থেকে উচ্ছেদ করে। তাদের তখন অন্যত্র পুনর্বাসিত হতে হয়। সেই থেকে থারুরা দাসোচিত জীবন যাপন করছিল।

থারু ছাড়াও তরাইয়ে আছে দলিত মুসহর ও চামার জনগোষ্ঠী এবং মাছ ধরা যাদের পেশা সেই মাল্লাহ সমাজ। মুসলমানও আছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়। নেপালের মুসলমান জনগোষ্ঠীর (প্রায় ১০ লাখ) প্রায় ৮০ ভাগ তরাইবাসী। কপিলাবস্তু, বাংকে ইত্যাদি জেলায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আছেন এই কৃষিজীবী ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা।

তরাইয়ের উপরিউক্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ নৃ ও ধর্ম পরিচয়ের মধ্যে প্রধানত যারা পাহাড়ি উৎসজাত নন, সেসব হিন্দুর মাঝেই মাধেসি চেতনা অধিক তীব্রতায় লক্ষ করা যায়। যারা বিশেষভাবে মৈথালি, ভোজপুরি, বাজিকা ইত্যাদি ভাষায় কথা বলে। তরাইয়ের রাজনীতিবিদদের অধিকাংশ মৈথালিভাষী। নেপালের ভাষাগত পরিসংখ্যানে মৈথালিদের হিস্যা প্রায় ১২ ভাগ। তরাইয়ের এই মৈথালিভাষীরা শিক্ষা-সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকার কারণে নিজেদের নেপালের সাধারণ পাহাড়ি সমাজের চেয়ে 'উন্নত' ভাবে। এটাও মাধেসি চেতনায় সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের একটা আবহ তৈরি করেছে। তবে মাধেসি সমাজে বর্ণপ্রথা ও অচ্ছুত সমস্যাও প্রবল। এটা মাধেসি জাতীয়তাবাদকে জটিল করে তোলে অনেক সময়। মুসলমানদের একাংশও তরাইয়ের মাধেসি আন্দোলনের সমর্থক।

নেপালের অর্থনীতিতে তরাইয়ের বৈশিষ্ট্যস্থল

চতুর্দিকে ভূমিবেষ্টিত বলে নেপাল অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর নয়। আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে দেশটি অনেকাংশে ভারতনির্ভর। আমদানি-রপ্তানির আকারও ছোট। দুই বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ রপ্তানি করে নেপাল আর আমদানি করে সাত বিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ।

অর্থনীতির অন্যতম শক্তিকেন্দ্র তরাই। তরাইয়ের ভূমি খুব উর্বর। উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদিত হয় এ অঞ্চলে, যা দেশটির অন্য অংশের জন্যও অন্যতম ভরসা। পুরো নেপালের কর্মসংস্থানের ৭০ ভাগ জোগান দেয় কৃষি। জিডিপিতে কৃষির অবদান ৩৭ শতাংশ। তরাই কৃষি ছাড়া বৌদ্ধতীর্থ লুম্বিনী, চিতওয়ান পার্ক ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যাপক পর্যটকও আকর্ষণ করে। নেপালের আয়-রোজগারে টুরিজমের রয়েছে মুখ্য ভূমিকা। বিশ্বের ১০টা উঁচু পর্বতশৃঙ্গের আটটিই নেপালে। কৃষির মতো নেপালের শিল্প স্থাপনার প্রধান অংশও তরাই অঞ্চলেই বিকশিত।

নেপালের প্রায় সাত বিলিয়ন ডলারের আমদানির ৮০ ভাগ ভারত থেকে হয়। বাকিটা চীন থেকে। চীনের প্রভাব এ ক্ষেত্রে বাড়ছে। অন্যদিকে রপ্তানির ৫০ ভাগও ভারতনির্ভর। যুক্তরাষ্ট্রের হিস্যা এ ক্ষেত্রে ২৫ ভাগ। দেশটিতে প্রায় ৮৩ হাজার মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ থাকলেও এক হাজার মেগাওয়াটও উৎপাদন করার অবকাঠামো তৈরি হয়নি। বাজেটের অর্ধেক এখনো বিদেশি সহায়তানির্ভর। সরকারি হিসাবে জনসংখ্যার ২৫ ভাগ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বেসরকারি হিসাবে দারিদ্র্য আরও বেশি ব্যাপক। ইদানীং নেপালের প্রচুর কর্মজীবী বিদেশে যাচ্ছেন কর্মসূত্রে। এ ছাড়া বহু আগে থেকে নেপালের গোর্খারা ব্রিটেন ও ভারতে সৈনিকের পেশায় কাজ করছে। এসব সত্ত্বেও অর্থনীতিতে গতিশীলতা ক্ষীণ।

রাজতন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে 'গণতান্ত্রিক' পরিসরে এলেও দেশটির রাজনীতিবিদেরা প্রশাসনিক সংস্কার সাধনে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে না পারায় সমাজের নিচুতলার অর্থনৈতিক জীবনে 'গণতন্ত্র' কোনো নতুন উদ্দীপনা নিয়ে হাজির হতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রায় রাজতান্ত্রিক আমলের মতো প্রশাসনে এখনো জবাবদিহির সংস্কৃতি অনুপস্থিত।

আউটার ও ইনার তরাইয়ের সমীকরণ

যমুনা, কর্নালি নারায়ণী ইত্যাদি নদীবিধৌত ভূভাগ তরাই। এটা নেপালের অপেক্ষাকৃত সমতল অঞ্চল। ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহারসংলগ্ন। তরাইয়ের আবার দুটো দিক আছে: আউটার তরাই এবং ইনার তরাই। আউটার তরাইকে স্থানীয়ভাবে 'নয়া মুলুক' বলা হতো একসময়। নেপালের জনসংখ্যার ৪৫ ভাগ থাকে আউটার তরাইয়ে। সংখ্যায় যা প্রায় এক কোটি হবে।

পুরো নেপালের ৭৫টি জেলার মধ্যে ২০-২৫টি জেলায় মাধেসিদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আউটার তরাইয়ের প্রধান প্রধান জেলা হলো মোরং, শুকসারি, কাঞ্চনপুর, কপিলাবস্তু, রুপান্দি, বাংকে, সাপতারি ইত্যাদি। আউটার তরাইয়ের এসব জেলায় 'পাহাড়ি'দেরও উপস্থিতি রয়েছে, তবে

তারা সংখ্যালঘু। মাধেসি জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রতিপক্ষ এই পাহাড়িরা। আউটার তরাইয়ের সব কটি জেলা ভারত সীমান্তসংলগ্ন।

অন্যদিকে, ইনার তরাই অপেক্ষাকৃত ভেতরে অবস্থিত। নেপালি ভাষায় একে বলা হয় 'ভিতরি মধেস।' পাঁচটি ভ্যালি আছে এই 'ভিতরি মধেস'-এ। চিতওয়ান, দাঙ, উদয়পুর, সিন্দুলি, মাকওয়ান, সুরেট ইত্যাদি সাতটি জেলা এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। বিরাটনগর, বীরগঞ্জ, ভরতপুর ইত্যাদি তরাইয়ের প্রধান প্রধান নগর হিসেবে পরিচিত।

তরাইয়ের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক যোগসূত্র

ভারত-নেপালের সীমান্ত অনেকখানিই উন্মুক্ত। ফলে মাধেসি জাতীয়তাবাদের ভারত-সংশ্লিষ্টতা শুরু থেকে। মাধেসি বলে দাবিদারদের খাবার, পোশাকসহ অন্যান্য সব সংস্কৃতিতে উত্তর প্রদেশ ও বিহারের প্রবল ছাপ। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে এখানকার মানুষ ভারতমুখী। ভারত থেকেই এসেছে তারা বা তাদের পূর্বপুরুষেরা। কেউ কাজের সন্ধানে, কেউ ঘোড়ার গাড়ি চালাতে, কেউ জিনিসপত্র বিক্রি করতে, কেউ চোরাচালানে যুক্ত হয়ে—কেউবা মূল ভারতে কোনো ফৌজদারি অপরাধ করে লুকাতে। উন্মুক্ত সীমান্ত কেবল যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগকে উন্মুক্ত রেখেছে, তা-ই নয়, প্রচুর অস্ত্রও আসে এই পথে, যা ২০০৭ পরবর্তীকালের জনবিস্ফোরণে সহিংসতার রসদ হয়েছিল।

ঐতিহাসিক এই উন্মুক্ত সীমান্ত মাধেসি সহিংসদের নিয়ন্ত্রণে নেপালের প্রশাসনকে অকার্যকর করে রেখেছে। কাঠমান্ডুর কর্তৃত্ব এখানে কম। ১৯৫০ সালের ৩১ জুলাই নেপাল-ইন্ডিয়া 'শান্তি চুক্তি'র অনুচ্ছেদ ৬ ও ৭ এই উন্মুক্ততাকে বৈধতা দিয়েছে। এর মধ্য দিয়ে নেপালে, বিশেষত তরাইয়ে ভারতীয়দের মাধেসি রূপে অবস্থান, অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা অবাধ রূপ নেয় এবং কালক্রমে তরাই রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। নেপাল-ইন্ডিয়া ওই 'চুক্তি'র পর ১৯৫৩ সালে কাঠমান্ডু থেকে বিহারসংলগ্ন বীরগঞ্জ পর্যন্ত হাইওয়ে নির্মাণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির সরাসরি প্রভাব চলে আসে নেপালের রাজধানী পর্যন্ত।

বর্তমানে এখানে সীমান্তজুড়ে মানুষের নিয়মিত আসা-যাওয়া। ঘোড়ায় টানা 'টঙ্গা' গাড়ি হলো এ সীমান্তের পরিচিত বাহন। অনেকে এখানে আত্মীয়তা, বাজার, অর্থনীতি ইত্যাদি প্রয়োজনে নিয়মিত দুদেশজুড়ে চলাচল করেন। চোরাচালানও অবাধ। লিকার থেকে শুরু করে বন্দুক, আফিম পর্যন্ত প্রায় সব পণ্য গতিশীল অবাধে। দেশটির বৈদেশিক বাণিজ্যের ৪০ ভাগ তরাই সীমান্ত দিয়েই হচ্ছে বলে দাবি নেপাল চেম্বারের। এতে রাজস্ব ক্ষতি প্রায় তিন বিলিয়ন রুপি বলে অনুমান

করা হয়। অপহরণ-বাণিজ্যও নিয়মিত এক অভিজ্ঞতা এই সীমান্তে। চোরাচালান ও অপহরণ-বাণিজ্য সবই মূলত দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় তরাইয়ের রাজনীতিবিদদের দ্বারাই। যেহেতু সীমান্ত উন্মুক্ত এবং 'শান্তি চুক্তি'র রাজনৈতিক আবরণ রয়েছে সে কারণে সীমান্তের দুই পাড়ে সহায়-সম্পদ নিয়ে সাবলীলভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারছে ভারতীয় আগ্রহীরা। মাধেসে ভারতীয় কর্মজীবীদের সংখ্যাবৃদ্ধি বোঝা যায় বিশেষ করে শুমারির তথ্য থেকে। ১৯৫৪ সালে তরাইয়ের জনসংখ্যা ছিল নেপালের লোকসংখ্যার ৩৫ শতাংশ। এখন তা প্রায় ৫৮ শতাংশ।

তরাইয়ের রাজনৈতিক হতাশার ঐতিহাসিক উৎস

তরাই যদিও অতীতে পার্লামেন্টে প্রায় ৪৩ ভাগ প্রতিনিধিত্ব করেছে, কিন্তু মাধেসিদের প্রতিনিধিত্ব সেখানে এক-পঞ্চমাংশের বেশি নয়। সামরিক বাহিনী, সিভিল প্রশাসন, বিদেশ মন্ত্রণালয়, পুলিশ বাহিনী ইত্যাদিতেও মাধেসিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অতিনগণ্য। পাহাড়ি এলিটদের আধিপত্য ছিল সর্বত্র। পাহাড় এখানে চিহ্নিত 'খাস এরিয়া' নামে। মাধেসিদের বঞ্চনাবোধের এটাই হলো প্রধান পটভূমি। ঐতিহাসিকভাবে কাঠমান্ডুর শাসকেরা মাধেসিদের বিশেষভাবে ঘৃণা করতেন এ কারণে যে তারা ১৮১৬-এর যুদ্ধে ব্রিটিশদের সহায়তা করেছিল। ফল হিসেবে পরবর্তীকালে দীর্ঘ সময় মাধেসিদের কাঠমান্ডু প্রবেশে একধরনের পাস প্রথাও চালু ছিল। মাধেসে হিন্দির আধিপত্যেও নেপালি শাসক এলিটরা বিরক্ত। ১৯৫৯-এ প্রথম হিন্দি এখানে কারিকুলামে ঠাঁই পায়। সরকারি পোশাকের নেপালীকরণও মাধেসিদের মাঝে বঞ্চনাবোধ উসকে দেয়। ১৯৯০ পর্যন্ত রাজতান্ত্রিক শাসনে এসব হতাশা চাপা পড়ে ছিল। 'গণতান্ত্রিক আবহ' আসার সঙ্গে সঙ্গে হতাশা ক্ষোভে রূপ নিতে শুরু করে।

তরাইয়ের আন্দোলনের মূল ইস্যু

২০০৬-এর এপ্রিলে এবং ২০০৭-এর জানুয়ারিতে এখানে প্রায় দুই মাসব্যাপী এক জন-আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। শেষোক্ত আন্দোলন স্থায়ী হয় প্রায় ২১ দিন। মাধেসি জন-অধিকার ফোরাম এর নেতৃত্ব দেয়। এতে প্রথমবারের মতো মাধেসি পরিচয়ের বিশেষ স্ফুরণ ঘটে। বিক্ষোভ একপর্যায়ে সশস্ত্র রূপ নেয়। এ সময় অন্তত ২৪ জন পাহাড়ি খুন হয়। মাধেসিরা মনে করে তাদের সব সমস্যার জন্য পাহাড়িরা দায়ী। মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিএন-এম) ২৭ জন কর্মীকেও মাধেসিরা হত্যা করে ২০০৭-এর ২১ মার্চ। এই মাওবাদীরা সবাই ছিল পাহাড়ি।

পাহাড়িদের মাধেস ছাড়তে হবে এটাও মাধেসি জাতীয়তাবাদের অন্যতম এক দাবি। অন্য আরেকটি প্রবল দাবি 'স্বশাসন' এবং সেনাবাহিনীতে আরও বেশি

প্রতিনিধিত্বের সুযোগ, যা আবার প্রতিরক্ষা কাঠামোর রাজনীতিকীকরণের অনিবার্য এক আশঙ্কা তৈরি করেছে। ২০০৬ ও ২০০৭-এর আন্দোলনকালে তরাইয়ের অনেক পাহাড়িকে স্বল্প মূল্যে তাদের বাড়িঘর বিক্রি করে এলাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তৃণমূল থেকে পাহাড়িদের এভাবে উচ্ছেদ তরাইয়ের অনেকের জন্য আর্থিক ও সম্পদগত পরিসর বাড়াতে সহায়ক হয়। ফলে এই আন্দোলনকে তারা উৎসাহ জোগায়। অর্থাৎ পাহাড়িবিরোধিতা মাধেস আন্দোলনের অন্যতম সমাবেশীকরণ কৌশল ছিল এবং আছে। কাঠমান্ডুর রাজনীতিবিদেরা মাধেস ধারণার প্রতি যত কঠোর হবেন, ততই তরাইয়ের পাহাড়িদের জন্য পরিস্থিতি কঠোরতর হবে।

মাধেসিরা মূলত তিনটি ধারায় আন্দোলন করে :

ক. নেপাল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বশীল সংস্থাগুলোকে আক্রমণ করা;

খ. মাওবাদীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করা এবং

গ. তরাইয়ের জনসমাজকে এমনভাবে বিভক্ত করে ফেলা যাতে 'মাধেসি বনাম অন্যান্য' সমীকরণের আবহ তৈরি হয়। প্রথম থেকে এই আন্দোলনের প্রধান স্লোগান ছিল : 'এক মাধেস—এক প্রদেশ।'

মাওবাদী উত্থান-পতন ও মাধেস আন্দোলন

নেপালজুড়ে মাওবাদী রাজনীতির উত্থান চূড়ান্ত রূপ পাওয়ার মুখেই ২০০৬ থেকে তরাইয়ে মাধেসিবাদের উত্থান। এই দুটোর তাই আন্তসম্পর্ক রয়েছে। ২০১৫ সালে মাওবাদী কমিউনিস্ট পার্টির 'জনযুদ্ধ'-এর ২০তম বার্ষিকী পালিত হচ্ছে। তবে নয় বছর আগে ১২ দফা চুক্তির মাধ্যমে সশস্ত্র সংগ্রাম ত্যাগ করে মাওবাদীরা সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় শামিল হয়।

২০০৮-এর প্রথম সংবিধানসভার নির্বাচনে তারা প্রধান দলে পরিণত হলেও যখন তারা ভূমি সংস্কারে হাত দিতে যাচ্ছিল তখনই তরাইয়ে বিশেষভাবে 'মাধেসি জাতীয়তাবাদ'দের প্রচার শুরু হয়। মাওবাদীরা প্রথম দিকে 'একক নেপাল' ধারণার সমর্থক হওয়ায় মাধেসি জাতীয়তাবাদীরা রাজনৈতিকভাবে তাদের একঘরে করে ফেলতে সমর্থ হয়। সিপিএন (এম) ভূমিহীনদের জন্য জমি সংগ্রহে মাধেসের এমন অনেক ভূস্বামীর জমি কেড়ে নিতে উদ্যত হয়, যারা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী গোষ্ঠী। শেষোক্তরা তখন কৌশলে মাধেসি জাতীয়তাবাদের চেতনা ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হন। এভাবেই সেখানে ভূমি সংস্কারকে মোকাবিলা করা হয়। আবার মাওবাদীরা ভূমি সংস্কারের প্রতিজ্ঞায় হেরে যাওয়ায় তাদের প্রতি সমাজের নিচুতলার আকাঙ্ক্ষাও ঘা খায় তাতে।

সিপিএন(এম) তাদের সংগ্রামী সময়ে অনেক শক্তিশালী মাধেসি গ্যাংয়ের কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল। সেটাও মাওবাদীদের প্রতি ওই সব শক্তির

আক্রোশের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে এবং একপর্যায়ে প্রকাশ্যে তারা মাওবাদীদের কাছ থেকে সেসব অস্ত্র ফেরত চেয়েছে। ইতিমধ্যে 'চুক্তি'র মাধ্যমে মাওবাদীরা তাদের 'সশস্ত্র সংগ্রাম'ও পরিত্যাগ করে এবং জাতিসংঘের তদারকিতে তাদের ১৯ হাজার ৬১ 'গেরিলা' নিরস্ত্র হয়ে ১ হাজার ৪০০ জন সেনাবাহিনীতে এবং বাকিরা জনসমাজে ফিরে যায়। এভাবে কার্যত মাধেসি সশস্ত্রতার মুখে মাওবাদীরা একপর্যায়ে হতবিহ্বল এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়ে।

তরাইয়ে এভাবে মাধেসি আন্দোলনকারীদের কাছে রাজনৈতিক ও সামরিক কোণঠাসা হওয়াকে মাওবাদীরা ভারতীয় ষড়যন্ত্র এবং স্থানীয়দের চেতনার নিচু মানজনিত সমস্যা হিসেবেই সাধারণভাবে চিহ্নিত করে থাকে। যদিও সিপিএন (এম) যখন সরকার গঠন করেছিল তখন মাধেসি আন্দোলনের মুখ্য নেতা উপেন্দ্র যাদবকে এক দফা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয় জোটগত বাধ্যবাধকতার কারণে। অথচ এই উপেন্দ্র যাদবের বিরুদ্ধে ২৭ জন মাওবাদীকে হত্যা ও অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান পোড়ানোর অভিযোগ রয়েছে। মাধেসি আন্দোলন নিয়ে মাওবাদীদের এরূপ নীতিগত বিচ্যুতি অমাধেসিদের মধ্যেও তাদের নিয়ে হতাশা তৈরি করেছে। অন্যদিকে সশস্ত্র সংগ্রাম ত্যাগ করে সাংবিধানিক রাজনীতিতে আসার পর মাওবাদীদের আদর্শিক ও শক্তি-সামর্থ্যের অবক্ষয়ও লক্ষণীয়। বর্তমানে তারা অন্তত তিনটি প্রধান উপদলে বিভক্ত। যদিও প্রধান ধারাটির নেতৃত্বে রয়েছেন আগের মতো পুষ্পকুমার দাহাল এবং বাবুরাম ভট্টরাই।

মাধেস আন্দোলনের প্রধান প্রধান নেতা

১৯৯০ পর্যন্ত মাধেস আইডেনটিটি ভোটের রাজনীতিতে কোনো প্রভাব না ফেললেও এখন চিত্র অনেকখানি পাল্টে গেছে। ১৯৯৭ সালে উপেন্দ্র যাদব মাধেসি জন-অধিকার ফোরাম (এমজেএফ) গড়ে তুলেছিলেন। সাংগঠনিক বিস্তৃতির জন্য প্রথমে মাওবাদীদের সঙ্গেই ছিলেন তিনি। আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা রাজেন্দ্র মাহাতোও মাওবাদীদের সঙ্গে ছিলেন আগে। প্রথম দিকে একাডেমিক একটা মঞ্চ হিসেবে যাত্রা হলেও বিভিন্ন সূত্রে আর্থিক ও সামরিক সহায়তা পেয়ে এমজেএফ দ্রুত ব্যাপক সংখ্যক কর্মীকে তার এজেন্ডায় সমবেত করতে সক্ষম হয়। এই আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে চরমপন্থী-নরমপন্থী এরূপ নানান বিবেচনাও বিদ্যমান। উপেন্দ্র যাদবের ব্যাপারে ভারতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) বিশেষ সহানুভূতি রয়েছে। ভারতের গণমাধ্যমে অনেক সময় এমন সংবাদচিত্র দেখা গেছে যাদব আরএসএস নেতাদের সঙ্গে দেখা করছেন। এই আন্দোলনের আরেকজন কেন্দ্রীয় চরিত্র জয়প্রকাশ গুপ্ত। নেপালি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে একসময় এমজেএফের কো-চেয়ারম্যান হন। পরে উপেন্দ্র

যাদবের সঙ্গে ভিন্নমত হলে গড়ে তোলেন মাধেসি জন-অধিকার ফোরাম-রিপাবলিক। বর্তমানে তরাই মাধেস ন্যাশনাল ক্যাম্পেনের সভাপতির দায়িত্বও পালন করছেন তিনি। অন্যদিকে রাজেন্দ্র মাহাতো বর্তমানে নেপাল সদভাবনা পার্টির একটি অংশের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

তরাইয়ের মাধেস আন্দোলনে স্থানীয় পাহাড়িদের ভূমিকা

মাধেসিদের আক্রমণাত্মক রূপ সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি পাহাড়িদের অনুরূপ কোনো আক্রোশ নেই বা দাবি নেই। অন্যদিকে থারু জনগোষ্ঠী, যারা তরাইয়ের পশ্চিমাঞ্চলের উল্লেখযোগ্য একটি নৃগোষ্ঠী, তারাও চাইছে না এখানে নেপাল সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে মাধেসিদের 'স্বায়ত্তশাসিত' কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোক। পাহাড়িদের তরফ থেকে এমনও অভিমত রয়েছে, আজকের মাধেসিরা মূলত নেপালে এসেছে ১৯৫৫-এর পর। আগে পাহাড়িরাই তরাইকে আবাদযোগ্য করেছে।

তবে ১৯৯০-এর আগে-পরে কিছুদিন দেশটি বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক গ্রুপে সংগঠিত হয়ে তরাইয়ের মাধেসিদের বিরুদ্ধে এই বলে একটি অবস্থান নিয়েছিল যে এরা (মাধেসিরা) 'অদেশীয়'। এই নৃগোষ্ঠীগুলো তখন নেপাল ফেডারেশন অব নেশনালিটিজ (এনএফএন) গড়ে তোলে।

উল্লেখ্য, তরাইয়ে অনেক ছোট ছোট নৃগোষ্ঠী রয়েছে, মাধেসি আন্দোলনকারীরা তাদের সংগ্রামে এদের ভয়কে দূর করতে পারেনি। এভাবে এটা এক বড় উদ্বেগের বিষয় হয়ে আছে যে তরাই স্বায়ত্তশাসন পেলে স্থানীয় অন্য নৃগোষ্ঠীগুলোর কী হবে। এর মধ্যে থারুদের সঙ্গে ইতিমধ্যে মাধেসপন্থীদের খুবই তিক্ত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

মাধেস আন্দোলনকেন্দ্রিক দুদফা চুক্তি

২০০৬ ও ২০০৭-এর 'মাধেস আন্দোলন' নেপালের ফেডারেলধর্মী এক নতুন ধারার শাসনকাঠামোর পক্ষে শাসক এলিটদের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছিল। অন্তত কাঠমান্ডুভিত্তিক জাতীয় দলগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে সম্পাদিত দুটি চুক্তিতে 'স্বশাসিত মাধেস' ধারণাকে পরোক্ষে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তবে এসব অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া বেশ জটিল হবে বলেই মনে হয়। কারণ মাধেস বলতে কতটুকু ভূখণ্ডকে বোঝানো হবে সেটা এখনো চরম বিতর্কিত এক বিষয় হয়ে আছে। পাশাপাশি 'স্বশাসন' বলতে ঠিক কী বোঝানো হবে, সেটাও ফয়সালা হয়নি এখনো। এরূপ প্রথম 'অ্যাগ্রিমেন্ট' হয় ২০০৭-এর ৩১ আগস্ট। যেখানে সরকার ও রাষ্ট্রের সকল স্তরে মাধেসিদের আনুপাতিক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং প্রদেশভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন দিয়ে নেপালকে পুনর্গঠনের বিষয়ে মতৈক্য

হয়েছিল। তবে প্রদেশ ও কেন্দ্রের অধিকার ও দায়িত্বের সীমানা নির্ধারণের বিষয়টি সাংবিধানিক সভার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই অ্যাগ্রিমেন্টের পর দীর্ঘ সাত বছর পরও সাংবিধানিক সভা ওই বিতর্ক নিয়ে ২০১৫-এর শুরুতেও মতৈক্যে আসতে পারছে না।

২০০৭-এর চুক্তির মতো ২০০৮-এর ২৮ ফেব্রুয়ারি ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক মাধেসি ফ্রন্টের নেতাদের সঙ্গে নেপালের কেন্দ্রীয় সরকারের আরেকটি চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তিটি ছিল আট দফা। এতে মাধেসিদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন রাজেন্দ্র মাহাতো এবং উপেন্দ্র যাদব। এই চুক্তিতেও নেপালে একটি ফেডারেল ব্যবস্থার অঙ্গীকার করা হয় এবং সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় সংস্থায় নিয়োগে মাধেসিদের প্রতি আনুপাতিক ন্যায্যতা দেখানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

তবে সামগ্রিকভাবে এখন প্রতীয়মান হচ্ছে, নেপালের রাজনীতির কেন্দ্রীয় দলগুলো মাধেস অঞ্চলটি নিয়ে একক কোনো প্রদেশ গঠন এবং তাকে স্বশাসন দেওয়ার বিরোধী। কেন্দ্রীয় এসব দল অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় এরূপ অভিমত ব্যক্ত করে থাকে যে মাধেস আন্দোলন অন্য দেশের রাজনীতিবিদ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলোর অঙ্গুলি হেলনে সৃষ্ট মাত্র। তারপরও তারা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ২০০৭-এর আগস্টে এবং ২০০৮-এর ফেব্রুয়ারিতে দুদফা চুক্তি করেছে মূলত নেপালের অর্থনীতির অতিরিক্ত মাধেস-নির্ভরতার কারণে এবং জাতীয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে ভারত প্রশ্নে কৌশলগত অনৈক্যের কারণে।

মাধেস আন্দোলনের কৌশল ও তার জাতীয় ফলাফল

এই আন্দোলনের শক্তিগুলো সব সময়ই 'মাধেসি বনাম পাহাড়ি' সমীকরণে স্থানীয় আর্থসামাজিক পরিস্থিতিকে মেরুকরণ করতে চেয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা অনেকখানি সফলও। ফলে মাওবাদীদের রাজনীতি এ অঞ্চলে দুর্বল হয়ে গেছে। এমনকি মাধেসিদের এই আন্দোলন পুরো নেপালের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও দুর্বল করে দিয়েছে। মাধেসি নেতাদের চূড়ান্ত দাবি মাধেস অঞ্চলে একক স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ গড়ে তুলতে হবে। কাঠমান্ডুর জন্য এটা মেনে নেওয়া স্পর্শকাতর। এর ফলে দেশটির অন্যত্রও আঞ্চলিকতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। বিদ্যমান বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর মধ্যে আস্থা ও অবিশ্বাসের পরিবেশও বৃদ্ধি পাবে তাতে। ইতিমধ্যে মাধেসিদের আন্দোলনে 'প্যান-নেপাল' আইডেনটিটি অনেকখানি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছে এবং দুর্বল হয়ে গেছে। ফলে কেবল মাওবাদীদেরই নয়, তরাই অঞ্চলে মাধেসি আন্দোলন নেপালি কংগ্রেসের মতো পুরোনো দলগুলোকেও সাংগঠনিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এই আন্দোলনের আরও একটি এবং বস্তুতপক্ষে সবচেয়ে বিধ্বংসী ফল হলো মাধেসি জাতীয়তাবাদের নামে তরাইয়ে

সন্ত্রাসের বিস্তার। তরাই আর্মি, জনগণতান্ত্রিক তরাই মুক্তিমঞ্চের (জেটিএমএম) জাওয়ালা সিংহ গ্রুপ ইত্যাদি সংগঠন এই আন্দোলনের আড়ালে শিল্পাঞ্চলগুলোতে ব্যাপক চাঁদাবাজি, অপহরণ করত।

অন্যদিকে মাধেসি থিংক-ট্যাংক সব সময় রাষ্ট্র *ও সরকারে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের* প্রশ্নটি উত্থাপন করে থাকে। এরূপ দাবি মূলত নেপালের নীতিনির্ধারণী পরিসরে পাহাড়িদের কোণঠাসা করার একটি মোক্ষম অস্ত্র হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আসছে, যা কার্যত সুদূরপ্রসারী বিবেচনায় দেশটিতে একটি জাতীয় বিভেদরেখার বীজ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

মাধেস আন্দোলন ও ভারতের ভূমিকা

নেপালের সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে দুই বৃহৎ দেশ—চীন ও ভারতের। এর মধ্যে হিমালয়ের দেয়ালতুল্য ভূমিকার কারণে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবে বিকশিত নয়। সেই তুলনায় ভারত নেপালে রয়েছে সর্বগ্রাসী রূপে। তবে দুটি দেশের সম্পর্ক বেশ জটিল। ১৯৫০-এ 'পিস ও ফ্রেন্ডশিপ ট্রিটি' হলেও অনেক নেপালি মনে করে ওই চুক্তি কার্যত দেশটির স্বাধীনতা হরণ করেছে। চুক্তির অনেকগুলো ধারা নেপালের সার্বভৌমত্ব স্পষ্টত প্রশ্নবিদ্ধ করে। এই চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কখনো সাধারণ নাগরিকদের মতামত নেওয়া হয়নি।

চুক্তি অনুযায়ী (অনুচ্ছেদ ৫) নেপালকে নিরাপত্তার জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে ভারতের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে, হয় *ভারত থেকে অথবা ভারতের মাধ্যমেই* আসতে হবে সেটা! অনুচ্ছেদ ৬ অনুযায়ী নেপালে ভারতীয়রা পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে, সম্পত্তির মালিক হতে পারবে, যেকোনো চুক্তিনামায় যুক্ত হতে পারবে এবং বসবাস করতে পারবে। এই সুযোগ নেপালের নাগরিকদের জন্যও প্রযোজ্য বলা হলেও বাস্তবতা হলো এর পূর্ণ প্রয়োগ করেছে নেপালে ভারতীয়রাই। স্বাক্ষরের পর থেকে নেপালের 'পাহাড়ি' সমাজে এই চুক্তির বিরুদ্ধে ক্ষোভ থাকলেও তরাইয়ে বসবাসকারীরা তাতে উল্লসিত ছিল।

মাওবাদীরাও এই চুক্তির ঘোর বিরোধী ছিল। ২০০৮-এর ২৪ এপ্রিল মাওবাদী নেতা পুষ্পকুমার দহল চুক্তিটি বাতিলের অঙ্গীকার করেছিলেন। ফলে তাদের উত্থান পরবর্তীকালে মাধেসি আন্দোলন সৃষ্টির গভীর যোগসূত্র দেখেন অনেক স্থানীয় পর্যবেক্ষক। তবে ক্ষমতায় আসার পর চুক্তি বাতিল বা সংশোধনের সপক্ষে মাওবাদীরা কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

এ ছাড়া মাধেসি আন্দোলনকালে বিচ্ছিন্নতাবাদী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো যেভাবে উত্তর প্রদেশ ও বিহারে আশ্রয় পেয়েছে সেটাও এই আন্দোলনের প্রতি ভারতের সহানুভূতিকে স্পষ্ট করেছে। এই প্রেক্ষাপটে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি এম কৈরালার মন্তব্যটি বিশেষ অর্থবহ: 'ভারত-নেপাল যৌথ উদ্যোগ ছাড়া মাধেস আন্দোলন নিয়ে মীমাংসায় আসা যাবে না।' স্পষ্টত এই মন্তব্যে ছিল একধরনের আত্মসমর্পণের সুর। মাধেস আন্দোলনের প্রধান নেতা উপেন্দ্র যাদব কর্তৃক কয়েকবার ভারতের দক্ষিণপন্থী সংগঠনগুলোর সঙ্গে বৈঠকও মাধেস আন্দোলনের প্রতি ভারতীয় বিশেষ মহলের সহানুভূতির স্মারক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এরূপ এক বৈঠক শেষেই তিনি বলেছিলেন, 'নেপালকে আবার হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ফিরে পেতে কাজ করতে চান তিনি।'

নেপালকে ঘিরে প্রতিবেশীদের টানাপোড়েন

এই লেখা যখন তৈরি হচ্ছে ২০১৫ সালের শুরুতে, তখন নেপালজুড়ে তীব্র রাজনৈতিক-সাংবিধানিক ক্রান্তিকাল চলছিল। দীর্ঘ চেষ্টার পরও নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন দ্বিতীয় সংবিধান সভা সর্বসম্মত কোনো সংবিধান তৈরি করতে পারেনি। যদিও এর জন্য সর্বশেষ নির্ধারিত তারিখ ছিল ২০১৫ সালের ২২ জানুয়ারি। নতুনভাবে গত মে মাসের (২০১৫) মধ্যে সংবিধান তৈরির তারিখ নির্ধারিত হয়েছিল। ১৯৯০ সালে রাজতন্ত্রকে নিষ্ক্রিয় করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে অভূতপূর্ব ঐক্য ছিল এবং ২০০৬ সালে মাওবাদীদের অস্ত্র সমর্পণের পর দেশজুড়ে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠার পক্ষে যে আশাবাদ তৈরি হয়েছে সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসে সেই আশাবাদী ঐক্যবদ্ধ অবস্থা আর কার্যকর দেখা যাচ্ছে না। যে কারণে ২০০৮ সালে রাজতন্ত্র পুরোপুরি উৎখাতের পরও দেশটি কার্যত কোনো গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার আইনি কাঠামো গড়ে তুলতে পারেনি। ২০১২ সালের মধ্যে নতুন সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ বহু আগেই তামাদি হয়ে গেছে। প্রথম সংবিধান সভার ব্যর্থতার পর ২০১৩-এর নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত দ্বিতীয় সংবিধান সভাও এ ক্ষেত্রে এখনো কোনো সফলতা দেখাতে পারেনি।

সংবিধান সভায় বর্তমানে বিবাদের কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে উঠেছে তরাইয়ের প্রশাসনিক মর্যাদা তথা দেশটিতে কীরূপ ফেডারেল ব্যবস্থা থাকবে তা নিয়ে রাজনৈতিক ভিন্নমত। মাধেসিদের পাশাপাশি এখন মাওবাদীরাও দেশটির প্রদেশভিত্তিক সর্বোচ্চ বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে। তাদের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে 'জনজাতি গ্রুপ' নামে আদিবাসীদের একটি শক্তিশালী জোটও। তবে এই তিন শক্তিই দেশটির সংবিধান সভায় সংখ্যালঘু।

উল্লেখ্য, দেশটিতে 'সিএ-টু' নামে ৬০১ সদস্যবিশিষ্ট যে দ্বিতীয় সংবিধান সভা চলছে তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ নেপালি কংগ্রেস ও ইউনাইটেড মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট পার্টি (ইউএমএল) দেশটির অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণের বিপক্ষে। মাওবাদী ও মাধেসিরা

দেশটিকে ১০টি প্রদেশে বিভক্ত করার প্রস্তাব দিয়েছে। এটা অনুমোদিত হলে ঐতিহাসিকভাবে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীগুলোর রাজনৈতিকভাবে কর্তৃত্বপূর্ণ অবস্থানে চলে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। অন্যদিকে নেপালি কংগ্রেস সর্বোচ্চ সাতটি প্রদেশ গঠনের পক্ষে, যাতে পাহাড়ি সমাজের বর্তমান রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রায় অক্ষুণ্ন থাকবে।

এ পর্যায়ে কৌতূহল উদ্দীপক দিক হলো শুরু থেকে দিল্লির ক্ষমতাধর মহল মাধেসিদের আন্দোলনে নানানভাবে জ্বালানি সরবরাহ করলেও বর্তমানে তারা নেপালে মাওবাদী ও মাধেসিদের ১০ প্রদেশ ধারণার বিরোধিতা করছে। পাশাপাশি চীনও নৃগোষ্ঠীভিত্তিক প্রদেশ ধারণার বিরোধিতার কথা নেপালের রাজনৈতিক দলগুলোকে জানিয়েছে। চীন মনে করে প্রদেশভিত্তিক কাঠামো, বিশেষত সেটা যদি হয় জাতিগত আইডেনটিটিভিত্তিক, তাহলে ভবিষ্যতের নেপালকে চূড়ান্ত বিবেচনায় তা দুর্বল করবে। একই সঙ্গে মাধেসিদের স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশে ভারতের নিশ্চিত প্রভাব নিয়েও চীন উদ্বিগ্ন। তাদের বিবেচনায় এটা দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের কর্তৃত্বের পরিধি আরও বাড়াবে।

ভারত ও চীন উভয়ে এ ক্ষেত্রে তাদের দেশের সীমান্তবর্তী শক্তিশালী নৃগোষ্ঠীগুলোর সাংস্কৃতিক ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যচেতনা বৃদ্ধির বিপদ হিসেবে দেখছে। তাদের অবস্থানের স্ববিরোধী দিক হলো চীন নেপালে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে বললেও নিজ দেশে বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীকে তিব্বতসহ অন্তত পাঁচটি অটোনোমাস অঞ্চল করে দিয়েছে। অন্যদিকে ভারত কিছুদিন আগে তেলেঙ্গানা নামক নতুন আরেকটি ভাষাভিত্তিক প্রদেশের দাবি অনুমোদন করেছে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপীয় শক্তিসমূহ নেপালের সর্বোচ্চ বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষে। চীন ও ভারত উভয় এটাকেও সুনজরে দেখছে না। চীন মনে করে তিব্বতকে ঘিরে পশ্চিমা শক্তিসমূহের বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামরিক নকশার বাস্তবায়ন সহজ হবে অতিরিক্ত বিকেন্দ্রীকৃত নেপালকে হাতে পাওয়া গেলে।

সর্বশেষ অবস্থা

দেশজুড়ে তীব্র আলোড়ন সত্ত্বেও আপাতত নেপালের রাজনৈতিক সমস্যার কোনো চূড়ান্ত সমাধান আশা করা দুরূহ। তবে দেশটিতে বিতর্ক এখন আর এ জায়গায় নেই যে ভবিষ্যৎ নেপাল প্রদেশভিত্তিক হবে নাকি এককেন্দ্রিক একটি রাষ্ট্র হবে। বরং প্রদেশ কয়টি হবে এবং প্রদেশকাঠামো নৃগোষ্ঠীকেন্দ্রিক নাকি ভৌগোলিক বিবেচনাভিত্তিক হবে সে নিয়েই এখন বিতর্ক চলছে। তবে প্রদেশের সংখ্যা যতগুলো হোক তার সীমানা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক ও বিবাদ প্রায় অবধারিত। প্রধান প্রধান সব নৃগোষ্ঠীই সব প্রদেশে তাদের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চাইবে এবং একইভাবে রাজনৈতিক দলগুলোও প্রদেশের সীমানা নির্ধারণ-প্রক্রিয়ায় নিজেদের ক্ষমতার বিবেচনা কাজে লাগাবে।

বর্তমানে সংবিধান সভা কাজ করলেও সাধারণভাবে নেপালের ২০৫ আসনের পার্লামেন্টে তরাই এলাকা ৮৮টি আসন দখল করে আছে। মাধেসি অধ্যুষিত জেলাগুলোর মধ্যে এমন কয়েকটি জেলা রয়েছে, যেখানে মাধেসিদের কর্তৃত্ব অত্যধিক। যার মধ্যে রয়েছে সপ্তরি, সিরাহা, দানুশা, মাহুতারি এবং সারলাহি। কিন্তু অনেক জেলা রয়েছে যেখানে অন্য নৃগোষ্ঠীও সংখ্যায় কম নয়। এসবই জটিল এক সমীকরণের জন্ম দেবে অদূর ভবিষ্যতে।

উল্লেখ্য, সংবিধান প্রণয়ন মূল দায়িত্ব হলেও নেপালের সংবিধান সভা সাধারণ পার্লামেন্ট হিসেবেও কাজ করছে। প্রধান দলগুলোর মধ্যে মাওবাদীরা রয়েছে বিরোধী দলের ভূমিকায়। সরকারের নেতৃত্ব দিচ্ছে সুশীল কৈরালার নেতৃত্বে নেপালি কংগ্রেস ও ইউএমএল পার্টি। শাসক দুটি দলই বর্তমানে ভারতের বিশেষ মিত্র হিসেবে স্বীকৃত। সর্বশেষ নির্বাচনে কংগ্রেস ১৯৬টি আসন পেয়ে দেশের প্রধান দলে পরিণত হয়। দ্বিতীয় প্রধান দলে পরিণত হয় ইউএমএল, তারা আসন পায় ১৭৫টি।

বর্তমান সংবিধান সভায় মাধেসের প্রাদেশিক মর্যাদা নিয়ে বিবাদ চলমান অবস্থাতে মাধেসি জন-অধিকার ফোরাম (এমজেএফ) তরাই-মাধেস লোকতান্ত্রিক পার্টি (টিএমএলএফ) ও নেপাল সদভাবনা পার্টির (এসপি) সঙ্গে মিলে ইতিমধ্যে গঠন করেছে ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক মাধেসি ফ্রন্ট (ইউডিএমএফ)। এটা অনেকটা রাজনৈতিক মঞ্চের মতো। তরাইয়ের রাজনীতিতে এরাই এখনো মূল খেলোয়াড়। একসময় মাওবাদীদের সঙ্গে চরম বৈরী সম্পর্ক থাকলেও এখন এরা আবার মাওবাদীদের মিত্র। তরাইয়ের রাজনীতির এটা প্রায় স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। প্রধান দলগুলোর তরফ থেকে ক্ষমতার ভাগ পেয়ে জাতীয় দলগুলোর সঙ্গে ঐক্য ও ভাঙনের খেলায় লিপ্ত হয় তারা। এ ক্ষেত্রে তাদের মূল 'প্রোডাক্ট' জাতীয়তাবাদী এক সাংস্কৃতিক আবেগ।

মাধেসি আন্দোলনের সংগঠকেরা এ হুমকি বরাবর দিয়ে যাচ্ছে যে তাঁদের দাবি মানা না হলে তাঁরা 'নেপালের সঙ্গে' থাকবেন না। এমনকি কোনো অবস্থায় নেপালের সেনাবাহিনীকে এখানে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে মোতায়েনেরও ঘোর বিরোধী তাঁরা। আগেই বলা হয়েছে, বিতর্কের কেন্দ্রে আবর্তিত হচ্ছে ফেডারেলইজম। অর্থাৎ ভবিষ্যতের নেপালে মাধেসিরা কীভাবে স্বায়ত্তশাসনের চর্চা করতে পারবে সেই বিবেচনা। প্রধান দাবি এখন তিনটি তাদের: সকল মাধেসিকে নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট দিতে হবে, পুরো মাধেসকে এক শাসনতান্ত্রিক 'ইউনিট' হিসেবে বিবেচনা করতে হবে এবং সেই ইউনিটকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। এর মধ্যে প্রথম দাবিটি অনেকাংশে পূরণ হয়েছে। বাকি দুটির ভবিষ্যৎ নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে তরাই এবং পুরো নেপালও। তবে সম্ভবত তার আগে নেপালের অভ্যন্তরীণ

বিষয়ে মতৈক্যে আসতে হবে সীমান্তবহির্ভূত অনেক আন্তর্জাতিক শক্তিকে।

তথ্যসূত্র

১. Magnus Hatlebakk, *Economic and social structures that may explain the recent conflicts in the Madhesh of Nepal*, CMI, Norway, 2007. http://www.cmi.no/publications/file/2662-economic-and-social-structures-that-may-explain.pdf (retrieved on 20th January 2014.)

২. *Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship, 1950* and *British-Nepal Sugali Treaty 1815*.

৩. Krisshna Hachhethu, *Madheshi Nationalism and Restructuring the Nepali State*, Tribhuvan University, Nepal, 2007.

৪. http://en.wikipedia.org/wiki/Terai (retrieved on 10th January 2014.)

৫. International Crisis Group, *Nepal's Troubled Tarai Region*, Asia Report 136, 9 July 2007.

৬. *Nationalism and Ethnic Conflict in Nepal: Identities and Mobilization after 1990*. Edited by Mahendra Lawoti and others, Routledge, 2013, USA.

৭. Kristen Zipperer, *Smugglers' paradise*, Himal, Nepal, 27 May 2013.

৮. *Nepal profile: A chronology of key events*, http://www.bbc.com/news/world-south-asia-12499391(retrieved on 15th February 2015.)

৯. Emily Wann, *Violence in the Terai Region and the Madhesi Movement: Prospects for Peace in Nepal*, United States Institute of Peace, August 3, 2007.

১০. Violence in Terai as former Maoists begin fresh 'war', *Hindustan Times*, India. http://www.hindustantimes.com/world-news/violence-in-terai-as-former-maoists-begin-fresh-war/article1-209481.aspx (retrieved on 10th January 2015.)

১১. Insurgency in Nepal, http://www.globalsecurity.org/military/world/war/nepal_insurgency.htm (retrieved on 05th April 2015.)

১২. Prashant Jha, *Battles of the New Republic: A Contemporary History of Nepal*, Hurst and Company, London, 2015.

১৩. Rajesh Joshi, Why China's influence on Nepal worries India, BBC.*http://www.bbc.com/news/world-asia-22365488* (retrieved on 20th March 2015.)

১৪. Jibanath Khanal, Nepal: Indian hegemony has been institutionalized already, *Telegraph Nepal. http://www.telegraphnepal.com/opinion/2012-02-15/nepal:-indian-hegemony-has-been-institutionalized-already (retrieved on 7th april 2015.)*

খাতি আন্তর্জাতিক চিন্তা

অপ্রত্যাশিত কিউবা

এমিলি মরিস

সারসংক্ষেপ

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশও বিপদে পড়ে। সাবেক সোভিয়েত ব্লকভুক্ত দেশগুলোর প্রায় সবাই পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তন করলেও, কিউবা সে পথ মাড়ায়নি। এর জন্য দেশটিকে কম মূল্যও দিতে হয়নি। চরম ধৈর্য ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে দেশটি সমাজতন্ত্র টিকিয়ে রেখেছে। অবশ্য এর জন্য দেশটিকে নানা সংস্কার করতে হয়েছে। কমিকন (Council for Mutual Economic Assistance-COMECON) ট্রেডিং ব্লক ভেঙে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র-কিউবার পর্যবেক্ষকেরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পতন এই হলো বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত কিউবাবিশারদেরা বলেছিলেন, দেশটিকে বাজার অর্থনীতি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ফিদেল কাস্ত্রোর একগুঁয়ে মনোভাব ও পরবর্তীকালে রাউল কাস্ত্রোর সংস্কারের কারণে দেশটিতে এখনো সমাজতন্ত্রের ঝান্ডা উড়ছে।

১৯৬২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডি কিউবার ওপর অবরোধ আরোপ করলে সত্তর ও আশির দশকে কিউবা বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য ব্যাপক মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন দেশটিকে নানা সুবিধাও দিয়েছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কিউবা আর সে সুবিধা পায়নি। এমনকি সাবেক কমিকনভুক্ত দেশগুলো ১৯৯০-এর দশকে যে সুবিধা পেয়েছে, তারা সেটাও পায়নি। ফলে কিউবাকে অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করতে হয়েছে। এরপর তারা দেশে কিছু সংস্কার আনে। বেসরকারি খাতকেও তারা কিছুটা উৎসাহিত করে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ব্যক্তিদের দেশে ফেরার সুযোগ দেয়। আবার তাদের কাছ থেকে কর আদায়ের ব্যাপারেও সচেষ্ট হয়।

এ সময় দেশটি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে ব্যাপক গুরুত্বারোপ করে। ফলে দরিদ্র দেশ হওয়া সত্ত্বেও তার স্বাস্থ্য ও শিক্ষাব্যবস্থা এই অঞ্চলের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে আছে। এ থেকে বোঝা যায়, বৈপরীত্য ও সমস্যা থাকলেও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন মডেলের মধ্যেও বাজার ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আর সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সব নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে

দিতে হবে, তেমনটি মোটেই জরুরি নয়। অথবা পুঁজিবাদের পথে হাঁটতে হবে, সে কথাটিও শতসিদ্ধ নয়। প্রবন্ধটি *মান্থলি রিভিউ* (Monthly Review) জুলাই-আগস্ট ২০১৪ সংখ্যা থেকে অনূদিত।

মূল শব্দগুচ্ছ : অবরোধ, কমিকন, কিউবাবিশারদ, মন্দা, ক্রান্তিকাল, বাজার, ব্যবস্থাপক, শ্রমিক, ওয়াশিংটন কনসেনসাস (পিডব্লিউসি), ডে জিরো, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মৃত্যুহার, গড় আয়ু।

প্রারম্ভিক কথা

সোভিয়েত ব্লকের পতনের সিকি শতাব্দী পর আজ কিউবার অর্থনীতি বিষয়ে কী রায় দেবেন? যে গল্পটা সাধারণত বলা হয়, তা খুবই সাধারণ, এর বার্তা খুবই পরিষ্কার। এই গল্পের বিষয় এ রকম : কিউবার অর্থনীতিতে সময় সময় নীতিগত পরিবর্তন হয়েছে, একবার প্রায়োগিকভাবেই বাজার অর্থনীতির শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করা হয়েছে, সে কারণে যদি কিছু উন্নতি হয়ে থাকে। আবার কখনো কখনো আদর্শ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; যে কারণে অর্থনীতিতে নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।[১] কমিকন ট্রেডিং ব্লক ভেঙে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র-কিউবার পর্যবেক্ষকেরা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছিলেন, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পতন আসন্ন। 'কিউবার শক থেরাপি দরকার—দ্রুত বাজার অর্থনীতির দিকে যেতে হবে', তারা ঘোষণা করে বসেন। দ্বীপরাষ্ট্রে পুঁজিবাদের পুনরুত্থান 'অবশ্যম্ভাবী'; দেরি হলে কিউবার অর্থনীতিই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হবে না, মানবিক ক্ষতিও হবে বিপুল। এতে কিউবার সামাজিক অর্জনের সুনামহানি হবে। উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে ফিদেল কাস্ত্রো অত্যন্ত একগুঁয়ে অবস্থান নিলেও শেষমেশ তাঁর 'শেষ সময়' এসে গেছে।[২]

এই বিবরণের সমস্যা হচ্ছে, বাস্তবতা, খুবই দৃষ্টিগ্রাহ্যরূপে, ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে মেলেনি। যদিও কিউবা খুবই ব্যতিক্রম বিরূপ পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছে, তার অর্থনীতি সাবেক কমিকন দেশগুলোর অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এগিয়েছে। সোভিয়েত ব্লকের সদস্য হিসেবে সে বিশাল ধাক্কা খেয়েছে, যার মূলের ওপর তার নিজের হাত ছিল না। বহুদিনের মার্কিন বাণিজ্যবাধার কারণে এটা হয়েছে, আন্তর্জাতিক পরিসরেও তাকে খুবই বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে। তারপরও বিশ্বব্যাংকের কাছে যে ২৭টি দেশের পূর্ণাঙ্গ তালিকা আছে, এতে তার অবস্থান ১৩। চিত্র ১-এ দেখা যায়, তার প্রবৃদ্ধির গতিমুখ 'ক্রান্তিকালের অর্থনীতির' সাধারণ প্রবণতা অনুসরণ করেছে। ১৯৯০-এর দশকে গভীর মন্দায় আক্রান্ত হয় দেশটি, এরপর শুরু হয় ঘুরে দাঁড়ানোর পালা। আর মাথাপিছু আয় ১৯৯০-এর পর্যায়ে যেতে প্রায় এক

দশক লেগে যায়। আর খসড়া হিসেবে ২০১৩ সালের মধ্যে তা আরও ৪০ শতাংশ বাড়ে।[৩]

সন্দেহ নেই, কিউবার মানুষেরা ১৯৯০ সালের পর থেকে প্রভূত কষ্ট করছে। কিন্তু সামাজিক উৎপাদনের দিক থেকে সাবেক কমিকন দেশগুলোর অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। চিত্র ২-এ দেখা যায়, কিউবার শিশুমৃত্যুর হার ছিল প্রতি হাজারে ১১ জন। কমিকন দেশগুলোর তুলনায় সে সময়ই তা ভালো ছিল। আর ২০০০ সালের মধ্যে তা কমে দাঁড়ায় প্রতি হাজারে ছয়জন। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকেই তা ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত কেন্দ্রীয় ইউরোপের দেশগুলোর তুলনায় ভালো। আর আজ সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রতি হাজারে পাঁচজন, তা এমনকি জাতিসংঘের হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে ভালো, আর লাতিন আমেরিকার গড়ের তুলনায় অনেক ওপরে। চিত্র ৩-এর গড় আয়ুর বিবেচনায়ও একই চিত্র দেখা যায়, কিউবায় গড় আয়ু ১৯৯০-এর দশকে ৭৪ থেকে বেড়ে ৭৮-এ দাঁড়িয়েছে। যদিও এই দশকের সবচেয়ে কঠিন কয়েকটি বছরে মৃত্যুহার কিছুটা বেড়েছিল।[৪] অন্যদিকে একই সময়ে অন্যান্য সাবেক কমিকন দেশে গড় আয়ু ৬৯ থেকে কমে ৬৮ হয়েছে। আজ সাবেক সোভিয়েত ব্লকের দেশগুলোর মধ্যে কিউবার মানুষের গড় আয়ু অন্যতম সর্বোচ্চ আর লাতিন আমেরিকার মধ্যে তা সর্বোচ্চ।

Figure 1: Real gdp per head, Cuba and transition economies, 1990–2013

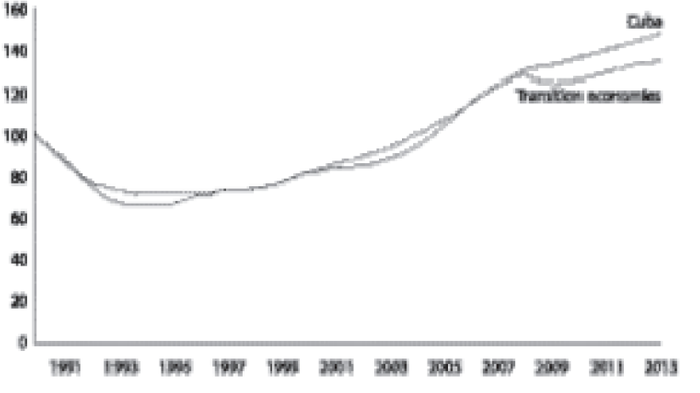

* Index 1990=100. Sources: Data for transition economies (ex-Comecon, minus Vietnam and Mongolia) from ebrd., Transition Report and Economist Intelligence Unit, Country Data; Cuban data from Oficina Nacional de Estadísticas e Información [onei], Anuario Estadístico de Cuba, various years.

Figure 2: Infant mortality rates, selected countries, 1990–2010

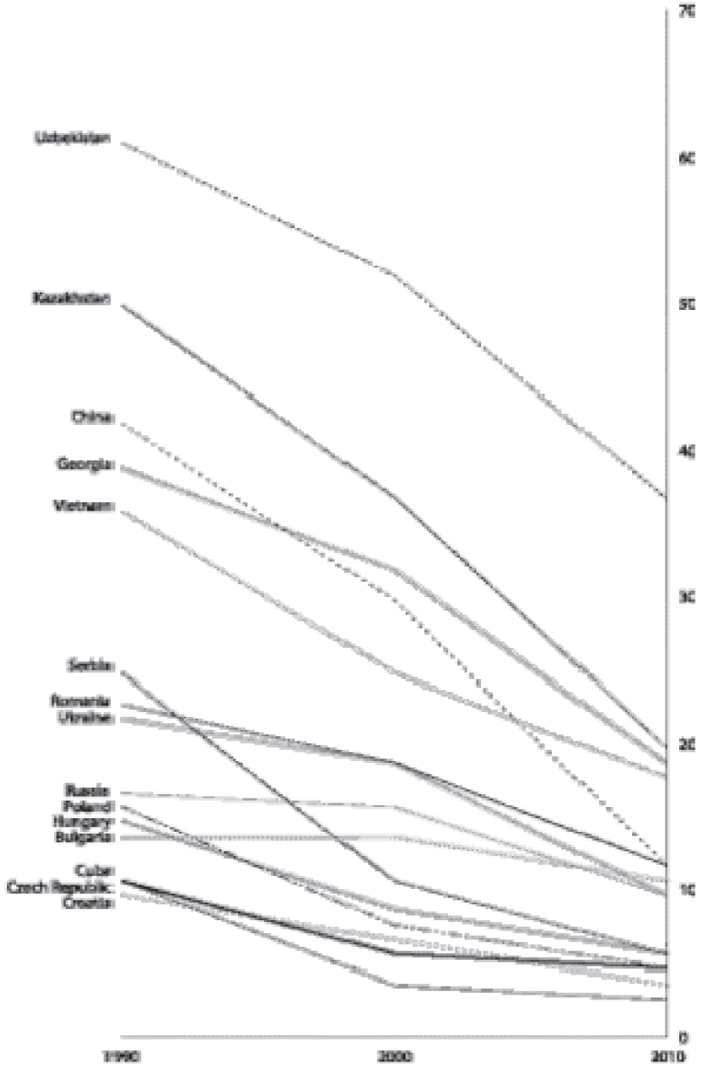

Source: World Health Organization

Figure 3: Life expectancy at birth, selected countries, 1990–2012

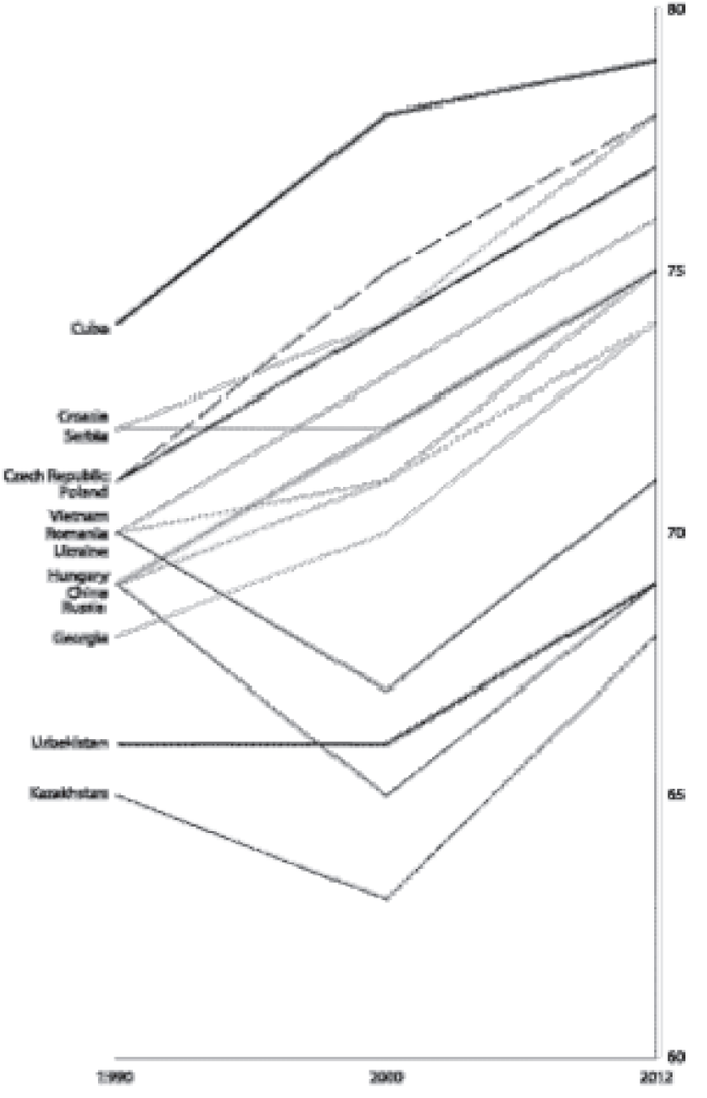

Source: World Health Organization

মিয়ামির মতামত

দ্বীপরাষ্ট্রটির বাইরে মূলধারার বিশেষজ্ঞ মতামতে এসব উপেক্ষিত হয়েছে। এই ক্ষেত্রটি মূলত মার্কিনভিত্তিক, তাদের অর্থায়নেই এটি পরিচালিত হয়। আর অভিবাসী কিউবাবিশারদেরা বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এটি পরিচালনা করে, তারা এভাবে নিজেদের স্টাইল তৈরি করেছে। তারা হাভানার ব্যাপারে অত্যন্ত বৈরী।[৫] ১৯৭০-এর দশক থেকে এ ক্ষেত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা হচ্ছেন পিট্‌সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমেলো মেসা লাগো, তাঁকে 'দ্য ডিন অব কিউবান স্টাডিজ' অভিধা দেওয়া হয়েছে। তাঁর ৩০টির বেশি বই আছে। তাঁর অনেক বইয়ের সহলেখক হচ্ছেন ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব লেবারের পরিচালক জর্জ পেরেজ-লোপেজ, তিনিও এই কাতারে আছেন। তিনি নাফটার একজন নেতৃস্থানীয় মধ্যস্থতাকারী, দীর্ঘদিন ধরে তিনি অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য স্টাডি অব দ্য কিউবান ইকোনমির প্রধান। মিয়ামি থেকে প্রকাশিত এএসসিইর বার্ষিক প্রকাশনা *কিউবা ইন ট্রানজিশন*-এ কিউবার অর্থনীতিকে পুঁজিবাদী পথে আনার লক্ষ্যে বেশ কিছু পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়েছে। জার্নালের শিরোনাম থেকে বোঝা যায়, কিউবাবিশারদেরা 'ক্রান্তিকালের অর্থনীতির' ধারণার আলোকে কাজ করেন। উন্নয়ন অর্থনীতির শাখা হিসেবে ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে এটি গড়ে ওঠে। এর লক্ষ্য ছিল সাবেক কমিকন দেশগুলোতে পশ্চিমা পুঁজির অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। এই মডেল আবার পরিণামে ওয়াশিংটন মতৈক্য কাঠামোর আলোকে প্রণীত হয়েছিল। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ ১৯৮০-এর দশকে ঋণগ্রস্ত লাতিন আমেরিকার দেশগুলোতে যে সংস্কার চাপিয়ে দিয়েছিল, সেটাকে কেন্দ্র করেই এই মডেল দানা বেঁধে উঠেছিল।[৬] এর নীতি পরামর্শের মূল কথা ছিল এ রকম: অর্থনীতিতে বৈশ্বিক পুঁজির অনুপ্রবেশ নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ বেসরকারি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া, মজুরি ও মূল্য নির্ধারণ-সংক্রান্ত আইন শিথিল ও সামাজিক ব্যয় কমানো। পূর্ব ও কেন্দ্রীয় ইউরোপ ও সাবেক সোভিয়েত ব্লকের অনেক জায়গায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, ইবিআরডি, ইউএসএইড ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের টেকনোক্র্যাটরা। এ ক্ষেত্রে পুরোধাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জানোস কোরনাইয়ের স্পষ্টত হাইয়েকিয়ান 'দ্য রোড টু আ ফ্রি ইকোনমি' (১৯৯০)। কয়েক বছরের মধ্যে এক ফুলে-ফেঁপে ওঠা 'উত্তরণ' শিল্প গড়ে ওঠে। এই শিল্প স্বতঃসিদ্ধরূপে ধরে নেয় যে অনুসরণ করার মতো একটি পথই আছে—পরিকল্পিত রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে মুক্তবাজারের পুঁজিবাদ। এটা আটকানোর চেষ্টা শুধু নিষ্ফলই হবে না, তার মূল্যও হবে অনেক। কারণ, আংশিক সংস্কার করতে গেলে তা অনিবার্যভাবেই ব্যর্থ হবে।[৭] 'উত্তরণশীল দেশগুলো' ১৯৯০-এর পর যখন মন্দার মুখে পড়ল, তখন

সেই প্রতিবন্ধকতার দায় রাজনৈতিক অভিজাতদের ঘাড়ে চাপানো হয়। 'স্পিড ও স্কেল' ছিল এর মূল, সেই সময়ের 'অসাধারণ রাজনীতির' সুযোগ নেওয়া জরুরি ছিল।[৮]

এদিকে ১৯৯০-এর দশকের শেষের দিকে এসে কিছু কারণে 'উত্তরণ'বিষয়ক গোঁড়ামিতে পরিবর্তন আসে। প্রথমত, সাবেক সোভিয়েত ব্লকের বিভিন্ন দেশের পশ্চিমমুখী সরকারগুলো সে সময় কিছুটা স্থিতিশীলতা অর্জন করে। ফলে রাজনৈতিক অপরিহার্যতার ব্যাপারটি থিতিয়ে আসে। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেওয়া সাবেক কমিকন অর্থনীতির দেশগুলোর সঙ্গে চীনের রাষ্ট্রপরিচালিত উন্নয়ন, নব্য শিল্পায়িত ও পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যকার পার্থক্য এত বেশি ছিল যে তা কোনোভাবেই এড়ানো সম্ভব ছিল না। আবার ওদিকে লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার দেশগুলোর কাঠামোগত সংস্কার ব্যর্থ হয়েছিল। বিকাশমান পোস্ট ওয়াশিংটন কনসেনসাসে (পিডব্লিউসি) প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও 'সুশাসনের' ওপর জোর দেওয়া হয়। উত্তরণবাদী অর্থনীতিবিদেরা এই পালাবদল ঘটাতে গিয়ে উন্নয়নবাদী অর্থনীতিবিদদের চেয়ে পিছিয়ে পড়েন। কিন্তু নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে প্রভাবশালী পাঠ্যবইগুলোতে এই অনুমান ও প্রকৃত ফলাফলের মধ্যকার পার্থক্য স্বীকার করে নেওয়া হয়, ফলে 'দর্পচূর্ণ' হয়। উত্তরণ পাঠগুলো নিজেদের পিডব্লিউসি গড়ে তোলে।[৯] কিন্তু সংস্কারের গতিতে জোর কম দেওয়া হলেও 'উত্তরণের অগ্রগতিকেই' অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর সব সমস্যার দায় চাপানো হয় অযথাযথ উদারীকরণের ওপর।

মূলধারার কিউবাবিদ্যা মূলত ওয়াশিংটন মডেলের ভিত্তিতে প্রণীত। এই ঘরানার ভাষ্য হচ্ছে, কিউবার বাজারবিরোধী নীতির কারণেই ১৯৯০-৯৩ সালে সেখানে গভীর মন্দা সৃষ্টি হয়েছিল, বাইরের কারণগুলোকে তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আংশিক সংস্কারের সমালোচনা হিসেবে মেসা লাগো ১৯৯৪ সালের কিউবার পদক্ষেপকে 'আধাখেঁচড়া' ও 'অপরিপক্ব' আখ্যা দিয়ে আক্রমণ করেন।[১০] কিউবার নীতির প্রচলিত ব্যাখ্যা খুবই সরল, এটা প্রেসিডেন্টের 'কট্টর গোঁড়ামির' ফসল। এর সঙ্গে আছে তাঁর 'বাজার সংস্কারে অনীহা', বিরোধীদের দমনের অভিপ্রায় ও পুরো জাতিকে সঙ্গে নেওয়ার ইচ্ছা। কয়েকজন ভাষ্যকার এই দোষটা আরও ছড়িয়ে দিলেন: রুবেন বেরিওস বৃদ্ধ নেতা ও কট্টর আমলাতন্ত্রের তীব্র নিন্দা করেন, যারা পুরোনো অভ্যাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়। মরিসিও ডি মিরান্ডা বললেন, তিনি পুরো শাসক মহলের মধ্যেই সংস্কারের মধ্যে অনীহা দেখেন।[১১] 'উত্তরণ' নীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণে কিউবার অর্থনীতি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বা সম্প্রতি সে কারণে দেশটি ভেনেজুয়েলার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে।

হাভানার দৃষ্টিভঙ্গি

সাবেক কমিকন দেশগুলোর চেয়ে কিউবা ভিন্ন দুটি জায়গায়, পিট্‌সবার্গ-মিয়ামি অক্ষ এই বিষয় দুটিকে এড়িয়ে যেতে চায়। প্রথমটি হচ্ছে, প্রাক-কমিউনিজম যুগের চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা এবং এর সঙ্গে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত তারা স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে যে অগ্রগতি অর্জন করেছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে দেশটির মুক্তবাজার অভিমুখে সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণের তেমন আগ্রহ নেই। দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে, মধ্য ইউরোপের ক্ষেত্রে 'উত্তরণ' ব্যাপারটা জাতীয়তাবাদী আবেগের বশে রাশিয়ার আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার ব্যাপার। আর রাশিয়া মনে করে, এটা ঐতিহাসিক শত্রু যুক্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে তাদের জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি। এই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কিউবার অর্থনীতিবিদ ও নীতিপ্রণেতারা কাজ করছেন।[১২] উপদেষ্টা ও কর্মকর্তারা 'উত্তরণের' পরিপ্রেক্ষিতে কথা বলেন না, তাঁরা 'সমন্বয়ের' কথা বলেন। বহিঃস্থ পরিবেশের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক মানদণ্ডের আলোকে তাঁরা এই অবস্থান নেন। অর্থাৎ সংস্কার কর্মসূচি প্রত্যাখ্যানের পেছনে আদর্শ-অনুপ্রেরণার যে কথা কিউবাবিশারদেরা বলে থাকেন, সে তুলনায় এটা ইঙ্গিত দেয়, নীতিকাঠামো নমনীয়। এই কাঠামো কট্টর কিছু নয়। অর্থনীতিবিদ ও নীতিপ্রণেতারা একইভাবে প্রিনসিপিওর আলোকে এই মানদণ্ডের কথা বলে থাকেন। তাঁরা মার্ক্সবাদী, লেনিনবাদী গোঁড়ামি বা 'পার্টি লাইনে' কাজ করেন না। এই নীতি ব্যতিক্রমহীনভাবে জাতীয় সার্বভৌমত্ব উর্ধ্বে তুলে ধরার কথা বলে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক সমতা ও পূর্ণ কর্মসংস্থানের সফলতা ধরে রাখতে চায় এটা। কখনো কখনো সেটাকে লোস লোগরোস বলা হয়। এই নীতি 'বিপ্লবী নৈতিকতা' ধরে রাখার কথাও বলে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই নীতি দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেয়, জাঁকজমক অগ্রাহ্য করে।[১৩] এই তত্ত্ব নীতি স্বাধীনতার ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে।

অর্থনৈতিক নীতিবিষয়ক অভ্যন্তরীণ যে বিতর্ক রয়েছে, তা বিদেশি পর্যবেক্ষকদের চোখে ধরা পড়ে না বললেই চলে। মার্কিনভিত্তিক কিউবাবিশারদেরাও এর বাইরে নয়। এর আংশিক কারণ হচ্ছে, কিউবার বন্ধ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও গণমাধ্যমের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ। ফলে অনেক বিদেশি ভাষ্যকারই গুজবের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। যুক্তরাষ্ট্রে যে খবর পৌঁছায়, তার বেশির ভাগই আসে বিদ্রোহী গ্রুপগুলোর কাছ থেকে। এগুলোতে টাকা দেয় হয় প্রবাসী সংগঠনগুলো, না হয় মার্কিন কর্মসূচিগুলো। ফলে এদের সবার মধ্যে মতৈক্যের পূর্বকল্পনা সৃষ্টি হয়। আলোচনা, নীতি প্রণয়ন ও অভিযোজনের ব্যাপারটি বাইরের মানুষদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেখানে নেতাদের ইচ্ছা সব সময় বিরাজ করে না। পোডার পপুলার কাঠামোর আলোয় একই সঙ্গে আশপাশে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে

একের পর এক বৈঠক হয়েছে, সেখানে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে নিরন্তর বিতর্ক হয়েছে, যা নীতি আলোচনার রসদ জুগিয়েছে।

অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেন্ত্রো দে এসতুদিওস দে লা ইকোমিয়া কিউবানা (সিইইসি), সেন্ত্রো দে ইনভেস্টিগেশনস সোব্রা লা ইকোনমিয়া ইন্টারন্যাশনাল (সিআইইসি), দ্য ইনস্টিটিউটো ন্যাশনাল দে ইনভেস্টিগেশনস ইকোনমিকাস (আইএসআইই) প্রভৃতির অর্থনীতিবিদেরা ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সেন্ত্রো দ্য এসতুদিয়াস দে লা আমেরিকাস (সিইএ) নীতিপ্রণেতাদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করেছেন। তাঁরা বিরাজমান ব্যবস্থার দুর্বলতা নিয়ে আলোচনা করেছেন, তার দাওয়াই বের করতে নানা তর্ক-বিতর্ক করেছেন। হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমের প্রতিষ্ঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ সমাজতন্ত্রের নানা মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে, কিউবায় তার প্রয়োগ কীভাবে হবে তা নিয়ে কাজ করেছে। অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রের সমস্যা ও উদ্যোক্তা ব্যবস্থাপনার সংস্কার আর সোভিয়েত ব্লক পতনের রাজনৈতিক ও দার্শনিক তাৎপর্য কী—এসব নিয়েও কাজ করেছে তারা। সিআইএর ইকোনমিয়া কিউবানা: বোলেতিন ইনফরমেটিভো, আইএনআইইর কিউবা: ইনভেস্টিগেশন ইকোনমিকায় প্রকাশিত তাদের লেখা পত্রে আনুষ্ঠানিক বক্তব্যই অনুসরণ করা হয়েছে। ফলে বাইরের পর্যবেক্ষকদের কাছে এর মাজেজা দুর্বোধ্য হয়ে যায়। নানা রকম ঐতিহাসিক বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টি হারিয়ে যায়। থাকে শুধু নেতাদের বক্তৃতার উদ্ধৃতি ও অর্জনের প্রশংসাস্তবক। শব্দভান্ডারও অপরিচিত, আইএমএফের পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার না করে কিউবার অর্থনীতিবিদেরা 'অভিযোজন', 'আধুনিকায়ন', 'বাজারের কার্যসাধনপদ্ধতি', নির্ধারিত মূল্যের 'সমন্বয়', 'বিকেন্দ্রীকরণ' পদক্ষেপ ও 'উত্থানশীল' অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া প্রভৃতি শব্দবন্ধ ব্যবহার করে। কিউবাবিশারদদের ট্রানজিশন অর বাস্ট স্পেকটেকল পড়ুন, এটা কোনো বিতর্কের সৃষ্টি করে না। আর এতে তাদের এই সন্দেহ আরও পোক্ত হয় যে নীতি পুরোপুরিভাবে প্রেসিডেন্টের ইচ্ছায় নির্ধারিত হয়।[১৪]

ওদিকে মূল ধারাভাষ্যের বাইরে এই দ্বীপরাষ্ট্রবিষয়ক নানা ভাষ্য রয়েছে। সেখানে তিন ধরনের মনোভঙ্গি লক্ষ করা যায়। প্রথম ঘরানাটি শাসনব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতিশীল ও আত্মপক্ষ সমর্থনকারী, তারা কিউবাবিশারদদের নেতিবাচক প্রচারণার বিরোধিতা করে ও কিউবার বাস্তবতাকে রং পলিশ করে প্রকাশ করে। এই মতৈক্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে তারা প্রস্তাবটি পেশ করে পুঁজিবাদে উত্তরণ ও তার বিরোধিতার মধ্যকার বিকল্প হিসেবে পেশ করে। তারা এর প্রথম ব্যাপারটি উদ্‌যাপন করে আর বাজার খুলে দেওয়ার ব্যাপারটি 'অনিবার্যের কাছে আত্মসমর্পণ' হিসেবে বিলাপ করে থাকে।[১৫] দ্বিতীয় দলটিকে সমালোচনামূলক বন্ধু

হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়। তারা কিউবার নীতিপ্রণেতাদের ব্যাপারে ইতিবাচক আর দেশটি যে সমস্যার মুখোমুখি হয়, সেটা তারা স্বীকার করতে রাজি। কিন্তু আবার কিউবাবিশারদদের মতো তারা 'উত্তরণের' অগ্রগতিকে অর্থনৈতিক পারফরম্যান্সের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। তাদের মত হচ্ছে, কিউবার দুর্দশার কারণ হলো 'ক্রমানুসারী পরিবর্তনের' অভাব।[১৬] শেষমেশ, খুব কম সংখ্যক অর্থনীতিবিদ কিউবার উন্নয়নকে নিজেদের মতো করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতে কোনো রকম পরম কারণের পূর্বানুমান ছাড়াই। এসব তদন্তের ভিত্তিতে হোসে মার্চ-পৌকেট বলেছেন, কিউবার অর্থনৈতিক নীতি ওসব 'উত্তরণ' দেশগুলোর জন্য বিকল্প হিসেবে হাজির করা যেতে পারে, যেটা চারিত্রিকভাবে বিবর্তনমূলক ও পরীক্ষামূলক। ভিয়েতনাম, চীন ও কেন্দ্রীয় ইউরোপের অর্থনীতির সঙ্গে তুলনা করে চার্লস ব্রুনডেনিয়াসের পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্ত হচ্ছে, এর ফলে 'কিউবার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসমেত বাজার অর্থনীতি' সৃষ্টি হতে পারে।[১৭]

কিউবার গতিপথ ও 'উত্তরণ' অর্থনীতিবিষয়ক মূলধারার ভাষ্যের মধ্যকার অন্তর্নিহিত তুলনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, প্রকৃত তুলনামূলক পাঠ খুবই বিরল। যথোপযুক্ত সংখ্যক তথ্য চিহ্নিত করার সমস্যা থেকে এর উদ্ভব হতে পারে। কিন্তু এতে আবার বোঝা যায়, কিউবাবিশারদেরা শুধু নিজেদের দেশেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে চান।[১৮] একই সঙ্গে মূলধারার উত্তরণ অর্থনীতিবিদেরা কেন্দ্রীয় ও পূর্ব ইউরোপ, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন অথবা রাশিয়া-চীনের বৈপরীত্যে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে চান। এঁরা ব্যাপক হারে তুলনামূলক কাঠামো ব্যবহার করেন। কিউবার নিজস্ব পথ এতে যে আলো ফেলতে পারে, সেটা তাঁরা উপেক্ষা করেন। এরপর যা আসবে বিশ্লেষণী আখ্যান, তুলনামূলক পাঠের পরিপ্রেক্ষিতে কিউবার সমন্বয়নীতির সুলুক সন্ধান। এর পরিসর হবে শুরুর দিকের সংকট ব্যবস্থাপনা থেকে স্থিতিশীলতা অর্জন, পুনঃকাঠামো ও রাউল কাস্ত্রোর অধীনে সবচেয়ে সাম্প্রতিক সংস্কার পর্যন্ত।[১৯]

এটা শুধু বিদ্যমান ব্যাখ্যার সমস্যাগুলো তুলে ধরতে চায় না, বরং কিউবার পথ কী হবে সে-বিষয়ক ফলপ্রসূ আলোচনায়ও ভূমিকা রাখতে চায়। আর বিশ্বায়িত দুনিয়ায় নতুন করে বিকল্প উন্নয়ন কৌশল-সংক্রান্ত প্রশ্নেরও অবতারণা করতে চায়।

১. সংকট ব্যবস্থাপনা

সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙে গেলে এ ব্লকভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে অরক্ষিত হয়ে পড়ে কিউবা। ১৯৭০ সালে একরকম বাধ্য হয়েই কমিকনের সঙ্গে সম্পর্কিত হয় কিউবা। এর কারণ ছিল মার্কিন অবরোধ, ১৯৬২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট

কেনেডি যা আরোপ করেন। আগের বছরের সিআইএ-সমর্থিত সামরিক আগ্রাসনের ব্যর্থতাই ছিল এই নিষেধাজ্ঞার কারণ। ফলে কিউবা বৈদেশিক বাণিজ্যে এক পুরোনো বন্ধুকে হারিয়ে ফেলে। এতে করে সত্তর ও আশির দশকে কিউবা বাণিজ্য ও বিনিয়োগের জন্য ব্যাপক মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর। কিউবার অর্থনীতিও চরমভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে চিনি রপ্তানির ওপর। চিনি রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পাচ্ছিল কিউবা। চিনিতে তার পাউন্ডপ্রতি আয় হচ্ছিল শূন্য দশমিক ৪২ ডলার করে, যেখানে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম ছিল পাউন্ডে শূন্য দশমিক ০৯ ডলার। কিউবায় জিডিপির ৪০ শতাংশই খরচ হচ্ছিল আমদানির পেছনে। কিউবাকে রাষ্ট্রের মোট খাদ্য সরবরাহের ৫০ শতাংশ আর কৃষি ও উৎপাদন খাতের জন্য প্রয়োজনীয় তেল ও কাঁচামালের ৯০ শতাংশই আমদানি করতে হচ্ছিল। এ ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়া কিউবাকে সহজ শর্তে তিন বিলিয়ন ডলার করে ভর্তুকি দিচ্ছিল। ১৯৯০ সালের জানুয়ারিতে কমিকনের সঙ্গে করা চুক্তিগুলোকে কিউবা হার্ড কারেন্সি বাণিজ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলে ১৯৯১ সালের মধ্যেই সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে তাদের সব ধরনের দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ভেঙে যায়।[২০] বাইরে থেকে খাদ্য, জ্বালানি আর কাঁচামাল আসা বন্ধ হয়ে যায়। রপ্তানি আয়, বৈদেশিক সাহায্য আর আমদানি সক্ষমতার তুলনামূলক উপাত্তগুলো দেখলেই বোঝা যায়, বাইরের চাপের মাত্রা কত তীব্র ছিল।

রপ্তানি আয়ে কিউবা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, এত দিন পর্যন্ত তারা বিশেষ লাভজনক দামে চিনি বিক্রি করে আসছিল, আর এই চিনি কোনোভাবে অন্য কোনো বাণিজ্য সহায়ক রাষ্ট্রে রপ্তানির সুযোগও ছিল খুব কম। সাবেক কমিকনভুক্ত প্রায় সব দেশই ১৯৯৩ সালের মধ্যেই রপ্তানি আয়ে ১৯৯০ সালের পর্যায়ে চলে যায়। এদিক থেকে কিউবা প্রায় ৭৯ শতাংশ পিছিয়ে ছিল। আয়ের অঙ্কটা ৫ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে একেবারে ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছিল। বৈদেশিক বিনিয়োগেও হাভানা খুব বাজেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সব বৈদেশিক সাহায্যের আচমকা হাওয়া হয়ে যাওয়া আর নতুন নতুন বিনিয়োগ ক্ষেত্রের অভাব—এই দুইয়ে মিলে অর্থনৈতিক ধাক্কার তীব্রতা একদম চরমে চলে যায়। এই 'ক্রান্তিকালীন' সময়ে যখন অন্য দেশগুলো আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক আর ইবিআরডির মতো প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাচ্ছিল, তখন মার্কিন হস্তক্ষেপে এসব থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল কিউবা। এক হিসাবে দেখা গেছে, ১৯৯১-৯৬ সালে 'ক্রান্তিকালীন/পরিবর্তনমূলক' অর্থনীতির জন্য বাকিরা যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে ঋণ পাচ্ছিল মাথাপিছু ১১২ ডলার, সেখানে কিউবার হাতে আসছিল মাত্র ২৬ ডলার করে।[২১] হাভানাকে কোনো তৃতীয় দেশ যেন ঋণ না দেয়,

সে লক্ষ্যে মার্কিন ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোল অফিস অন্যদের ভীতি দেখিয়ে নিরস্ত করে। ফলে কিউবার এই সংকটকালে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সুযোগ খুবই সীমিত হয়ে পড়ে।

রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক ঋণে ধস নামার ফলে কিউবার আমদানি সক্ষমতা ব্যাপক মাত্রায় কমে যায়। কমিকন থেকে বাদ পড়া আর কোনো দেশেই এমনটা দেখা যায়নি। ১৯৯০-১৯৯৩-এর মধ্যে কিউবার আমদানি খরচ ৭০ শতাংশ কমে যাওয়ায় দেশটির আমদানি-জিডিপি অনুপাত কমে দাঁড়ায় ১৫ শতাংশ। ইবিআরডির হিসাব অনুসারে, এটি খুবই কম। ১৯৯৩ সাল নাগাদ রাষ্ট্রের সব আমদানির চাহিদা মেটানোর জন্য কিউবার কাছে মজুত অর্থের পরিমাণ ছিল খুব কম। ১৯৯০ সালে কেবল জ্বালানি আর খাদ্য আমদানিতে যত ব্যয় হয়েছিল, এটা ছিল তার চেয়েও কম! এদিকে মার্কিন বাধার কারণে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের হারকেও আগের মতো বাড়ানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল। আমেরিকার এই বাধার কারণে কিউবার জন্য শুধু আমেরিকার বাজারই বন্ধ হয়ে যায়নি, বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকে ঋণ কিংবা উন্নয়ন-সহায়তা লাভ করাও কঠিন হয়ে পড়েছিল। বাণিজ্যিক বিনিয়োগের নিশ্চয়তা পাওয়া খুবই ব্যয়বহুল ও কঠিন হয়ে ওঠে। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার ক্ষেত্রে কিউবাকে সাবেক কমিকনভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি অভাবে পড়তে হয়। ফলে আটকে যায় বিনিয়োগ ও উন্নতি। এতে বাণিজ্য চুক্তির কোনো শর্তে একটু পরিবর্তন হলেই কিংবা কৃষিজ ফলনে সামান্যতম হেরফের ঘটলেই একেবারে নাজুক হয়ে পড়েছিল দেশটি।

জরুরি পদক্ষেপসমূহ

কিউবাবিশারদেরা মনে করেন, কমিকন পতন-পরবর্তী ব্যাপক বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও নিজের পথে চলার কারণেই ১৯৯০-৯৩ সালে কিউবার অর্থনৈতিক সংকোচন ঘটে। তাদের কাছে মনে হয়েছে অর্থনৈতিক নীতিতে পরিবর্তন অথবা অনমনীয় থাকা—এর যেকোনো একটি পথ বেছে নিতে হবে। ১৯৯০ সালের পর দেশটি যে রাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে, তা প্রকৃতপক্ষে ১৯৮৬ সালের 'বাজার বিমুখী' সংশোধনবাদী কৌশলেরই একধরনের সম্প্রসারণ। যেখানে দুর্নীতিবিরোধী তৎপরতা, কৃষিবাজার নিয়ন্ত্রণসহ পর্যটন ও নানা রকম যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগের মতো বেশ কিছু পদক্ষেপ হাতে নেওয়া হয়। সব কমিকনভুক্ত দেশই ১৯৮০ সালের অর্থনৈতিক মন্দা থেকে বাঁচতে এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। এরপরও এমন চূড়ান্ত অর্থনৈতিক সন্ধিক্ষণে যথার্থ পদক্ষেপ নিতে হাভানা ব্যর্থ হয়েছে বলে অভিযোগ আছে।[২২] কিন্তু ১৯৯০-৯১ সালে বহির্বিশ্বের কাছে এমন ধাক্কা খেয়ে

কিউবার সরকার যে কিছুই করেনি, ব্যাপারটা এমন নয়। দ্রুত ফুরোতে থাকা সম্পদকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রাধান্যে পরিণত করার জন্য বেশ কিছু জরুরি পদক্ষেপ হাতে নেওয়া হয়। আসলে এই ধাক্কার তীব্রতায় পদ্ধতিগুলোতে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাঁচামাল আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সব অর্থনৈতিক পরিকল্পনা স্থবির হয়ে যায়। কমিকনভুক্ত অন্যান্য সহযোগী দেশ যখন উদার নীতি ও বেসরকারীকরণের দিকে এগোচ্ছিল, কিউবা তখন তার টিকে থাকা প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামোগুলো রক্ষা করে সেগুলোকে আরও সামনে নিয়ে যাচ্ছিল। এগুলোর মধ্যে শুধু কল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল না, দর নিয়ন্ত্রণ, একচেটিয়াভাবে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন নিয়ন্ত্রণ ও উৎপাদনমাধ্যমগুলোর জাতীয়করণ ছাড়াও ছিল সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালিত কিছু গণ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করা ও একটি পদ্ধতিগত নীতির প্রতিক্রিয়া, যা জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ আর আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে একটা লাভজনক প্রথা আকারে কিউবায় দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছিল।

ফিদেল কাস্ত্রোর কাছে এই সংকটকাল ছিল 'শান্তির এক বিশেষ কাল'। বহির্বিশ্বের পর্যবেক্ষকদের কাছে মনে হয়েছে, এটা স্রেফ সুভাষণ। কিন্তু এই শব্দগুলোর অর্থ কিউবার সবাই বুঝে যায়: দুর্যোগের সময়ে ও মার্কিন হামলা মোকাবিলা করার জন্য প্রতিষ্ঠিত নাগরিক প্রতিরক্ষার প্রক্রিয়া। ১৯৯০ সালে অর্থনৈতিক প্রতিরক্ষার অংশ হিসেবে কারখানা, অফিস, আবাসিক ঘরবাড়ি, স্কুল আর হাসপাতালে অল্প সময়ের জন্য বিদ্যুৎ আর পানির সংযোগ বন্ধ করে দেওয়া হতো, যাতে জরুরি অবস্থার সময় খাপ খাওয়ানো যায়। সব প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সিতে অনুসৃত এই সামগ্রিক সমন্বয় অনেকটা হারিকেনের পূর্বপ্রস্তুতি ও সামরিক প্রতিরক্ষা অনুশীলনের মতোই। ১৯৯১ সালে গৃহীত খাদ্য কর্মসূচিতেও এই একই ধরনের উদ্দীপনা লক্ষ করা যায়। সেবার, খাদ্য উৎপাদন-প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার জন্য কৃষক ও শহরবাসী—সবার প্রতিই আহ্বান জানানো হয়েছিল। পুরোনো যন্ত্রপাতি নবায়ন করে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে একইভাবে যন্ত্রপাতি আমদানির বিকল্প হিসেবে অতিরিক্ত কলকবজা ফোরাম বানানো হয়। এরপর ১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে নেওয়া হয় জ্বালানি পরিকল্পনা, যেখানে আবাসিক, উদ্যোক্তা আর স্থানীয় কর্তৃপক্ষ—সবাই মিলে জ্বালানির ব্যবহার কমিয়ে আনার রাস্তা বের করে।

পরিবর্তনমূলক/ক্রান্তিকালীন অর্থনীতির মধ্য দিয়ে যাওয়া দেশগুলো থেকে একটি জায়গায় পুরোপুরি বিপরীত অবস্থানে দেখা যায় কিউবাকে। ১৯৯০ সালের শুরুর দিকে এসব জায়গায় যখন বেকার সমস্যা ২০ শতাংশে পৌঁছে, কিউবা তখনো কর্মসংস্থান আর সমাজকল্যাণ বজায় রাখার ও সব মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত

করার চেষ্টা করে যাচ্ছিল[২৩]। কিউবাতে, যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে শতকরা ৯৮ ভাগ কর্মীর নিয়োগকর্তা হচ্ছে সরকার, সেখানে কর্মসংস্থানের সংখ্যা ১৯৯০-৯৩-এ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪০ হাজার; কিউবার অর্থনীতি এক-তৃতীয়াংশ কমে যাওয়ার পরও। সরকারি হিসাবে বেকারত্বের হার ৫ দশমিক ৪ শতাংশ থেকে কমে ৪ দশমিক ৩ শতাংশে নেমে আসে।[২৪] এ সময় রাষ্ট্র বিনিয়োগ প্রকল্পগুলো বাতিল করে, জ্বালানি বণ্টন কমায়, গণপরিবহন কমিয়ে আনে, সাপ্তাহিক কর্মদিবস কমিয়ে দেয় (৫.৫ দিন থেকে ৫ দিন)। এমনকি তারা অনেক কারখানাই বন্ধ করে দেয়, আর চালালেও একেবারেই অল্প সময়ের জন্য তা খোলা রাখে। ১৯৯১ সালের এপ্রিলে শ্রম ও সামাজিক নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে ডিক্রি জারি করে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। এই ডিক্রিতে শর্ত দেওয়া হয়, কাঁচামালের অভাবে যেসব কর্মীকে বসিয়ে রাখা হয়েছিল, তাদের পুনরায় কাজে ফিরিয়ে আনার আগ পর্যন্ত আগের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ দেওয়া হবে। শ্রমিকদের মৌলিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে যে অতিরিক্ত টাকা ব্যয় হতো, বেকার ভাতার তুলনায় তা ছিল তুলনামূলকভাবে কম।

১৯৯০ সালের প্রথম দিকে চরম অভাব সত্ত্বেও খাদ্যের মৌলিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছিল। একোপিও নামের সরকারি বিতরণ সংস্থা কিউবার খামার ও আমদানি গুদাম থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত। এসব খাদ্য তারা খাদ্য রেশনিং পদ্ধতিসহ অন্যান্য মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিত। ভিয়াস সোসিয়াল্যাসের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে, স্কুলে ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে বিনা মূল্যে কিংবা ভর্তুকিতে খাবার সরবরাহ করা হতো। রেশনিং পদ্ধতিতে নির্ধারিত মূল্যের কারণেই খাদ্যের মৌলিক চাহিদা মেটানোর মাসিক মাথাপিছু খরচ ৪০ পেসো, মাথাপিছু মাসিক সর্বনিম্ন সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা ৮৫ পেসোর নিচে রাখা সম্ভব ছিল।[২৫] এই সংকটের শুরুর দিকেই রাষ্ট্র পরিচালিত যে দোকানগুলোতে বাজারমূল্যের কাছাকাছি দামে রেশনবহির্ভূত খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করা হতো, সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়।[২৬] এই খাদ্য প্রকল্প জমি চাষে পশু ব্যবহার, জৈবিক সার, জৈব কীটনাশকের ব্যবহার এবং প্রান্তীয় জমি চাষাবাদে স্থানীয়ভাবে স্বতঃপ্রণোদিত আর ছোট মাত্রার পরীক্ষামূলক কার্যক্রমে উৎসাহ দিয়েছে।[২৭]

বিকেন্দ্রীকরণ ও বিতর্ক

পরিস্থিতির পটপরিবর্তনের সঙ্গে এমনকি চরম জরুরি অবস্থাতেও কিউবা যেসব উপায়ে নিজেকে খাপ খাইয়েছে, তার সঙ্গে কিউবাবিশারদদের বর্ণিত কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের সম্পর্ক আসলে খুবই কম। এটি চূড়ান্ত পর্যায়ের এক কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। এর ভেতরে রেশনিং পদ্ধতিতে খাদ্য সরবরাহের মতো

ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীভূত হয়ে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। এ সময় ভিয়াস সোসিয়াল্যাসের মতো অন্য প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারাতে থাকে।[২৮] ফলে সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা স্থানীয় সরকারি এজেন্সিগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ রকম একটি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সিস্টেমা দে ভিজিল্যানসিয়া আলিমেনতারিয়া ই নিউট্রিশনাল (সিসভান), যারা পুষ্টির মান ও রেশনের অতিরিক্ত বণ্টন তদারক করত। তারা ইউনিসেফ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সহায়তায় মা ও শিশুদের সাহায্যের জন্য বিভিন্ন সহযোগিতামূলক নেটওয়ার্ক চালাত, যে স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের সমাজের সবচেয়ে কমজোর মানুষদের চেনে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই ১৯৯১ সালে গঠিত হয়েছিল কন্সেজোস পপুলারেস নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্ক ঝুঁকিপূর্ণ ঘরবাড়ি চিহ্নিতকরণ ও ত্রাণ প্রকল্পগুলোর প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় সাহায্য করত।[২৯] অর্থনীতির ওপর থেকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সাধারণভাবে কিছুটা শিথিল হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজকল্যাণ সংস্থাগুলোর এই রকমের অভিযোজন আর বিকেন্দ্রীকরণ ঘটতে থাকে। সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে উদ্যোক্তাদের ব্যবস্থাপকদের সমস্যার স্থানীয় সমাধান খুঁজে বের করতে হয়েছিল। অন্যদিকে এ সময়ে প্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করা বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাঁচামালের ওপর থেকে তাদের অতীতের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিতে শুরু করে, আর হাজার হাজার উদ্যোগের জন্য বাজার নিশ্চিত করে।[৩০]

গোটা আমেরিকা মহাদেশে একমাত্র 'অগণতান্ত্রিক' দেশ হিসেবে কিউবার বিপক্ষে প্রচারণা ছিল। যেসব গণসংগঠন কিউবায় অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিল, তাদের পক্ষে সেটা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ১৯৯০-পরবর্তী ঘটনাক্রম বুঝতে হলে এগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। তখন সংকটের নানা মুহূর্তে সারা দেশে বেশ কিছু জাতীয় বিতর্কের সূত্রপাত হয়। দেশব্যাপী নানা অধিবেশন আয়োজন করা হয়। এ রকম কিছুই সাবেক কমিকনভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে দেখা যায়নি। ১৯৯০-এ যখন সংকট আরও ঘনীভূত হচ্ছিল, সে সময়েই কিউবার কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ সম্মেলনের সব প্রস্তুতি শুরু হয়। অর্থনৈতিক সমস্যা যতই গভীর হচ্ছিল, সম্মেলনের আগে আলোচনার সুযোগ আরও বাড়ছিল। শুধু পিসিসির শাখাগুলোতেই না, এসব বিষয়ে কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে গণসংগঠনগুলোতেও হাজার হাজার বৈঠক হয়েছে।

কমিকন পুরোপুরি বিলোপ হওয়ার তিন মাসের মাথায় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলন থেকে অর্থনীতির জন্য ১৮টি পয়েন্ট-সংবলিত একটি প্রস্তাব তৈরি করা হয়। এটাই ছিল কিউবার নয়া কাঠামো নীতিবিষয়ক প্রথম পূর্ণাঙ্গ

আনুষ্ঠানিক বক্তব্য।[৩১] পশ্চিমা উপদেষ্টাদের সহযোগিতায় অন্য কমিকনভুক্ত দেশগুলো পরিবর্তনের নতুন নতুন যেসব প্রকল্প হাজির করেছিল, এই প্রস্তাব ছিল তাদের থেকে একেবারেই আলাদা। পিসিসির এই প্রস্তাব উদারীকরণের নীলনকশা ছিল না। এটা ছিল বিশেষ কিছু নীতি আর লক্ষ্যের একটা তালিকা। সময়সীমা কিংবা পর্যায়ক্রম সম্পর্কে এতে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। তবে কিউবাবিশারদেরা এই প্রস্তাবকে যেভাবে সরাসরি 'বাজারবিমুখ' বলেছেন তা বিভ্রান্তিকর। এই প্রস্তাবে রাষ্ট্রীয় মালিকানার সার্বিক কাঠামো বজায় রেখেই সার্বভৌমত্ব আর সামাজিক নিরাপত্তার মূলনীতিগুলোর প্রতি বারবার অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছিল। এটি ছিল উদারনীতি আর রাষ্ট্র পরিচালিত প্রচেষ্টার এক মিশ্রণ। 'পর্যটন উন্নয়ন', 'রপ্তানি বাড়ানো', 'আমদানি কমানো', 'বৈদেশিক বিনিয়োগের নতুন রাস্তা খোঁজা', 'রাষ্ট্রীয় ব্যয় আর অর্থ জোগান নিয়ন্ত্রণ' করার মতো বিষয়গুলো দেখে মনে হচ্ছিল কিউবা নতুন সৃষ্ট আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে আংশিকভাবে হলেও উদারনীতিরই পথ ধরেছিল। আবার 'খাদ্য প্রকল্প জারি রাখা', 'স্বাস্থ্য, শিক্ষা আর বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে অধিক প্রাধান্য প্রদান', 'গণকল্যাণের পরিকল্পনার কেন্দ্রীকরণ', 'বিপ্লবের অর্জন রক্ষা করার' মতো অন্য বিষয়গুলো থেকে বোঝা যায় রাষ্ট্রের ভূমিকার পরিসর কমেনি। পরবর্তী বছরে সাংবিধানিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে সামাজিক, রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক প্রাধান্যগুলোকে নিশ্চিত করা হয়েছিল। যদিও নীতিগত জায়গায় সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো তখনো অস্পষ্টই থেকে গিয়েছিল। উভয় নথিপত্রেই ভিন্নমত ধারণ করার মতো নমনীয় প্রচেষ্টার একটি অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নের চেষ্টা করা হয়েছে, যা তৈরি হয়েছিল জটিল নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কিউবার বাইরে এগুলোকে তেমন গুরুত্ব কেউ দেয়নি।[৩২] কেবল একজন মার্কিন গবেষককেই এগুলো খুব যত্নের সঙ্গে নথিভুক্ত করতে দেখা গিয়েছে।

ভারসাম্যহীনতা আর স্থিতিশীলতা

সংকটের সময় কিউবা যে প্রাথমিক পর্যায়ের নীতি গ্রহণ করেছিল, তার সামর্থ্য ও দুর্বলতা উভয়ই দেখা যায় রাজস্বের হিসাবনিকাশ থেকে। পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যেতে থাকা রাষ্ট্রগুলো যখন সরকারি ব্যয় সংকুচিত করে আনছিল, কিউবায় তখন এই ব্যয় কিছুটা বাড়তে দেখা যায়।[৩৩] ১৯৯০ সালে যেখানে এই ব্যয় ছিল ১৪ দশমিক ২ বিলিয়ন পেসো, ১৯৯১-৯৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় গড়ে ১৪ দশমিক ৫ বিলিয়ন পেসোতে। এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় স্বাস্থ্য এবং খাদ্য খাত। স্বাস্থ্য খাতে সরকারের বাড়তি খরচের (১৯ শতাংশ) ফলে চিকিৎসা খাতে কর্মী সংখ্যা বাড়ে ৪০ শতাংশ। ভর্তুকি বাড়ানোর (৮০ শতাংশ) ফলে ভর্তুকিনির্ভর খাদ্য

সরবরাহব্যবস্থা ভালোভাবেই রক্ষা করা সম্ভব হয়। প্রতিরক্ষা খাতে ১৯৮৯ ও ১৯৯৩ সালে প্রায় ৪৩ শতাংশ ব্যয় কমিয়ে অন্যান্য বিনিয়োগের হার প্রায় ৫০ শতাংশ কমিয়ে এনে এই বাড়তি ব্যয়ের কিছুটা ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। জিডিপি আর জাতীয় আয় কমে যাওয়ার কারণে রাজস্ব ঘাটতি ১৯৯৩ সাল নাগাদ ৩৪ শতাংশে পৌঁছায়, যা ১৯৯০ সালে জিডিপির ১০ শতাংশ ছিল।[৩৪] প্রাথমিকভাবেই জরুরি অবস্থায় সামষ্টিক অর্থনীতির ভারসাম্য রক্ষা করার বিষয়টি তেমন একটা প্রাধান্য পায়নি। সংকটের সময়ে যেসব সুবিধা পাওয়ার জন্য ভর্তুকির পেছনে অর্থ ব্যয় করা হয়েছিল, তা বেশ পরিষ্কারই ছিল। এই ব্যয় করা হয়েছে অর্থনৈতিক সংকোচন প্রশমিত করে বহির্বিশ্বের ধাক্কা সামলাতে আর সমাজকল্যাণের খরচ কমিয়ে আনার জন্য। যা হোক, এসব নীতি সুদূর ভবিষ্যতে সমস্যার পাহাড় তৈরি করছিল। বাইরের অর্থায়ন/বাণিজ্য/বিনিয়োগ এমনকি দেশীয় বিনিয়োগ/বাণিজ্যিক/আর্থিক বাজার না থাকায় এই ঘাটতির আঘাত পড়ে মুদ্রার ওপর, পুরোপুরি। ফলে টাকার মান ব্যাপক হারে কমে যায়। ১৯৯০ সালে কালোবাজারে যেখানে এক ডলারের দাম ছিল ৭ পেসো, সেখানে ১৯৯৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০০ পেসোতে।

মুদ্রার মান কমে যাওয়া সাবেক কমিকনভুক্ত দেশগুলোর জন্য নতুন বিষয় ছিল না। কিন্তু কিউবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রই যেহেতু নিজ নিয়ন্ত্রণে এই স্ফীতি চাপিয়ে দিয়েছিল, সেহেতু তুলনামূলক দ্রব্যমূল্য আর আয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ এক ধরন তৈরি হয়। অন্যান্য সাবেক কমিকনভুক্ত দেশে বেতন, মূল্য আর বিনিময় হারের উদারীকরণ মুদ্রার মূল্য পতন-স্ফীতি-মূলধন ঘাটতির মতো পাঁক থেকে তাদের রক্ষা করে। ফলে প্রকৃত পারিশ্রমিকের বেলায় বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষদের ক্ষেত্রে বিশাল ধস নামে। ফলত এসব দেশে প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য খুব জোর গতিতেই ছড়িয়ে পড়ছিল। কিউবাতে পেসোর মূল্যে যে ধস নামে, তা সীমাবদ্ধ ছিল অনিয়মিত/বেসরকারি/রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। কিন্তু নিয়মিত/আনুষ্ঠানিক রাষ্ট্র পরিচালিত অর্থনীতিতে প্রকৃত আয়ের অসাম্য সত্যিকার অর্থেই কমতে থাকে। কারণ, যাদের আয় ছিল অনেক বেশি, যারা আমদানি করা আর কালোবাজারের পণ্য ক্রয়ের সামর্থ্য রাখত, তাদের খুব চড়া দামে দ্রব্যমূল্য কিনতে হতো। কিন্তু উল্টো দিকে যাদের আয় ছিল সীমিত কিংবা যারা রাষ্ট্রের প্রদেয় ভাতার ওপর নির্ভরশীল ছিল এবং শুধু নির্ধারিত মূল্যের মৌলিক পণ্য কেনার সামর্থ্য রাখত, তাদের ক্ষেত্রে প্রথম দিকে জীবনযাত্রার ব্যয় তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল ছিল।

যা হোক, পেসোর মান কমে যাওয়ার কারণে যাদের কাছে ডলার ছিল আর যারা পেসোতে আয়ের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তাদের মধ্যে ব্যাপক বিভেদ সৃষ্টি

হয়। যত দিন যাচ্ছিল, সরকারি চাকুরেদের কাছে এই পার্থক্য ততই তীব্র হয়ে উঠছিল। বেসরকারি কালোবাজারি অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের আয় আর তাদের নিজেদের উপার্জনের মধ্যকার ফারাকে তারা চিন্তায় পড়ে যায়। তাই নানান জাগতিক উদ্দীপনা তাদের অনৈতিকতার পথে টানতে থাকে। যত দিন যাচ্ছিল, পেসোতে আয় করা কিউবানরা ততই দরিদ্র হয়ে পড়ছিল। তাদের অবস্থা কেবল আমেরিকায় প্রবাসে যাওয়া কিংবা দেশে আসা নতুন পর্যটকদের চেয়ে খারাপ ছিল না, কিউবার চোর আর শারীরকলাবিদদের চেয়েও খারাপ হয়ে যায়। এভাবে ডলারের বিপরীতে পেসোর বাজারমূল্য কমতে থাকায় কিউবার জাতীয় মর্যাদা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঐক্য আর দুর্ভোগ ভাগাভাগির রাষ্ট্রীয় আহ্বান আর নিত্যদিনের দারিদ্র্যের কারণে বৈষম্যের মধ্যেও যে ফারাক ছিল, সেটাও ক্রমে বাড়তে থাকে। বাকিদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা হ্রাস পায়। কারণ, যারা আগে কালোবাজারের ভেতরে যেতেই চায়নি, এমনকি সেখান থেকে আসা পণ্য পর্যন্ত বর্জন করেছিল, তারাও নিজেদের বদলাতে বাধ্য হয়। তাদের এই অনিচ্ছাকৃত অংশগ্রহণ ছিল তাদের চিন্তা-চেতনার পরিপন্থী। তারা যে ভাষায় কৈফিয়ত দিত, সেই ভাষাতেই তাদের অনিচ্ছা প্রতিফলিত হয়।[৩৫] সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই দ্বৈত ব্যবস্থা ছোটখাটো চুরিচামারি, ফাঁকিবাজি আর দুর্নীতির চাপ বাড়িয়ে দেয়, কর্ম-উদ্দীপনা এবং সামাজিক সংহতিকে ধীরে ধীরে খেয়ে ফেলে আর রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিকে শুকিয়ে ফেলতে থাকে।

১৯৯৩-৯৪ সালে জরুরি ভিত্তিতে অর্থব্যবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসায় তীব্র সামাজিক, অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়। খাদ্য সরবরাহ প্রকল্পও তখন চরম আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে পড়েছিল। ফলে রাষ্ট্রের ভিত্তি নড়ে যায়। রাজধানী হাভানায় এক ভয়ংকর দাঙ্গা লাগার মতো আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। তবু লোস লোগ্রোসকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা হিসেবে অন্যান্য সাবেক কমিকন দেশের মতো পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ত্বরিত সমাধান প্যাকেজ হাতে নেয়নি কিউবা। পেসোর মান কমে যাওয়ার পেছনে সরকারের এই গোঁড়ামিকেই দায়ী করেছিলেন কিউবাবিশারদেরা। সরকার সমস্যা দেখেও না দেখার ভান করছিল বলেও তারা দাবি করে। যদিও সরকার এই সমস্যাকে কখনোই অস্বীকার করেনি। এই সংকটকে মূল্যস্ফীতির সমস্যা বলে স্বীকার করলে প্রকৃত ক্ষতির পরিমাণ জানা যেত। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সরকারকে সেটা সামাল দিতে হচ্ছিল। তাই এটাকে স্ফীতিজনিত সমস্যা না বলে সরকার একে 'ঘাটতিজনিত' সমস্যা বলে প্রচার করা শুরু করে। কিন্তু ১৯৯৩ সালে সংকট যখন সবচেয়ে বেশি ঘনীভূত হয়, তখন কিছু রেমিট্যান্সভোগী কর্মকর্তা ছাড়া আর সবাই যখন এই ভোগান্তিতে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন, তখন আর কষ্ট করে কাউকে সমস্যা চিহ্নিত করে দিতে

হচ্ছিল না। রাষ্ট্রনীতির ওপর আসতে থাকা ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ সামাল দিতে অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের ঘাম ঝরা শুরু করে।[৩৬] ফলে ১৯৯৩-৯৪ সালে বেশ কিছু সংশোধনী আনা হয়। ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঐক্যে আসার জন্য যে পরামর্শ ছিল, এই সংশোধনীগুলো সে অনুযায়ী না হওয়ায় কিউবাবিশারদেরা এগুলোকে অপর্যাপ্ত আখ্যা দিয়েছিলেন। যা হোক, পরিস্থিতি সামাল দিতে এগুলোর অসামান্য ভূমিকা ছিল।

ডলারের ফিরে আসা

মুদ্রার মান পড়ে যাওয়া ঠেকানো বা স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনা এই সংশোধনীগুলোর উদ্দেশ্য ছিল না। কালোবাজারি কর্মকাণ্ডকে রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির অধীনে নিয়ে এসে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিধি বাড়ানো এবং জাতীয় আয় বাড়িয়ে রাজস্ব ঘাটতি কমিয়ে আনার পদ্ধতি হিসেবেই এগুলো চিহ্নিত করা হয়। মার্কিন ডলার আটকে রাখার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার মাধমে ১৯৯৩ সালের জুন মাসে সংশোধনীগুলোর প্রথম পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হয়। তখন থেকে শুরু হয় ডলার থেকে পেসোতে আর পেসো থেকে ডলারে রূপান্তর-প্রক্রিয়া। ব্যক্তিগত লেনদেন পর্যন্ত এর পরিধি ব্যাপ্ত হয়েছিল। এর আগ পর্যন্ত কিউবার অর্থনীতিতে শুধু একটি মুদ্রা, অর্থাৎ পেসোরই প্রচলন ছিল। এর ব্যতিক্রম দেখা যেত কূটনীতিকদের জন্য তৈরি ডিপ্লটিন্ডাস নামক রাষ্ট্রায়ত্ত দোকানে। এতে বাইরে থেকে আসা শিক্ষার্থী আর কিছু কিউবানের মধ্যে যারা মূলত ছিল সংগীতশিল্পী আর খেলোয়াড়, যারা বৈদেশিক মুদ্রায় আয় করত, তাদের জন্য বানানো হয়েছিল।

এ সময়ে বেশ কিছু কিউবান তাদের পরিবারের মাধ্যমে ডলারে রেমিট্যান্স পাচ্ছিল কিংবা বেসরকারি অথবা বেআইনিভাবে পর্যটন-বাণিজ্য থেকে ডলার কামাচ্ছিল। কথা ছিল, তারা সরকারি হারেই এগুলো পেসো থেকে ডলারে রূপান্তর করবে। কিন্তু তত দিনে পেসোর দাম অনেক কমে যাওয়ায়, তাদের অধিকাংশই সেগুলো দিয়ে দালালদের দিয়ে ডিপ্লটিন্ডাসে কেনাকাটা করত কিংবা কালোবাজারে সেগুলো বদলে নিত। মুদ্রার মানের এই ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের কারণে ডলারের ওপর আরোপিত এই নিষেধাজ্ঞা অকার্যকর হয়ে পড়ে। এর কারণে পুলিশেরও যথেষ্ট সময় অপচয় হচ্ছিল, ছোটখাটো দুর্নীতি আর অস্থিরতা বাড়িয়ে এই পরিস্থিতি বেশ কিছু কিউবানকে তাদের ডলার ব্যয়ের জন্য আইন ভঙ্গ করতে বাধ্য করছিল। প্রথমে ডলারকে বৈধ করা হয়। এর ফলে রূপান্তরযোগ্য পেসো বানানো হয়, এর ফলেই মুদ্রার বিনিময় সম্ভব হয়। ১৯৯৫ সালে গঠিত হয়েছিল রাষ্ট্র পরিচালিত কাডেকাস বা কাসাস দে কাম্বিও। এর মধ্য দিয়ে সরকার বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নতুন মাধ্যম হিসেবে রেমিট্যান্সকে উৎসাহিত

করতে থাকে। এই পদক্ষেপের কারণে ডলারের দোকান থেকে আসা বিক্রয় কর বাবদ রাজস্ব আয় বাড়তে থাকে। কিউবানদের ডলার ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার জন্য সরকার ক্রমশ যেসব অকার্যকর প্রচেষ্টা হাতে নিয়েছিল, তার ফলে রাষ্ট্রের যে ক্ষতি হয়েছিল তাও কমে আসে।

কিউবায় এই সংশোধনের যে ফল দেখা যায়, সাবেক কমিকনভুক্ত দেশগুলোতে তা দেখা যায়নি। মার্কিন অভিভাবকত্বের অধীনে এই দেশগুলোতে তখন মুদ্রাবাজারের ব্যাপক উদারীকরণ চলছিল। কিন্তু কিউবার মুদ্রাবাজারে এমনটা হয়নি, এই সংশোধনী সীমাবদ্ধ ছিল কেবল দেশীয় অর্থনীতির ভেতরে ব্যক্তিগত লেনদেনের মধ্যেই। অন্য সব বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন নিয়ন্ত্রিত হতো রাষ্ট্রের অধীনেই। এটা স্বীকার করেই নিতে হয় যে সুযোগ আর কার্যকারণের সীমাবদ্ধতা সঙ্গে নিয়েই এই সংশোধন মুদ্রার দ্বৈত ব্যবস্থাকে একটা পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে আসতে পেরেছিল। কালোবাজার আর বৈধ ক্ষেত্রের মধ্যে যে দ্বিবিভাজন ছিল তাও শেষ হয়ে যায়। এই বিভাজন টিকে ছিল শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে লেনদেনের ক্ষেত্রেই। এ ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের লেনদেন করা যেত কাডেকাসের মাধ্যমে বেসরকারি ১০০ পেসোতে ১ ডলার রেটে। কিন্তু সরকারি ক্ষেত্রসমূহে এই ডলার/পেসো লেনদেন নির্ধারিত বিনিময় হারেই করা হতো।

কিউবা এই মুদ্রাবাজার সংস্কারে অন্যান্য সাবেক কমিকনভুক্ত দেশের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। কারণ, সেসব দেশে পশ্চিমা ব্যবস্থাপনায় এই সংস্কার হয়েছে। মার্কিন অভিভাবকত্বে এই দেশগুলোতে তখন মুদ্রাবাজারের ব্যাপক উদারীকরণ চলছিল। কিন্তু কিউবার মুদ্রাবাজারে এমনটি হয়নি, এই সংশোধন সীমাবদ্ধ ছিল কেবল দেশীয় অর্থনীতির ভেতরে ব্যক্তিগত লেনদেনের মধ্যেই। অন্য সব বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন নিয়ন্ত্রিত হতো রাষ্ট্রের অধীনেই। এটা স্বীকার করেই নিতে হয়, সুযোগ আর কার্যকারণের সীমাবদ্ধতা সঙ্গে নিয়েই এই সংশোধন মুদ্রার দ্বৈত ব্যবস্থাকে একটা পর্যায় পর্যন্ত নিয়ে আসতে পেরেছিল। কালোবাজার আর বৈধ ক্ষেত্রের মধ্যে যে ফারাক ছিল তারও অবসান হয়। এই বিভাজন টিকে ছিল শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে লেনদেনের ক্ষেত্রেই। এ ক্ষেত্রে মার্কিন ডলারের লেনদেন করা যেত কাডেকাসের মাধ্যমে, বেসরকারি পর্যায়ে ১০০ পেসোতে ১ ডলার হারে। কিন্তু সরকারি ক্ষেত্রে এই ডলার/পেসো লেনদেন নির্ধারিত বিনিময় হারেই করা হতো।

দ্বৈত মুদ্রাব্যবস্থার বৈপরীত্য প্রতিভাত হওয়ায় প্রকৃত আয়ের ঘাটতি নিয়ে কিউবানদের বোঝাপড়ার মধ্যেও পরিবর্তন নিয়ে আসে কাডেকাস। কারণ, কোনোভাবেই তখন দিনে দিনে পেসোর মান কমে যেতে থাকার ব্যাপারটা আর অস্বীকার করা যাচ্ছিল না। ক্রয়সক্ষমতার অভাবের কারণ হিসেবে ঘাটতির চেয়ে

অভাবের প্রশ্নটাই আনুষ্ঠানিকভাবে সামনে চলে আসে। যে অল্পসংখ্যক লোক ডলার পাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে বাকিদের ফারাকটাও ব্যাপক হারে বাড়ছিল। এই ফারাকে অবৈধতার চেয়ে বৈষম্যই প্রধান সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই সময়েই প্রকৃত আয় আর জনগণের জীবনের মান আগের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজটাকে একটু অন্যভাবে দেখা শুরু হয়েছিল। এই কাজ সমন্বয় করতে গিয়ে দেখা যায়, পেসোর বাজারমূল্য ফিরিয়ে আনা খুব প্রয়োজন। অর্থাৎ মুদ্রাব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতাকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে আনতে হতো। এই কাজের জন্য সামনে দুটি পথ উঠে এসেছিল—প্রথমত, রাজস্ব ঘাটতি কমিয়ে আনা, দ্বিতীয়টি ছিল খাদ্য সরবরাহ, বিশেষ করে পেসোতে যেসব খাবার কেনা যেত সেগুলোর পরিমাণ বাড়ানো।

দ্বিতীয় পদক্ষেপটি নেওয়া হয়েছিল ১৯৯৩ সালে। ১৪১ নম্বর অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, এতে স্বকর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়ে যায়। এ ধরনের সুয়েনটাপ্রোপিসটাধর্মী (স্বকর্মসংস্থান) তৎপরতার পরিসর ৪১ নম্বর থেকে বেড়ে ১৫৮ পর্যন্ত পৌঁছায়। এর ফলে যারা আত্মকর্মসংস্থান শুরু করছিল, আর এর জন্য নথিভুক্ত হচ্ছিল, তাদের সংখ্যাও ব্যাপক মাত্রায় বাড়তে থাকে। ১৯৯২ সালের শেষে যেটা ছিল ১৫ হাজার, সেটা ১৯৯৯ সাল নাগাদ ১৫ লাখে পৌঁছায়। এই পদক্ষেপ উদারীকরণের একটা ধাপ হিসেবে কিউবাবিশারদদের কাছে প্রশংসিত হলেও সুযোগের সীমাবদ্ধতার কারণে তা সমালোচিতও হয়। তখনো আত্মকর্মসংস্থানের হার মোট কর্মী বাহিনীর কেবল ৫ শতাংশ ছিল। এর নিবন্ধনের আয়ু ছিল মাত্র দুই বছর, আর এগুলো সংগ্রহ করতে হতো শ্রম মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় কার্যালয় থেকে। এ ক্ষেত্রে যেসব ধরনের কাজের অনুমতি দেওয়া হতো, তার পরিধিও ছিল খুবই ছোট, এর দৌড় ছিল কেবল ব্যক্তিক গণ্ডি পর্যন্তই। যা-ই হোক, তবু এই ছোটখাটো ব্যবসাগুলোর কারণেই এই পদক্ষেপ রাষ্ট্রের জন্য কিছু কর আদায়ের ক্ষেত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল। প্রারম্ভিক পর্যায়ে যেটা মনে হচ্ছিল স্থির, খুবই পশ্চাৎগামী ও একরৈখিক মানের একটা কাঠামো, সেটাই পরবর্তীকালে বেশ উন্নত হয়ে মোটা অঙ্কের টাকা সংগ্রহ ও তার হিসাব দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেছিল।

পরামর্শ

যখন ডিক্রির মাধ্যমে ডলার ব্যবহারে শাস্তি রদ করা হয় এবং আত্মকর্মসংস্থান শুরু হয়, সে সময় থেকেই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ রাজস্ব সমন্বয়ের সব ব্যাপারেই বেশ সচেতন হয়ে ওঠে। এ কারণে ১৯৯৩ সালের জাতীয় অধিবেশনে এই সচেতনতাকে একটা প্রয়োজনীয়তা বলেই চিহ্নিত করা হয়। ব্যয় হ্রাসে সরকার কৃচ্ছ্রসাধনের প্যাকেজ

গ্রহণ না করে এসে আবারও একটি জাতীয় বিতর্কের আয়োজন করে। জাতীয় প্রতিনিধিদের একটা সভার ব্যবস্থা করে। যাঁরা পার্লামেন্টস ওবরেরস (শ্রম সংসদ) নামে পরিচিত ছিলেন আর যাঁদের এই সভায় বসানো হয়েছিল এসব পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক করার জন্য। ব্যয় কমানোর প্রস্তাব বিবেচনা করার জন্য বেশ কয়েক মাস ধরেই এই ফোরামগুলোর সভা আয়োজন করা হয়েছিল। ১৯৯৪ সালের মে মাসে সব বিচার-বিবেচনা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত শেষ প্যাকেজটি সামনে আনা হয়নি। কিন্তু যাঁরা ভবিষ্যৎ কিউবার অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হওয়ার চেষ্টায় ছিলেন, তাঁদের কাছে এই অপেক্ষা মোটেই বোধগম্য হচ্ছিল না। তাঁরা একটা সুস্থিতিশীল অবস্থার জরুরত নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু সবকিছুর সমন্বয় সাধনের জন্য এই প্রতিনিধি সভাগুলো খুবই দরকারি ছিল। এই পদ্ধতির কিছু ভুলচুক তো থাকবেই, এটাই স্বাভাবিক, কিন্তু এই ব্যয় কমানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া সরকারের জন্য সহজ বিষয় ছিল না যে তারা চাইল আর কাগজে সিল মেরে দিল! কারণ, অনেক প্রস্তাবিত কাটছাঁটই বিরোধিতার মুখে বাদ দেওয়া হয়।

যখন নীতিগতভাবে আয়কর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তখন সরকারি কর্মকর্তাদের এর আওতার বাইরে রাখা হয়। আবার যখন মাত্রাতিরিক্তভাবে সিগারেট, মদ, পেট্রল, বিদ্যুৎসহ আরও কিছু যানবাহনের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়[৩৭], তখনো মৌলিক পণ্যের দাম নির্ধারিত মূল্যের নিচেই রাখা হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় মুদ্রানীতির ওপরে এর ঠিক কেমন প্রভাব পড়তে পারে, তা নিয়ে কোনো বিশেষ বিবেচনা না করেই। এটাও ঠিক করা হয়েছিল যে যদি কাজ মজুত রাখা হয় তবে সেটা এমন একটা ক্রমিক প্রক্রিয়ায় করা হবে, যাতে করে যেসব অতিরিক্ত শ্রমিক বেকার বসে ছিল, তাদের কাজে ফিরিয়ে আনা যায়। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল করতে কাজের নিশ্চয়তা দুর্বল অবস্থায় থাকার পরও শ্রমিকদের এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ তাদের অটুট অঙ্গীকারকেই স্পষ্ট করছিল। হিসাব-নিকাশের পর হঠাৎই ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে কৃষিবাজার আবার খুলে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে এই পদক্ষেপও বিশেষ ভূমিকা রাখে, যদিও এটার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ঠিক এমনটা ছিল না। এই বিষয়ে রাষ্ট্রনেতাদের আলোচনার খুঁটিনাটি জনগণের সামনে আনা হয়নি। যদিও অধিকাংশ লোকই এটা বিশ্বাস করতেন যে ফিদেল কাস্ত্রো এই ঘোষণার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, এই বাজার ভবিষ্যতে খুব ক্ষতিকর কিছুর আশ্রয়দাতা হিসেবেই কাজ করবে। কিন্তু রাউল আর এএনএপি এটাকে খাদ্য সরবরাহ বাড়ানোর[৩৮] একটি ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করে সমর্থন করেছিলেন। আবারও পিট্সবার্গ আর মায়ামিতে বসে যাঁরা কিউবাকে পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছিলেন, তাঁদের কাছে এই সংস্কারকে অপর্যাপ্ত মনে হয়েছিল। কৃষিজ পণ্যের বাজারের কেবল আংশিক

উদারীকরণ হয়েছিল বলেই তাঁরা এমনটা বলছিলেন। মৌলিক চাহিদার সর্বজনীন চাহিদা মেটাতে তখনো রাষ্ট্র তার খাদ্য বণ্টন প্রকল্প জারি রেখেছিল। রেশনিং ব্যবস্থা টিকে ছিল, কৃষকেরা তখনো একোপিওতে (গুদামে) একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল সরবরাহ করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। আর শুধু অতিরিক্ত উৎপাদনটুকুই তাঁরা এই বাজারে বিক্রি করতে পারতেন। এই নতুন বাজারগুলোকেও ব্যাপক মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ, নিরীক্ষণ আর করের চাপের মধ্যে রাখা হয়েছিল। কার্যত চাহিদা আর সরবরাহের ওপর ভিত্তি করে স্বাধীনভাবেই পণ্যমূল্য ওঠানামা করত, কিন্তু রাষ্ট্র মাঝে মাঝেই এই বিক্রয়কেন্দ্রগুলোতে দাম বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিয়ে নিজের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রেখেছিল।

রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি আর মুদ্রানীতিতে স্থিতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে এই চারটি নীতি বেশ মজবুত একটা কাঠামো তৈরি করেছিল। এই কাঠামোর সব ঠিকঠাক করতে যেসব উপায় হাতে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলোর সঙ্গে সাবেক কমিকনভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি ব্যবস্থার মধ্যে বেশ কিছু বৈপরীত্য দেখা যায়। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া আর পূর্ব ইউরোপের মতোই রাষ্ট্রীয় ব্যয় না কমিয়ে মূলত জাতীয় আয় বাড়িয়ে কিউবা এই ঘাটতি পূরণ করছিল। ১৯৯৩ থেকে '৯৫ সালের মধ্যে ন্যূনতম জাতীয় আয় বেড়েছিল ৩৭ শতাংশ, যেখানে জাতীয় ব্যয় কমেছিল মাত্র ৫ শতাংশ। এই নতুন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আয়ের দুই-তৃতীয়াংশই আসছিল রাষ্ট্রায়ত্ত নতুন ডলারের দোকানগুলো থেকে। তখন সেগুলোর নাম দেওয়া হয়েছিল Tiendas de Recaudacuion de Divisas (TRD)। আর বাকি আয়টা আসছিল নতুন আরোপিত পরোক্ষ কর আর ব্যবহার ভাড়া থেকে। দ্বিতীয় পার্থক্য হিসেবে দেখা গিয়েছিল যখন কিউবার সমাজকল্যাণ বাজেট অক্ষত থেকে গিয়েছিল। কারণ কিউবা শুধু তাদের সামরিক খাতে, প্রশাসনিক খাতে আর শিল্পোদ্যোগের ভর্তুকির ক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচন করছিল।[৩৯] জিডিপি বাড়ার সঙ্গে জাতীয় ব্যয় স্থিতিশীল রাখার কারণে কিউবার জাতীয় ব্যয় ও জিডিপি অনুপাত বেশ কমে যায়। ফলে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যেই জিডিপি ৮৭ শতাংশের চূড়া থেকে নেমে আসে ৫৭ শতাংশে। পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যেতে থাকা রাষ্ট্রগুলোর চেয়ে এই অঙ্ক অবশ্য বেশিই ছিল, কারণ, সেখানে তখন গড় জিডিপি ছিল ৪০ শতাংশ।[৪০] এই পদ্ধতিতে রাজস্ব ঘাটতি যখন ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে ৫ দশমিক ১ বিলিয়ন পেসো থেকে কমে ৮০০ মিলিয়ন পেসোতে নেমে এসেছিল, তখনো কিউবা তার সব সামাজিক নিরাপত্তা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। এই মৌলিক সফলতার পরিসর ছিল অনেক বড়, তুলনামূলকভাবে। সাবেক কমিকনভুক্ত দেশগুলোর গড় ঘাটতি ৮ দশমিক ৮ শতাংশের তুলনায় ১৯৯১-৯৩ সালে কিউবার রাজস্ব ঘাটতি ছিল জিডিপির ৩০ শতাংশ। কিন্তু ১৯৯৫ সাল নাগাদ তা কমে

দাঁড়ায় ৫ দশমিক ৫ শতাংশে, আর সেটা স্থির হয়েছিল ৩ শতাংশে এসে।[৪১]

১৯৯৩-৯৪ সালে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পেসোর মান স্থিতিশীল রাখতে যথেষ্ট সহায়তা করে। ডলারের অবমুক্তকরণের ফলে দেশে নতুনভাবে মুদ্রার প্রবাহ সৃষ্টি হয়। আত্মকর্মসংস্থান নতুন নতুন কাজের জোগান সৃষ্টি করেছিল। জাতীয় আয় সমন্বয়ের কারণে নির্দিষ্ট সরকারি ব্যয়ের ঘাটতি কমে আসে। আর খাদ্য ঘাটতি[৪২] আর তার মূল্য কমিয়ে আনে কৃষিবাজার[৪৩]। ১৯৯৪ সাল নাগাদ মুদ্রার মান হ্রাসে লাগাম দেওয়া সম্ভব হয়, এমনকি মুদ্রা তখন আংশিক ঘুরে দাঁড়াতেও সক্ষম হয়। ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারিতেও যেখানে ডলারের দাম ছিল ১৫০ পেসো, পরবর্তীকালে প্রতি ডলারের মূল্য প্রায় অর্ধেক কমে হয় ৬০ পেসো। পরবর্তী ১৮ মাস এই ধারা অব্যাহত থাকে। ফলে ডলারের দাম কমতে কমতে ১৯৯৬-এর মাঝামাঝিতে ১৮ পেসোতে এসে পৌঁছায়। অন্য কোনো ক্রান্তিকালীন রাষ্ট্রে মুদ্রার মান এমনভাবে সংহত হয়নি।[৪৪] অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা শুধু স্ফীতিকে একটা পর্যায় পর্যন্ত আটকে রাখতেই সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু তা ঘুরিয়ে দিতে পারেনি। যদিও কিউবার মুদ্রাস্ফীতি একটা পর্যায় পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়, কিন্তু পেসোর মান তখনো ১৯৯০ সালে যা ছিল তার চেয়ে কম থাকায় তীব্র মুদ্রাবৈষম্য টিকেই ছিল। এর অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় বেতন আর সরকার-নির্ধারিত মূল্য, যা ন্যূনতম শর্তে সুস্থিত অবস্থায় ধরে রাখা হয়েছিল, তা ডলার আর বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কম ছিল। রাষ্ট্রপক্ষ যখন অতীব জরুরি নিট বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের প্রয়োজন মেটাতে ব্যস্ত ছিল, তখন কাডেকাসের মাধ্যমে অবমূল্যায়িত হারেই সম্মিলিত কষ্টের ভেতর দিয়ে পরবর্তী এক দশকে আমদানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে।

মার্কিন শত্রুতা

অর্থনীতি একদিকে স্থিতিশীল হলেও আরেক দিকে বাইরের পরিবেশ খারাপ হয়। ১৯৬২ সালে কেনেডি যে বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিলেন, নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে তা আরও কয়েক দশক জারি রাখা হয়। কিন্তু ১৯৯২ সালে টরিসেলি আইনের মাধ্যমে সেটা আইনে পরিণত করা হয়। ১৯৯৬ সালে এই নিষেধাজ্ঞা আরও তীব্র হয়। সে সময় ক্লিনটন হেলমস-বারটন বিলে সই করলে তা আইনে পরিণত হয়। সেখানে তৃতীয় দেশের যেসব প্রতিষ্ঠান ১৯৫৯ সালে বাজেয়াপ্ত হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সম্পদ পাচার করেছে, তাদের দণ্ড বাড়ানো হয়। আর সেসব ফার্মের সঙ্গে যারা কাজ করেছে, তাদের যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। নিউইয়র্ক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ডলারে পরিশোধের প্রক্রিয়াও এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়ে, এমনকি এই লেনদেনে মার্কিন কোনো সংস্থা

জড়িত না থাকলেও। যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য করে—এই আইনের মাধ্যমে তাদের ক্ষেত্রে এটা নিশ্চিত করা বাধ্যতামূলক করা হয় যে তারা কিউবা থেকে কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী উপাদান সংগ্রহ করছে না।[৪৫]

কিউবায় জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তায় যে জোর দেওয়া হয়, এই পরিপ্রেক্ষিতে তার কারণ বোধগম্য। এমনকি তা অভ্যন্তরীণ আলোচনায়ও নানা ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করে। হেলমস-বারটন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে কিউবা নিজের 'মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব পুনরায় দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে' পাল্টা এক আইন করে। এতে দেশটির নাগরিকদের যেকোনো তথ্য, বিশেষ করে অর্থনৈতিক তথ্য প্রদানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এর একটি ফলাফল হচ্ছে সেন্ট্রো দে এসতুদিয়াস দে লাস আমেরিকাসে (সিইএ) গবেষণা প্রকল্প শুরু হওয়া। সংস্থাটির গবেষকেরা কিউবার সমন্বয়-সংক্রান্ত প্রথম পূর্ণাঙ্গ আলোচনা ইংরেজিতে প্রকাশ করার পর এটি শুরু হয়।[৪৬] এ ধরনের আত্মরক্ষামূলক অবস্থানের কারণে কিউবার পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সৃজনশীলভাবে খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা কমে যায়। এদিকে সংস্থাটির গবেষকেরা কিউবার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও তাঁরা ছিলেন সমালোচনামূলক বিপ্লবী।

৩. পুনর্গঠন

মার্কিন নিষেধাজ্ঞা থাকায় কিউবা অন্যান্য সাবেক কমিকন দেশের মতো অত টাকা পায়নি। তাকে নিজের সম্পদ দিয়েই শিল্পায়ন করতে হয়েছে। মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল খুবই কম, ১৯৯০ থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে এই বিনিয়োগের পরিমাণ ৮৫ শতাংশ পড়ে যায়। জাতীয় আয়ের দাপ্তরিক হিসাব অনুসারে, ২০১২ সালে এর পরিমাণ ছিল ১৯৯০ সালের তুলনায় অর্ধেক। আর বিনিয়োগ-জিডিপি অনুপাত ছিল ১০ শতাংশ। অন্যদিকে অন্য সাবেক কমিকন সদস্যদেশের ক্ষেত্রে এ অনুপাত ছিল ২০-২৫ শতাংশ।[৪৭] বিনিয়োগের অনুপাত এত কম হওয়া সত্ত্বেও কিউবার মোট জাতীয় আয়ে পুনরুদ্ধার ও প্রবৃদ্ধি এসব দেশের সমপর্যায়ে আছে, ব্যাপারটা সত্যিই বিস্ময়কর। নীতি প্রণয়ন করে রপ্তানির নতুন ক্ষেত্র তৈরি করে বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ বাড়ানো হয়েছে, খাদ্য ও জ্বালানি আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানো হয়েছে, নতুন বাজার সন্ধান ও নতুন বৈদেশিক অর্থায়নের উৎস সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এসবই করা হয়েছে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই। অর্থায়নের ক্ষেত্রে তারা যে আপেক্ষিক সফলতা পেয়েছে, তার কারণ হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালিত 'বিজয়ী সংগ্রহের' মনোভঙ্গি।

বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ

নিষেধাজ্ঞার কারণে কিউবার পক্ষে বিনিয়োগের টাকা জোটানোর একমাত্র ও

সবচেয়ে সস্তা উপায় হচ্ছে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ। এর ফলে কিউবার কর্মকর্তারা বিদেশি অংশীদারদের সঙ্গে গোপনে আলোচনা করার সুযোগ পান। এর মাধ্যমে তাঁরা মার্কিন অফিস অব ফরেন অ্যাসেটস কন্ট্রোলের নজর এড়াতে পেরেছেন। এই প্রক্রিয়া বিনিয়োগকারীদের সন্দেহের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করেছে। এমনকি কিউবার সরকারের ভেতরেও এ-বিষয়ক অনাগ্রহ দেখা গেছে। ফিদেল হতাশা নিয়ে ১৯৯৭ সালের পিসিসি কংগ্রেসের কাছে স্বীকার করেছিলেন। এরপর তিনি এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, কিউবার আইনি, আর্থিক ও প্রাযুক্তিক কাঠামো পরিবর্তনের কথা বলেছেন। ১৯৯০ সাল থেকে যে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই) আইন গড়ে উঠেছে, তা এসব প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।[৪৮] মনোভাব, বিধিবিধান, হিসাবরক্ষণ, সালিস, বিমা, শ্রম আইন—কিউবা কমিকন অংশীদারদের হারানোর পর থেকেই এসব বিষয়ে পরিবর্তন এসেছে। ১৯৮২ সালে বিদেশি বেসরকারি উদ্যোগের সঙ্গে ব্যবসা করার বিধান করা হয়। প্রথম পাইলট প্রকল্প নেওয়া হয় ১৯৮৮ সালে। কিন্তু নতুন চুক্তি করার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯১ সালের মধ্যে ৫০টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯২ সালের সংবিধান সংস্কারে 'উৎপাদনের মৌলিক' খাতের ওপর রাষ্ট্রায়ত্ত মালিকানার বিষয়টি পুনর্মূল্যায়ন করা হয়। আর ১৯৯৫ সালে বিদেশি বিনিয়োগ আইনে নিয়ন্ত্রণ কাঠামো আরও জঞ্জালমুক্ত করা হয়।

কিন্তু নতুন বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্য থাকলেও কিউবা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ শিথিল করেনি। তারা এফডিআইয়ের সুযোগ সীমিত রাখার নীতি গ্রহণ করে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ বিদেশি মালিকানায় নেওয়া সহজ ছিল না। এর জন্য মন্ত্রিসভার নির্বাহী কমিটিকে সন্তুষ্ট করতে হতো, যে এটা 'দেশের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বাড়াবে, টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখবে। এর ভিত্তি হবে দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা। তার জন্য এফডিআইকে নতুন পুঁজি, নতুন বাজার, প্রযুক্তি, দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞ নিশ্চিত করতে হবে। অনুমোদন দেওয়া হয়েছে সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, বিগত বছরগুলোতে অনেকগুলো প্রস্তাব খারিজ করা হয়েছে। চলমান নীতি পর্যালোচনার ভিত্তিতে এটা করা হয়েছে। বিধান করে নিশ্চিত করা হয়েছে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে এফডিআই খোলা হয়েছে।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। ১৯৯০-এর দশকের শুরুর দিকে দেরি বা ভুল-বোঝাবুঝির জন্য কিছু সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। আর একবার সমস্যা চিহ্নিত হয়ে গেলে কর্তৃপক্ষ প্রক্রিয়া আরও গতিশীল করে। ১৯৯৭ সালের মধ্যে বিদেশি মুদ্রার চাহিদা কমাতে দেশটির আমদানি সক্ষমতা অনেকাংশে পুনরুদ্ধার করা হয়, আবার বিদেশি বিনিয়োগকারীদের নিরুৎসাহিত করতে হেলমস-বারটন আইন প্রয়োগ করা হয়।

ফলে ১৯৯৭ সালের পিসিসি কংগ্রেসে প্রত্যক্ষ বিদেশি আইনে আরও কোনো উদারীকরণ ঘটে না। সেটা ছিল বিদ্যমান মনোভঙ্গির সত্যায়ন মাত্র। এটা ঠিক করা হয় যে অবকাঠামো, খনি ও জ্বালানি উন্নয়নের জন্য পুঁজি খোঁজা হবে। এরপর আসে বড় প্রকল্প গ্রহণের যুগ, ফলে ছোট বিনিয়োগকারীদের চুক্তি নবায়ন বন্ধ হয়ে যায়। কিউবাবিশারদেরা নীতি উলটপালটের ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করলেও এফডিআই কৌশল অপরিবর্তিত থাকে। ওদিকে যৌথ উদ্যোগের চুক্তি বছর বছর কমতে থাকে, ১৯৯১-৯৭ পর্যায়ে তা ছিল গড়ে ৪০, আর দশকের শেষে তা দাঁড়ায় ৪০-এ। বড় চুক্তির ফলে বার্ষিক পুঁজিপ্রবাহের পরিমাণ বেড়ে যায়, ১৯৯৩-৯৬ পর্যায়ে যা ছিল ১৮০ মিলিয়ন ডলার, ১৯৯৭-২০০০ পর্যায়ে তা দাঁড়ায় ৩২০ মিলিয়ন ডলারে।

এই সময়েই কিউবায় প্রথম বেসরকারীকরণ ঘটে। ১৯৯৯ সালে ফরাসি কোম্পানি আলতাদিস ৫০ মিলিয়ন ডলারে হাবানোসের ৫০ ভাগ শেয়ার কিনে নেয়, এই সংস্থাটি কিউবার সিগারের আন্তর্জাতিক বিতরণকারী। আর পানারমার একটি কোম্পানি ১৫ মিলিয়ন ডলারে একটি বিদ্যুৎ কারখানা স্থাপন করে, এটাই ছিল কিউবার প্রথম পূর্ণাঙ্গ বেসরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি। এরপর ২০০১-০৮ পর্যায়ে সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কিউবার সম্পর্কের অবনতি হয়, ফলে এফডিআইও ব্যাহত হয়। রিগ্যান প্রশাসন কিউবাকে সন্ত্রাসের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষক আখ্যা দিয়েছিল। সে সময় নজরদারি ও মামলা-মোকদ্দমাও বৃদ্ধি পায়। জুনিয়র বুশ কমিউনিজম-উত্তর কিউবার জন্য কিউবা ট্রানজিশন প্রকল্পও চালু করেন। আর স্টেট ডিপার্টমেন্ট মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের ঘটনা চিহ্নিত এবং তার বিচার করতে নানা তোড়জোড় শুরু করে। ২০০৪ সালে ওয়াশিংটন কিউবাকে ডলার বিল সরবরাহের অভিযোগে সুইস ব্যাংক ইউবিএসকে ১০০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করে। এর প্রতিক্রিয়ায় হাভানা তাদের অভ্যন্তরীণ লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে ডলারের ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। যদিও ১০ শতাংশ সারচার্জ দিয়ে ডলার রাখা ও বিনিময়ের সুযোগ রাখা হয়েছিল। সে সময় ভেনেজুয়েলার সঙ্গে কিউবার সম্পর্কের বহুমুখী উন্নয়ন হয়। বিরোধী নেতা হিসেবে হুগো শাভেজকে ১৯৯৪ সালে হাভানা সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়। শাভেজ ১৯৯৮ সালে নির্বাচনে বিজয়ী হন। ২০০২ সালে তাঁর বিরুদ্ধে ক্যুয়ের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়, এমনকি তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাপনা ধর্মঘটও ব্যর্থ হয় সে সময়। এরপর থেকে দেশ দুটির মধ্যকার আন্তবাণিজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে দেশ দুটির মধ্যে দ্বিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর আওতায় দৈনিক ৫৩ হাজার ব্যারেল ভেনেজুয়েলার তেলের বিনিময়ে কিউবা সে দেশটিকে নানা পেশাদার সেবা দেবে। যেমন স্বাস্থ্যকর্মী ও শিক্ষক দিয়ে তারা ভেনেজুয়েলাকে সহায়তা করবে। ১৯৯০ সালের এই প্রথম কিউবা অনুকূল শর্তে বিপুল পরিমাণ টাকা পায়, এতে দেশটির

বিনিয়োগ ও জিডিপির প্রবৃদ্ধি বেড়ে যায়। ২০০৫-০৭ সালে কিউবার জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১০ শতাংশে উন্নীত হয়। ভেনেজুয়েলাকে সঙ্গে করে কিউবা নতুন এক বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে। এর অন্য সদস্যরা হচ্ছে বলিভিয়া, ইকুয়েডর, নিকারাগুয়া ও চারটি ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র। ২০০৫-০৭ সালে বার্ষিক রপ্তানি বৃদ্ধির গড় হার দাঁড়ায় ৩০ শতাংশ, আগের দশকে যার হার ছিল ৯ শতাংশ।

যদিও কিউবায় বিনিয়োগ হওয়া আন্তর্জাতিক পুঁজিবিষয়ক তথ্য খুবই অপ্রতুল, প্রাপ্তিসাধ্য তথ্যে দেখা যায়, সামান্য বিনিয়োগেই কিউবার উৎপাদনব্যবস্থা ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কাঠামোয় বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগ থেকেই কিউবায় প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল জিডিপির মাত্র ১ শতাংশ। অন্যদিকে সাবেক কমিকন দেশগুলোতে এর পরিমাণ ছিল ৪ শতাংশ।[৪৯] সরাসরি চুক্তি করে ও বিজয়ীদের বেছে নেওয়ার মাধ্যমে হাভানা প্রতি ডলার বিনিয়োগ থেকে বিপুল মুনাফা করে। কিন্তু তারপরও ফলাফল হচ্ছে, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে কিউবার পুনঃপ্রবেশে নেতৃত্ব দিয়েছে হাতে গোনা কয়েকটি মাত্র শিল্প। চিত্র ৪ ও ৫-এ দেখা যায়, ১৯৯০ সালের পর থেকে কিউবার অর্থনীতির পুনঃকাঠামো নির্মাণ ও নিরাময়ের ভিত্তি ছিল খুবই সংকীর্ণ। চিত্র ৪-এ ১৯৯০ পরবর্তীকালের বৈদেশিক মুদ্রার প্রবৃদ্ধির প্রধান খাতগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে: প্রথমত, পর্যটন, এরপর নিকেল ও জ্বালানি, আর গত দশকে পেশাদার সেবা প্রদানই পুনরুদ্ধারের পথে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখেছে। কমিকন দেশগুলোর রপ্তানি আয়ের ৭৩ শতাংশই এসেছে চিনি থেকে, তাদের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের মতো। আর ২০১২ সালের মধ্যে রপ্তানি আয়ে চিনির অবদান দাঁড়ায় মাত্র ৩ শতাংশে। আর নব বিকশিত পর্যটন, নিকেল, তেল প্রক্রিয়াকরণ, পেশাদার সেবা প্রদান প্রভৃতি খাত থেকে পণ্য বিক্রি ও সেবার ক্ষেত্রে বার্ষিক বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ বিলিয়ন ডলারের বেশি। পর্যটনশিল্প ও নিকেলের খনিতে এফডিআইয়ের মাধ্যমে নতুন করে পুঁজি বিনিয়োগ করা হয়। এটা হয়েছে ২০০৪ সালের কিউবা-ভেনেজুয়েলা চুক্তির আওতায়, তেল প্রক্রিয়াকরণ ও পেশাদার সেবা প্রদানের মাধ্যমে। এই শেষোক্তটি থেকে সর্বাধিক বিদেশি মুদ্রা এসেছে। ২০০৫ সালের পর থেকে পণ্য বিক্রির চেয়েও বড় হয়ে ওঠে এই সেবা বিক্রয় খাতটি। যদিও ২০০৮ সালের পর থেকে সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি এসেছে তেল শোধন থেকে, এটা কিউবা ও ভেনেজুয়েলার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত হয়। জৈবপ্রযুক্তি খাত সম্প্রতি বেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, সব আশা এ খাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। এ খাতের রপ্তানি ২০০৮-১২ সালের মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছে। কিন্তু তা মোট রপ্তানি আয়ের মাত্র ৩ শতাংশ, ফলে অর্থনীতিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো সক্ষমতা এটা অর্জন করেনি। ২০১২ সালের মধ্যে

রেমিট্যান্সসহ কিউবার বাণিজ্য উদ্বৃত্ত বেড়ে ২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এতে দেশটি যথেষ্ট পরিমাণ রিজার্ভ রাখতে পেরেছে। চিত্র ৪-এ আনুমানিক 'নেট বাহ্যিক অর্থায়নের' নেতিবাচক ভারসাম্য দিয়ে এটা চিহ্নিত করা হয়েছে।

চিত্র ৫-এ রপ্তানির ভৌগোলিক গন্তব্য দেখানো হয়েছে। এতে বোঝা যায়, কিউবার পণ্য বাণিজ্যে কীভাবে নতুন বিন্যাস এসেছে। ১৯৯০ সালে দেশটির রপ্তানির ৭৫ শতাংশই যেত সাবেক কমিকন দেশগুলোতে, কিন্তু ২০১২ সালের মধ্যে এর হার দাঁড়ায় ৫ শতাংশে। ২০০০ সালের মধ্যে কিউবা তার রপ্তানি বাণিজ্যে ব্যাপক বৈচিত্র্য আনতে সক্ষম হয়: পশ্চিম ইউরোপে তার রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২ শতাংশ, সাবেক কমিকন দেশগুলোতে ২৭ শতাংশ, কানাডায় ১৭ শতাংশ, এশিয়ায় ১২ শতাংশ আর যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত আমেরিকায় ১০ শতাংশ। তারপর থেকে একটিমাত্র দেশে রপ্তানির পরিমাণ আবারও বাড়ে, ২০১২ সালে ভেনেজুয়েলাতেই তার রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৫ শতাংশ। এর বিপুল পরিমাণই ছিল তেল, সিয়েনফিউগোস শোধনাগারের তেল। আর দেশটি পর্যটন ব্যতীত

Figure 4: Composition of foreign exchange flows, 1990–2012

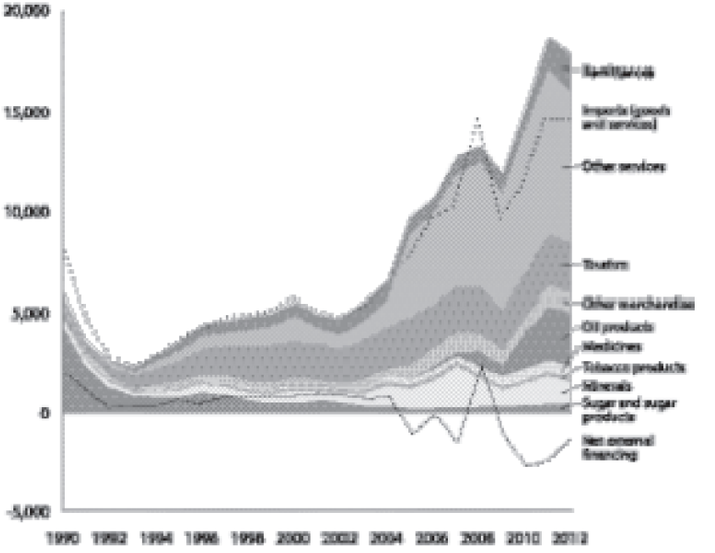

Sources: Oficina Nacional de Estadísticas e Información [onei] and author's estimates. The onei does not publish data on net external financing, and its series for remittances was only published from 1997–2000, so these figures are author's estimates, based on the available information.

Figure 5: Destination of goods exports 1990–2012

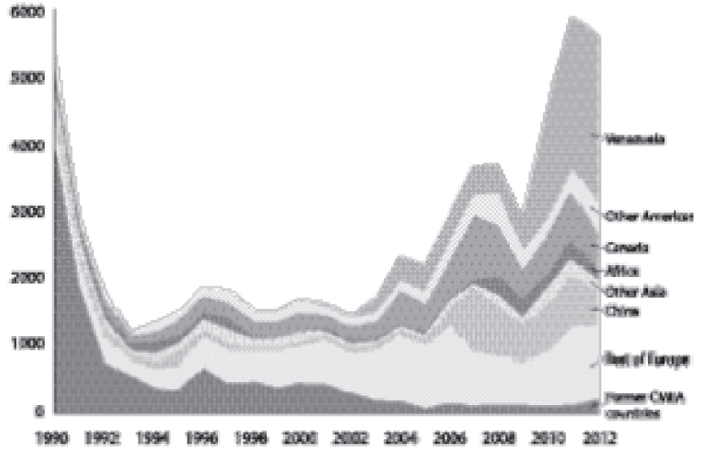

Source: Oficina Nacional de Estadísticas e Información [onei]

অন্যান্য সেবাও ভেনেজুয়েলাতে রপ্তানি করে থাকে।

৪. রাউলের সংস্কার

২০০৫-০৭ সময়ে ভেনেজুয়েলার সঙ্গে বাণিজ্যের মাধ্যমে কিউবা ব্যাপক পরিমাণে বিদেশি মুদ্রা অর্জন করার ফলে দেশটি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু ২০০৮ সালে রাউল কাস্ত্রো ও তাঁর দল ক্ষমতায় আরোহণ করার পর এই উচ্ছ্বাস কমে আসে। তিনটি অতি শক্তিশালী হারিকেন ঝড় ও বিশ্বমন্দার কারণে নিকেলের দাম পড়ে যাওয়ায় কিউবার বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাইরে চলে যায়। ফলে কিউবা তার ঋণের বাধ্যবাধকতা মেটাতে অক্ষম হয়ে পড়ে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত, মুদ্রা সরবরাহ স্থিতিশীল থাকা, রাজস্বের শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার হওয়া সত্ত্বেও কিউবার পেসোকে আগের জায়গায় আনতে স্রেফ বৈদেশিক মুদ্রা আয় আগের ধারায় ফিরিয়ে আনাই যথেষ্ট ছিল না। আর এর মাধ্যমে মজুরির প্রকৃত মূল্য পুনরুদ্ধার, সুবিধা ও মূল্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব ছিল না। মুদ্রার ভারসাম্যহীনতা স্থায়ী রূপ নেয়। দুই ধরনের মূল্য, আয় ও বিনিময় হার, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ও খোলাবাজারের সহাবস্থানের ফলে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অর্থনীতির অঙ্গীভূতকরণ ব্যাহত হয়। ফলে উৎপাদনের এক ভারসাম্যহীন ও বিকৃত কাঠামো গড়ে ওঠে। বাস্তবে কিউবার সরকারি বেতনের হার বহুদিন ধরে ১৯৯০ সালের পর্যায়ের নিচে ছিল। বর্তমানে ক্যাডেকা বিনিময় হারে ২৪ পেসোতে এক ডলার, আর

১৯৯০ সালের কালোবাজারে তা ছিল ৭ পেসো (চিত্র ৬ ও ৭ দেখুন)। অসমতা ও বিকৃত প্রণোদনার ব্যাপার জারি থাকে। জনসংখ্যার খুব ছোট অংশের হাতেই নগদ অর্থ ছিল, তারা খোলাবাজার থেকে কিনতে পারত। অন্যদের ক্ষেত্রে নতুন রাষ্ট্রীয় খাত

Figure 6: Value of $100 as a multiple of the average monthly wage

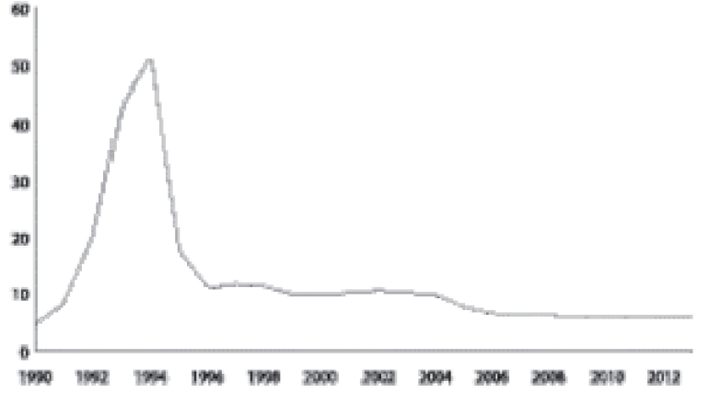

Sources: Author's calculations based on Oficina Nacional de Estadísticas (onei) data for average monthly wages, the black-market exchange rate until 1993, and the 'unofficial' but legal Cadeca rate (pesos exchanged for convertible pesos then exchanged for hard currency) thereafter. The Cadeca rate is available only for personal and non-state sector transactions.

Figure 7: Cuban Peso-us Dollar market exchange rate, 1990–2013

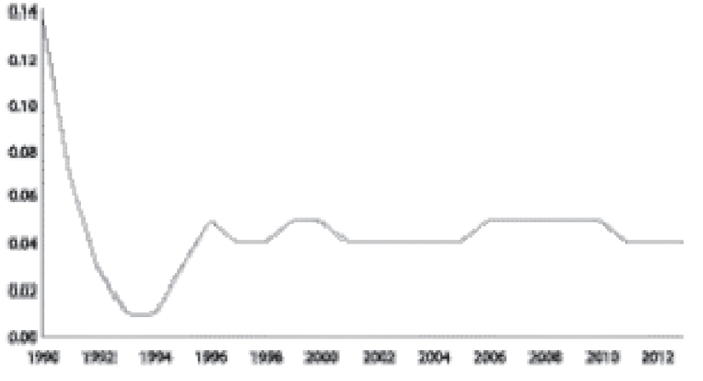

Sources: Author's calculations based on the black-market exchange rate until 1993, and the Cadeca rate thereafter.

থেকে যে সম্পদ 'চুইয়ে পড়বে', সে ব্যবস্থাও ছিল দুর্বল, পরোক্ষ। এটা হয়েছে মূলত কর সংগ্রহের মাধ্যমে, জনকল্যাণে তা ব্যয় করা হয়েছে।

এই নতুন ও এক অঙ্কের বিনিময় হারের বিষয়টি কী হবে, তা এখনো নির্ধারিত হয়নি। বর্তমানে ক্যাডেকা হার হচ্ছে ২৪ পেসোতে ১ ডলার, এতে পেসো অবমূল্যায়িত হয়, তারপরও এটি সবচেয়ে কম ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী প্রতিপন্ন হতে পারে, আর সরকারি বিনিময় হারের ব্যাপক অবমূল্যায়ন করায় এটা উদ্যোক্তাদের মধ্যকার প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে দিতে পারে। এর ফলে কিউবার অর্থনীতি খুবই কম মজুরির অর্থনীতির হিসেবে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রবেশ করবে আর কিউবার পেসো পে-স্কেল ও সাবেক সিইউসি আয়ের মধ্যে এক অসংযত ব্যবধান সৃষ্টি করবে। ২০, ১৫ ও এমনকি ১০ পেসোয় এক সিইউসি/ডলারের এই হার আপেক্ষিক প্রকৃত আয়ের ক্ষেত্রে আংশিক সংশোধনী আনবে। এর ফলে একই সঙ্গে প্রতিযোগিতা বাড়বে। আর সবকিছু একবার ঠিক হয়ে গেলে ও আত্মবিশ্বাস পুনরুদ্ধার হলে নতুন করে সমন্বয় করা সম্ভব হবে।[৫০]

লেখার সময় ডায়া সেরোর তারিখ দেওয়া হয়নি আর কীভাবে পেসোর পুনর্মূল্যায়নের ব্যবস্থাপনা হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সতর্কতার সঙ্গে মুদ্রা একীভূতকরণের মনোভঙ্গি নেওয়ার কারণে সরকার পরিষ্কারভাবেই আশা করছে, মূল্য পুনর্নির্ধারণের ব্যয়ভার কমানো সম্ভব হবে। কিউবার ক্ষেত্রে তুলনীয় কিছু নেই। কারণ, অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে মুদ্রা একীভূতকরণ হয়েছে তখনই, যখন বাণিজ্য ভারসাম্য ইতিবাচক থাকায় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার মজুত থাকে। অন্যদের ক্ষেত্রে বাহ্যিক সমর্থনও ছিল। ফলে কেউই কিউবার মতো এমন অদ্ভুত ভাঙা বাজার ও মূল্যের কবলে পড়েনি। কিউবার পরিস্থিতি বোঝার ক্ষেত্রে মুদ্রাসংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ তথ্য-উপাত্ত না থাকায় আমরা শুধু পরিবর্তনের অবস্থা নিয়ে সন্দেহই করতে পারি। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে আগামী কয়েক বছরে এই পরিবর্তনের অনেক সুদূরপ্রসারী ফলাফল অনুভূত হবে, না শুধু আপেক্ষিক মূল্য ও উপার্জন বিতরণের পরিপ্রেক্ষিতে নয়, কিউবার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির শক্তির জন্যও।

সামাজিক বিভাজন

এটা বোঝা সহজ নয়, জনগণের কী পরিমাণ অংশের সিইউসি ও বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির সুযোগ আছে, আর কোন অঙ্কে। কিছু ধারণার ভাষ্য হচ্ছে, অর্ধেক জনগণের সিইউসি আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এই অঙ্ক খুবই কম। ব্যাংকে সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু যারা কালোবাজারি করে সফল হয়েছে, তারা তাদের টাকা ব্যাংকে রাখে না, অন্য কোথাও রাখে। একটি ব্যাপার নিশ্চয়তার সঙ্গে নিরূপণ করা যায়, সিইউসিতে কোনো সামাজিক গ্রুপের সবচেয়ে বেশি

প্রবেশাধিকার আছে, আর কাদের নেই। যারা পারিবারিক সমর্থন ছাড়া রাষ্ট্রীয় পেনশন ও সামাজিক সহায়তার ওপর নির্ভর করে, তারাই সবচেয়ে গরিব। পেনশন দিয়ে কোনোরকমে জীবন টিকিয়ে রাখা যায়। ফলে যাদের পরিবার নেই বা পরিবার খুব গরিব, তাদের সামাজিক সেবার ওপর ভর করে চলতে হয়। যদিও হাভানার চারদিকে প্রচুর টাকা ওড়ে, ফলে তরুণ ও যোগ্য মানুষদের টাকা উপার্জনের সুযোগও অধিক। যে বুড়ো মানুষেরা নড়াচড়া করতে পারে না, তাদের জন্য এটা সবচেয়ে খারাপ জায়গা। কারণ, বাজারে পণ্যের দাম আকাশছোঁয়া। যারা নিম্ন বেতনের সরকারি চাকরি করে, যাদের বোনাস ও চুরি করার সুযোগ নেই বা রেমিট্যান্সের সুযোগ নেই, তারা শুধু একরকম বেঁচে থাকে।

এরপর যারা কোনোভাবে সরকারি চাকরির আয়ের সঙ্গে কিছু যোগ করতে পারে, তারা হাতে-মুখে বেঁচে থাকে। তাদের সঞ্চয়ের সামর্থ্য নেই। এরা জনগণের অর্ধেকেরও বেশি। সরকারি কর্মকর্তারা এ শ্রেণিভুক্ত। যারা সামান্য রেমিট্যান্সের ওপর ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে বা বৈধ বা অবৈধভাবে ছোটখাটো ব্যক্তিগত ব্যবসা করে, তারাও এর মধ্যে আছে।

অসমতা বাড়ানোর পাশাপাশি অর্থনীতির দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরজীবী অনানুষ্ঠানিক খাত গড়ে ওঠে, এর ফলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এটা দক্ষ শ্রমিকদের নানা প্রণোদনা দিয়ে আনুষ্ঠানিক খাত থেকে সম্পদ সরিয়ে অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়ে গেছে। এর মধ্যে শিক্ষকেরাও আছে। তারা সিইউসি মজুরির জন্য এসব নিম্ন দক্ষতার চাকরি নিয়েছে। এতে তারা রাষ্ট্রীয় সম্পদ চুরি করে কালোবাজারে উচ্চ দামে বিক্রিতে উৎসাহ জুগিয়েছে। দুর্নীতি ও ক্রমবর্ধমান অসমতা উদারতার ভিত্তিতে কুঠারাঘাত করেছে, সমাজতান্ত্রিক নৈতিকতার বিশ্বাসযোগ্যতা বিনষ্ট করেছে। এই ব্যাপারটি আরও পরিপুষ্ট হওয়ার কারণ হচ্ছে, কিউবার ধনীরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকরি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পাওয়া শুরু করেছে। এসব সুবিধার জন্য তারা অনানুষ্ঠানিক পথে টাকাও দেয়। অন্যদিকে ভর্তুকির কারণে বিনিয়োগ ব্যাহত হয়েছে।

লিনিয়ামেন্টস

অর্থমন্ত্রী মারিনো মুরিলোর নেতৃত্বে রাউল কাস্ত্রোর নতুন দলের প্রধান সমস্যা ছিল, ২০০৮ সালের ধসের পর বাহ্যিক ভারসাম্য অর্জন করা। আমদানি ব্যাপক হারে কমিয়ে দিয়ে এটা অর্জন করা সম্ভব হয়, এতে প্রবৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৪ শতাংশে নেমে আসে। এরপর থেকে অর্থনৈতিক কৌশলের মানে দাঁড়ায় মডেলের 'আধুনিকায়ন', উৎপাদনের বহুমুখীকরণ, পুঁজিহীন অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা, মূল্য, বিনিময় হার ও আয় পুনর্নির্ধারণ করা। তারা স্রেফ চীনা

স্টাইলে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পুঁজিবাদী কায়দায় পুঁজি আহরণের দিকে যায়নি। রাউলের স্টাইল তাঁর ভাইয়ের চেয়ে ভিন্ন হলেও তাঁর নীতি যেন ফিদেলের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে, সে ব্যাপারেও তিনি সতর্ক ছিলেন। তিনি বারবার ফিদেলের বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃতি দিতেন।[৫১] শুরুর দিকে সংস্কারে তিনি সংযত থাকলেও ২০১১ সালের পার্টির কংগ্রেসের আগে তিনি জাতীয় পরিসরে আলোচনার সূত্রপাত করে ব্যাপক সংস্কারের ভিত্তি প্রস্তুত করেন। দেশব্যাপী নানা বৈঠকে আলোচনার জন্য ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে দশটি নথির খসড়া ছাড়েন তিনি, এর শিরোনাম ছিল 'লিনিয়ামেন্টস দে লা পলিটিকা ইকোনমিয়া ই সোশ্যাল লা রেভল্যুশন'। সেসব বৈঠকে এর ওপর নানা মন্তব্য ও সংশোধনী আসে, সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। কংগ্রেসে এরপর আরেকটি খসড়া পেশ করা হয়, এতে কিছু সংশোধনী আনার পর ২০১১ সালের মে মাসে তা প্রকাশ করা হয়।[৫২] যদিও লক্ষ্য ছিল এই নির্দেশনা ২০১৬ সাল পর্যন্ত পথ দেখাবে, এতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লেশমাত্র ছিল না। ১৯৯১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির প্রস্তাবের মতো এতে কিছু নীতি ও লক্ষ্যের দিকনির্দেশনা ছিল, এতে সংস্কার কর্মসূচির রূপরেখা ছিল না।

কিউবার অংশগ্রহণমূলক ব্যবস্থার যত দুর্বলতাই থাকুক না কেন, এটা তারপরও সরকারি নীতির প্রতিবন্ধক ও চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে যায়। সরকারি খাতে বড় রকমের ছাঁটাইয়ের ব্যাপারটি যেভাবে পুনর্বিবেচনা করা হয়, তাতেই এটা বোঝা যায়। এতে নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নগুলো অংশ নিয়েছিল। সরকারি শ্রমিকেরা সমন্বয় সাধনের প্রক্রিয়ায় অতি দ্রুতগতি এবং যে অবাস্তব ও অসম উপায়ে তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হয়েছে, তার বিরোধিতা করেছে। এই ঘটনা দেখে বোঝা যায়, কিউবার ট্রেড ইউনিয়নগুলো কোনোভাবে স্বাধীন না হলেও তারা নীতিসীমা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। একই সঙ্গে তারা 'যৌক্তিকীকরণের' বাস্তব প্রয়োগ ও বিভিন্ন উদ্যোগ বন্ধ করতে ভূমিকা রেখেছে।[৫৩] দিকনির্দেশনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের মতামত গ্রহণের সুযোগ রাখেনি, ফলে চূড়ান্ত নথিপত্রে বেশ পরিবর্তন আসে। ২০১১ সালের মে থেকে বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়া মুরিলোর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয় করা হয়েছে। এর অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে পার্টি ও সংসদের কাছে পেশ করা হয়েছে। তারপরও এ কাজে বিভিন্ন সংস্থা জড়িত ছিল। পার্টি সরকার এবং বিশেষজ্ঞ কমিশনের জটিল আন্তক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ প্রক্রিয়া এগিয়েছে। বাস্তবায়ন-প্রক্রিয়ার মধ্যে নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। বিভিন্ন পাইলট প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে পুনরায় প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও মনিটরিংয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

'নির্দেশনা' ও আনুষ্ঠানিক বক্তৃতায় বাজারের 'কর্মকৌশল' গ্রহণের ব্যাপারটি

ঘুরেফিরে এসেছে। কিন্তু এটাকে রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবে বিবেচনা করুন। এটা ঠিক নব্য উদারনৈতিক মতবাদের নয়, যাতে উত্তরণের কৌশলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলোতে উদারীকরণের উপাদান আছে। যেমন অরাষ্ট্রীয় খাতের ব্যাপ্তি, বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ বাড়ানো, বিশেষ উন্নয়ন জোনের ক্ষেত্রে কর মওকুফ ও গৃহায়ণ, পুরোনো গাড়ির বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল। কিন্তু সরকার নিজের পর্যবেক্ষণ সংহত করতে অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ বেসরকারি খাতে ছেড়ে না দিয়ে এর সঙ্গে আরও কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। রাউল ক্ষমতায় আসার পর কম্পট্রোলার জেনারেল গ্ল্যাডিস বেজেরানো সম্পদ ও কর্তৃত্ব বাড়িয়েছে, যাকে এত দিন বাইরের ভাষ্যকারেরা উপেক্ষা করেছে। তার কাজ শুধু দুর্নীতিবিরোধী অভিযান শক্তিশালী করা নয়, মানুষকে তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে কর প্রদানে উৎসাহিত করাও তার অন্যতম প্রধান কাজ। দুর্নীতিবিরোধী অভিযানে উচ্চপর্যায়ের অনিয়মের তদন্ত করা হয়েছে, এর ফলে অনেক বড় কর্তাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। কর সংগ্রহের লক্ষ্যে দেশব্যাপী কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, হিসাবরক্ষক ও স্বনিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহার করে আনুষ্ঠানিক খাতের দক্ষতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় হাতিয়ার নির্মাণ করা হয়েছে, সংস্কৃতি সৃষ্টি করা হয়েছে। যেখানে বাজার আগের চেয়ে আরও বড় ভূমিকা পালন করছে।

বৈশ্বিক আর্থিক মন্দার পর থেকে কিউবার অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন ভালো যাচ্ছে না, বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৩-এর কোঠায় নেমে এসেছে। বারবারই লক্ষ্য অধরা থেকে যাচ্ছে। ভেনেজুয়েলা থেকে সহায়তা আসছে ঠিকই, তবে প্রথম দিকে তা কিউবার অর্থনীতিকে যেভাবে সঞ্জীবিত করেছে, ২০০৮ সালের দিকে তা অনেকটাই থিতিয়ে আসে। আর মার্কিন বাজারে ঢুকতে না পারা ও আন্তর্জাতিক অর্থবাজারের বিনিয়োগ তার প্রবৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় খাতের প্রকৃত মজুরি বেড়েছে ঠিকই, স্বাস্থ্যসেবায় সেটা তেমন বাড়েনি, যদিও ২০১৪ সালে এ খাতের মজুরি কিছুটা বেড়েছিল। কৃষির উৎপাদন তেমন একটা বাড়েনি, এটা সত্যিই হতাশার কারণ হয়ে উঠেছে। তবে বেসরকারি খামারগুলোকে জমি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাদের আরও অধিক হারে প্রণোদনা দেওয়া, বিতরণব্যবস্থার উন্নতি, ইনপুট বাড়ানো ও অর্থ সরবরাহ ঠিক রাখার লক্ষ্যে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তুলনা করলে দেখা যায়, ২০০৮ সাল থেকে কিউবার প্রবৃদ্ধির হার 'উত্তরণ' অর্থনীতির দেশগুলোর তুলনায় খারাপ নয়। সরকারি খাতের বেতন-ভাতা ব্যাপক হারে কমানো হলেও সমন্বয়-প্রক্রিয়ার গতি ছিল বেশ ধীর, যাতে চাহিদা পড়ে না যায় এবং বেকারত্ব না বাড়ে। কিন্তু ২০১১ সালের সংস্কারের প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যায়নি। বিধিবিধান নিয়ে আনাড়ির

মতো নাড়াচাড়া না করে নতুন বাজারকে আরও কার্যকর করতে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়টি চিন্তা করা হচ্ছে, যাতে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ে এবং দ্বৈত মুদ্রাব্যবস্থার সমস্যাসমূহ মোকাবিলা করা যায়।

সবচেয়ে সাম্প্রতিক পদক্ষেপ হচ্ছে মারেই বন্দরের উন্নয়ন, এটি হাভানা থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে। এই প্রকল্প একটি যৌথ উদ্যোগ, এটি শুরু হয়েছিল ২০০৯ সালে, ব্রাজিলীয় উন্নয়ন ব্যাংক বিএনডিইএসের অর্থায়নে এটি পরিচালিত হয়েছে। ১৯৯০ সালের পর অবকাঠামো খাতে এটিই সবচেয়ে বড় উদ্যোগ। এই পোতাশ্রয়ের গভীরতা ১৮ মিটার, ফলে ২০১৫ সালে এর নির্মাণকাজ শেষ হয়ে গেলে পণ্যবাহী বিশাল আকৃতির 'পোস্ট প্যান্যাম্যাক্স' জাহাজ এখানে সহজে ঢুকতে পারবে, যেখান থেকে এই জাহাজ পানামা খাল অভিমুখে যাত্রা করতে পারবে। বর্তমানে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে শুধু কিউবা থেকে সব আমদানি বন্ধই হয়নি, কিউবার জাহাজঘাটে কোনো জাহাজ ভিড়লে সেটা ছয় মাসের জন্য মার্কিন ঘাটে ভিড়তে পারবে না। এসব নিষেধাজ্ঞা আংশিকভাবে তুলে নেওয়া হলেও ম্যারিয়েল বন্দরের তৎপরতা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। আর এই প্রকল্প হয়তো কিউবার দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নের ইঙ্গিত, অংশত। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিলেও এই বন্দর চীনা, ব্রাজিল ও ইউরোপের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের কাজে লাগতে পারে। এটা একটা কেন্দ্র হিসেবে কাজ করতে পারে, যেখান থেকে কনটেইনার ছোট জাহাজে তুলে আঞ্চলিক বন্দরগুলোতে পাঠানো যেতে পারে।

দ্বিতীয় উদ্যোগটি হচ্ছে ২০১৩ সালের শেষের দিকে ম্যারিয়েলে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল উন্মুক্ত করা, নতুন একটি রেললাইনের মাধ্যমে এটি যুক্ত করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হচ্ছে 'শিল্প অঞ্চলকে' পরিচিত করানো, বন্দরের আশপাশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণের লক্ষ্যে এটি করা হয়েছে। আর দেশের বাজারে সেবা প্রদানকারী কিউবার ও বিদেশি কোম্পানিগুলোকে আকৃষ্ট করা। এই দুটি নতুন ঘটনার সঙ্গে আছে নতুন বিদেশি বিনিয়োগ আইন। বহু বছরের আলোচনার পর এটি ২০১৪ সালের জুনের শেষের দিকে কার্যকর হতে যাচ্ছে। কিউবাবিশারদদের হতাশার কারণ হচ্ছে, এটা ১৯৯৫ সালের আইনের স্রেফ সংশোধন। এতে কর ও অন্যান্য প্রণোদনার মতো বিষয়গুলোর সংস্কারের প্রসঙ্গ ও মার্কিনভিত্তিক বিনিয়োগকারীদের প্রতি আরও উন্মুক্ত আহ্বান থাকলেও মূল নীতি অক্ষুণ্ন থাকছে : কিউবার রাষ্ট্রই সবকিছু দেখভাল করবে, আর তাকে এ মর্মে সন্তুষ্ট করতে হবে যে প্রতিটি বিদেশি বিনিয়োগই উন্নয়নের লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

ডে জিরো

তথাপি, বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সক্ষম হলে বিকৃত একটি প্রবৃদ্ধির মডেল

চিরস্থায়িত্ব পেতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত বিনিময় হারের পার্থক্য একগুচ্ছ আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক, ডলার অরূপান্তরযোগ্য পেসো মূল্য নির্ধারণ করছে। এটা দেশীয় ও বাইরের অর্থনীতির মিলনে ব্যাঘাত ঘটায়। এর মধ্যে আছে পেসো-সিইউসি-ডলার সমতা এবং অনানুষ্ঠানিক কিন্তু বৈধ ক্যাডেকা হার, ২৪ পেসোয় সিইউসি/ডলার। অরাষ্ট্রীয় খাত বিকশিত হওয়ায় এটা ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে যে তুলনামূলকভাবে অদক্ষ বেসরকারি উদ্যোগ দেশজ অর্থনীতির মধ্যেই বিকশিত হতে পারে। কারণ, তাদের শ্রমিকসহ কিউবার পেসোর খরচ ক্যাডেকা/সিইউসি হারে অবমূল্যায়িত হয়, যার মাধ্যমে তারা তাদের বিনিময় করে থাকে। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় খাতের উদ্যোগগুলোকে অতিমূল্যায়িত দাপ্তরিক হারে কাজ করতে হয়েছে, ফলে তারা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। একধরনের 'অর্থভ্রান্তি' বিনিয়োগের জন্য টাকা তুলতে পারে না। অন্যদিকে বেসরকারি খাতের উৎপাদনশীলতা অনেক কম হলেও তারা রাষ্ট্রীয় ভর্তুকি উপভোগ করে, যদিও তাদের অনেক কর দিতে হয়।

২০১১ সালের 'লিনিয়ামেন্টস' ৫৫ অনুসারে, দ্বৈত মুদ্রাব্যবস্থার রাশ টানতে হবে। কিন্তু যা লেখা হয়েছে তা খুবই দুর্বোধ্য আর পরিবর্তনের গতিও খুব ধীর।[৫৪] ঝুঁকি এড়াতে গিয়ে এই শ্লথগতি সৃষ্টি হয়েছে। মুদ্রার কোনো রকম পুনর্বিন্যাস ঘটাতে হলে পুনর্মূল্যায়ন করতে হতো, সেটা খুবই ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারত। আর ১৯৯০-এর শুরুর দিকে পেসোর মান যেভাবে পড়ে যায়, তাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থিতিশীলতা রক্ষায় জোর দেয়। নতুন করে কষ্ট করতে হবে—এই ভয়ে সবাই সতর্ক হয়ে যায়। শুধু সরকার ও আমলাতন্ত্রই নয়, জনগণও সতর্ক হয়ে যায়। অনেক পরিবারই বিকৃত পারিবারিক কাঠামোর সঙ্গে মানিয়ে নেয়, ফলে তারা তাদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রমিক উন্নয়নের ধারণাই মধ্য '৯০ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মুদ্রানীতির ভারসাম্য পুনরুদ্ধারের প্রয়োজনে জল ঢেলে দেয়, কিন্তু পরবর্তীকালের ধীরগতির কারণে বিষয়টি সামনে চলে আসে।

শেষমেশ, ২০১৩ সালের শুরুর দিকে প্রথম পদক্ষেপ গৃহীত হয়। দুই বছরের গবেষণার পর একটি পাইলট কর্মসূচির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগগুলোকে সিইউপি-সিইউসি হার ব্যবহারের অনুমতি দেয়, ১০ পেসোয় এক সিইউসি। অভ্যন্তরীণ সরবরাহকারী অর্থাৎ রাষ্ট্র, সমবায় ও বেসরকারি খাত থেকে কেনার জন্য এটা নির্ধারণ করা হয়। ২০১৩ সালের অক্টোবরে সরকার ঘোষণা করে, মুদ্রা সংস্কারের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৪ সালের মার্চে এটা মূল্য নির্ধারণের বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করে, ডে জিরোর হিসাব মেলানোরও নির্দেশনা প্রদান করে; যখন সিইউসি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হবে।[৫৫] কিউবার পেসোকে তখন অনুমেয়ভাবেই বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরযোগ্য করা হয়, যদিও বিনিময়ের বিস্তারিত

পরিকল্পনা সম্পর্কে জানা যায়নি। বিম্বের হার কমানোর জন্য রাষ্ট্র পেসোর মূল্যের নতুন মানদণ্ড নির্ধারণ করবে, আর প্রাথমিক ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ভর্তুকি দেবে। একক মুদ্রায় যে নতুন মূল্য প্রাধান্য বিস্তার করবে, সেখানে ১৯৯০ সালের পর থেকে পেসোর আন্তর্জাতিক ক্রয়ক্ষমতা হ্রাসের ব্যাপারটি প্রতিফলিত হবে। আর ১৯৯০ সালের পর থেকে বেসরকারি খাতে যে গোপন ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে, তা তুলে নেওয়া হবে।

মজুরির তারতম্য বেশ চোখে পড়ার মতোই। কিন্তু ভোগের ক্ষেত্রে সেটাই প্রধান নির্ধারক নয়, সেটা নির্ভর করে সিইউসিএসএর লভ্যতার ওপর। সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খেয়েছে, তারা অনেকেই পিসিসি সদস্য ও কর্মকর্তা। তাদের অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার কথা নয়। তারা হয়তো সহৃদয়তার মতো অগ্রাধিকার পেতে পারে, কিন্তু আয়ের ক্ষেত্রে তেমন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কিছু পেশাদারের ক্ষেত্রে দেশের বাইরে গিয়ে কাজ করে প্রচুর টাকা উপার্জনের সুযোগ আছে, সেই টাকায় বাড়িঘর সংস্কারের মতো কাজ তারা করতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সরকারি কর্মীদের অতিরিক্ত বোনাস অর্জনের সুযোগ আছে। প্রথমত, সেখানে মৌলিক পণ্য যেমন টুথপেস্ট ও ব্লিচের সুযোগ আছে। এখন ১০-২৫ সিইউসিএস বোনাস কমবেশি সাধারণ হয়ে গেছে। গত এক দশকে অনেক পরিবারের আয় বেড়েছে, ফলে তারা মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারে, বাড়িঘর সংস্কার করতে পারে ও পুরোনো গাড়িও কিনতে পারে। কিন্তু জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবে গড়পড়তা আয় বাড়েনি, ফলে যারা শুধু পেসোর বেতনের ওপর নির্ভর করে, তাদের জীবন খুবই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

ধনীরা সেখানে সংখ্যালঘু, স্বতন্ত্র এক গোষ্ঠী। তারা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ভাগ্যবান গোষ্ঠী, তারা বৈধ ও অবৈধভাবে অরাষ্ট্রীয় উদ্যোগের মালিক। এদের মধ্যে আছে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যবস্থাপক, আর অসৎ সরকারি কর্মকর্তা। তার মানে, তারা সরকারের কাছ থেকে এসব অগ্রাধিকার পায় না। তারা এক ভিন্ন জগতে বাস করে, সিংহভাগ জনগণের বাইরে তাদের অবস্থান। এই গোষ্ঠী-বিষয়ক নীতি হচ্ছে, অর্থনৈতিক অপরাধ চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা ও করকাঠামো শক্তিশালী করা। যাতে উচ্চ আয়ের মানুষদের কাছ থেকে কর সংগ্রহ করা যায়, আয় ও খুচরা অন্যান্য খাত থেকেও এই কর সংগ্রহ করার লক্ষ্য আছে তাদের। কিন্তু সরকার বৈধ খাত থেকে উচ্চ আয় করার ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করছে না। ফলে বেসবল খেলোয়াড়দের বিদেশে খেলার ওপর আর নিষেধাজ্ঞা থাকল না। কিউবার মানুষেরা এখন বিদেশে ভ্রমণ ও কাজ করার ক্ষেত্রে স্বাধীন, এমনকি তারপর তারা দেশেও ফিরে আসতে পারে।

সিংহভাগ জনগণের ক্ষেত্রে জীবনমান উন্নয়নের হার খুব নগণ্য, গতিও খুব

ধীর। হাভানায় আবার বহু মানুষ অসৎ পন্থায় টাকা কামাই করেছে, ফলে সেসব হাড়ভাঙা খাটুনি করা মানুষের জন্য এটা খুব অসহনীয়। মৌলিক পণ্যে এখনো ভর্তুকি দেওয়া হয়, কিন্তু রেশন থেকে অনেক প্রধান খাবারই সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেগুলো এখন কৃষিবাজার থেকে কিনতে হয়। এটা ছিল খুবই ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, এর সঙ্গে বেতন বেড়েছেও সামান্য, বোনাস পাওয়া মানুষের সংখ্যাও বেড়েছে শম্বুকগতিতে। বিদ্যুৎ সরবরাহ উন্নত হয়েছে। কিন্তু পানি ও বিদ্যুতের মতো পরিষেবার খরচ বাড়ায় মজুরির বৃদ্ধি আর গায়ে লাগে না। ফলে অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই জীবনমানের উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো নয়। তারপরও নিরাপত্তা জাল জারি আছে, অবকাঠামো ও সরকারি সেবা নিশ্চিতভাবে আগের চেয়ে ভালো হয়েছে। এতে যে সরকার নতুন উপার্জন ও পেশাদারি সেবা রপ্তানি থেকে প্রাপ্ত কর ব্যয় করতে চায়, সেটি প্রতিফলিত হয়।

বিকল্প?

রাউল কাস্ত্রোর দ্বিতীয় দফা রাষ্ট্রপতিত্বের মেয়াদ শেষ হবে খুব বেশি হলে ২০১৮ সালে। ২০১৬ সালে বর্তমান নির্দেশনার আলোকে 'হালনাগাদকরণ' শেষ হবে, ফলে তখন অর্থনীতির লক্ষ্য হবে একটি বৃহৎ উৎপাদন খাত ও বড় বেসরকারি খাত নির্মাণ করা। আবার সার্বিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণের জায়গাগুলো ঠিক রাখাও এই উদ্দেশ্যের আওতায় পড়ে। এটা অর্জন করতে গেলে বিনিয়োগের হার বাড়াতে হবে। নতুন বন্ধু যেমন চীন, ব্রাজিল ও রাশিয়ার সঙ্গে কিউবার আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় রাখার সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা তার পক্ষে সম্ভব হবেই বলে আশা করা যায়। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির কার্যকারিতা ও গতিশীলতা বজায় রাখাই হবে কঠিন কাজ। আবার একই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান আয়বৈষম্য ও সামাজিক বিভাজন ঠেকানোই কঠিন কাজ হবে, যা রাষ্ট্রীয় সমাজতান্ত্রিক প্রকল্পের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে।

কিউবাকে ফুরিয়ে যাওয়া শক্তি হিসেবে বাতিল করার আগে আজ পর্যন্ত তার অর্জনের বিশালত্ব স্বীকার করে নিতে হবে। বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য ও গতিশীলতা আসে, এটা স্বীকার করে নিলেও কিউবার নীতিপ্রণেতারা পূর্ণাঙ্গ বেসরকারীকরণ ও উদারীকরণের সম্ভাবনা একদম খারিজ করে দেননি। তাঁরা সব সময় এর সামাজিক খরচের ব্যাপারে মনোযোগী। এই মনোভঙ্গি গড়ে ওঠার পেছনে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কোনো ভূমিকা নেই। বরং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক সুরক্ষার সফলতার পরিপ্রেক্ষিতে এটা ওয়াশিংটন কনসেনসাসের ভবিষ্যদ্বাণীকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। পূর্ব ইউরোপের সাবেক কমিকন সদস্য এবং চীন ও ভিয়েতনামের সঙ্গে তুলনা করলেও কিউবার উন্নয়নের কিছু

অনন্য বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে।

প্রথমত, সংকটের সময়ও কিউবা তার সামাজিক সুরক্ষা খাত বজায় রেখেছে, এ ক্ষেত্রে অন্যদের সঙ্গে তার পার্থক্য খুবই দৃশ্যমান। এই দ্বীপরাষ্ট্রটির ওপর বাইরের যে চাপ ছিল, তা অনন্য। তাকে বৈরিতাও সামলাতে হয়েছে অনেক। কিন্তু সর্বজনীন জনকল্যাণের প্রতি তার যে প্রতিশ্রুতি ছিল, সে কারণে তার পক্ষে সামাজিক দুর্দশা সামলানো সম্ভব হয়েছে। এর সঙ্গে তারা প্রচুর মানুষের পরামর্শ নিয়েছে, বিশেষ করে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে—সংকটের শুরুতে, স্থিতিশীল হওয়ার পর্যায়ে আর রাউল কাস্ত্রোর সমন্বয়ের নতুন পর্যায়ের আগে। তৃতীয়ত, ধাক্কা এবং তা সামলানোর শুরুর দিকে মূল্য ও মজুরির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ফলে মূল্যস্ফীতিতে লাগাম দেওয়া সম্ভব হয়েছে, ফলে খুব দ্রুতই স্থিতিশীলতা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। মজুরি ও মূল্য নির্ধারণের কারণে অনানুষ্ঠানিক অর্থনীতির দ্রুত বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এতে অর্থনীতির আনুষ্ঠানিক খাতে তেমন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়নি, আর সেখানে আয়বৈষম্যও কমানো সম্ভব হয়েছে। দুটি ব্যাপার একদম আলাদা হলেও এর সঙ্গে চীনের 'ডুয়েল ট্র্যাক' ব্যবস্থার মিল রয়েছে। যেখানে একটি পরিকল্পিত 'পথ' থাকলেও এর সঙ্গে আরেকটি 'বাজার' সৃষ্টি হয়। এতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও শিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। বিভ্রান্তি ও অকার্যকারিতা থাকা সত্ত্বেও কিউবার 'বিভক্তিকরণ' ও 'দ্বিতীয় অর্থনীতি' দেশটিকে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করেছে।

চতুর্থত, রাষ্ট্র অর্থনৈতিক পুনঃকাঠামোর নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতেই রাখে। এতে রাষ্ট্র কষ্টার্জিত টাকা কিছু নির্ধারিত শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ দেয়। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও ব্যাপক সফলতা আসে, লভ্য পুঁজির সঙ্গে এর সম্পর্ক ছিল আপেক্ষিক। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে কিউবার পরিকল্পনাবিদেরা 'শেখার সুযোগ' পেয়েছেন। ব্যবস্থাপক ও শ্রমিকেরা চিন্তা করার সুযোগ পেয়েছেন, কীভাবে পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়। এই মনোভঙ্গির কারণে যে রপ্তানির ক্ষেত্র তৈরি হয়, তার মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। কারণ এটি ছিল খুবই সংকীর্ণ। কিন্তু সংকটকালের পর সক্ষমতা পুনরুদ্ধারে এটা কার্যকর হয়েছিল। শেষমেশ কিউবা মূলধারার 'পুঁজিবাদে উত্তরণের' পথ পরিহার করায় সমন্বয়-প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। একজন কর্মকর্তা এটাকে 'চিরস্থায়ী বিবর্তন'[৫৭] হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এটা স্থিতিস্থাপক, কিউবার পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রতিবন্ধকতার প্রতি সংবেদনশীল। অন্য কমিকন দেশগুলোতে উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের পরামর্শকেরা যে বাঁধাধরা রেসিপি দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে এর পার্থক্য যোজন যোজন। কিউবা একটি দরিদ্র দেশ। কিন্তু তার স্বাস্থ্য ও শিক্ষাব্যবস্থা এই অঞ্চলের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে আছে। এর

মনোভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, বৈপরীত্য ও সমস্যা থাকলেও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন মডেলের মধ্যেও বাজার ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফল বেশ ইতিবাচক। এর ফলে পরবর্তী প্রশ্নের উদয় হয়—আমাদের এটা কেন ধরে নিতে হবে যে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন থেকে রাষ্ট্রকে সরে আসতে হবে। অথবা তা না হলে রাষ্ট্রকে পুঁজিবাদে উত্তরণের নীতি গ্রহণ করতে হবে।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. Carmelo Mesa-Lago, 'Economic and Ideological Cycles in Cuba: Policy and Performance, 1959–2002', in Archibald Ritter, ed., *The Cuban Economy*, Pittsburgh 2004.

২. Eliana Cardoso and Ann Helwege, *Cuba after Communism*, Cambridge, ma 1992, pp. 51, 1, 11; Andrés Oppenheimer, *Castro's Final Hour*, New York 1992.

৩. বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার পর আমেরিকান বাজারে প্রবেশ বাতিল হলে কিউবা পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহায়তা কাউন্সিল বা কমিকনে (COMECON) ১৯৭০ সালে যোগ দেয়। ১৯৮৯ সালের অন্য সদস্যগুলো হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং ভিয়েতনাম, 'ক্রান্তিকালীন অর্থনীতি'তে মঙ্গোলিয়া ও ভিয়েতনাম ছাড়া সব কমিকন সদস্য রয়েছে।

৪. See Manuel Franco et al., 'Impact of Energy Intake, Physical Activity and Population-wide Weight Loss on Cardiovascular Disease and Diabetes Mortality in Cuba, 1980–2005', *American Journal of Epidemiology*, vol. 166, no. 12, September 2007.

৫. স্নায়ুযুদ্ধকালীন ক্রেমলিনোলজির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ১৯৭০ সালে কিউবানোলজি শব্দটির উৎপত্তি করা হয় : Helen Yaffe, *Che Guevara: The Economics of Revolution*, Basingstoke 2009, p. 4. Yaffe itemizes the research commissioned by the Pentagon, Special Operations Research Office, cia, 'National Defence Education' and the Cuban-American National Foundation, the powerful *émigré* lobby.

৬. See John Williamson, 'What Washington Means by Policy Reform', in John Williamson, ed., *Latin American Adjustment: How Much Has Happened?*', Washington, dc 1990.

৭. János Kornai, *The Road to a Free Economy*, New York 1990, p. 31.

৮. Anders Åslund, 'Principles of privatization for formerly socialist countries', Stockholm Institute of Soviet and East European Economics Working Paper 18, 1991; Leszek Balcerowicz, 'Common fallacies in the debate on the transition to a market economy', *Economic Policy*, vol. 9, no. 19, December 1994.

৯. Gérard Roland, *Transition and Economics: Politics, Markets and Firms*, Cambridge, ma 2000, p. 14.

১০. 'Anti-market features': Mesa-Lago, 'The Economic Effects on Cuba of the Downfall of Socialism in the ussr and Eastern Europe', in Mesa-Lago, ed.,

Cuba after the Cold War, Pittsburgh 1993, p. 176; 'half-baked': Mesa-Lago, *Are Economic Reforms Propelling Cuba to the Market?*, Miami 1994, pp. 70–1.

১১. Mesa-Lago, *Cuba after the Cold War*, pp. 246–7; Rubén Berríos, 'Cuba's Economic Restructuring, 1990–1995', *Communist Economies and Economic Transformation*, vol. 9, no. 1, 1997, p. 117; Mauricio de Miranda Parrondo, 'The Cuban Economy: Amid Economic Stagnation and Reversal of Reforms', Canadian Foundation for the Americas, Ontario 2005.

১২. ১৯৯৫ সালে পরিচালিত অনেকগুলো গবেষণার সময় মিনিস্ট্রি অব ফরেন ইনভেস্টমেন্ট (মিনভেক), মিনিস্ট্রি অব টুরিজম (মিনটুর) চেম্বার অব কমার্স, মিনিস্ট্রি অব বেসিক ইন্ডাস্ট্রি, মিনিস্ট্রি অব ফরেন ট্রেড এবং কিউবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক; হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এবং তাবাজেস্ট ও কিউবানিকেলের ম্যানেজারদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

১৩. যদিও কিউবায় প্রভাব খাটানো এবং অবৈধ সম্পদ বৃদ্ধির ঘটনা ঘটে, তবে নৈতিক অবস্থা বজায় রাখার প্রবল চেষ্টা শুধু সরকারি কর্মচারী এবং দলীয় সদস্যদের আনুষ্ঠানিক নিয়ম এবং যারা দুর্নীতিতে ধরা পড়ে, তাদের কঠিন শাস্তির মধ্যেই দৃশ্যমান নয় বরং বেশির ভাগ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর কার্যাবলিতেও দেখা যায়। বিস্তর একটি গবেষণার মাধ্যমে কিউবায় দুর্নীতির মাত্রা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সেখানে দুর্নীতির উল্টো চিত্র ও তা দমনে প্রচেষ্টার মাত্রা পাওয়া গেছে: Sergio Diaz-Briquets and orge Pérez-López, *Corruption in Cuba: Castro and Beyond*, Austin 2006. কিউবা বিশ্বব্যাংক ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতি পরিমাপ সূচকে ভালো স্কোর করেছে।

১৪. For example, Cardoso and Helwege, *Cuba after Communism*, pp. 44–6.

১৫. Richard Gott, *Cuba: A New History*, New Haven, ct 2004, p. 325. See also Isaac Saney, *Cuba: A Revolution in Motion*, London and New York 2004; Antonio Carmona Báez, *State Resistance to Globalization in Cuba*, London 2004.

১৬. Manuel Pastor and Andrew Zimbalist, 'Waiting for Change: Adjustment and Reform in Cuba', *World Development*, vol. 23, no. 5, 1995. See also Jorge Domínguez and Daniel Erikson, 'Cuba's Economic Future: A Dozen Comparative Lessons', in Shahid Javed Burki and Daniel Erikson, eds, *Transforming Socialist Economies: Lessons for Cuba and Beyond*, Basingstoke 2005; Susan Eckstein, *Back from the Future: Cuba under Castro*, New Brunswick 1994.

১৭. José March-Poquet, 'What Type of Transition Is Cuba Undergoing?', *Post-Communist Economies*, vol. 12, no. 1, 2000; Claes Brundenius, 'Whither the Cuban Economy after Recovery?', *Journal of Latin American Studies*, vol. 34, no. 2, May 2002.

১৮. An exception is a cursory comparison between Cuba and transition economies by Mesa-Lago and Pérez López (*Cuba's Aborted Reform: Socioeconomic Effects, International Comparisons, and Transition Policies*, Gainsville, fl 2005, pp. 158–164). তাদের তথ্যে দেখা যায় যে কিউবার জিডিপি ক্রান্তিকালীন অর্থনীতির কাছাকাছি চলে গেছে। কিন্তু আলোচনাটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে

শক্তিশালী দেশগুলোর তুলনায় কিউবার দুর্বলতা দেখায় এবং কোনোভাবে যে কিউবার নীতি তার প্রবৃদ্ধিকে উপকৃত করতে পারত সে সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়।

১৯. দানি রদ্রিক ও অন্যান্য—বিশেষ করে ইয়েঙ্গি কিয়ান একটি 'বিশ্লেষণাত্মক আখ্যান' অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে কীভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শর্তাবলি নীতি ফলাফলকে নির্ধারণ করেছে তা দিয়ে রূপান্তরের সম্ভাব্য পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন, 'How Reform Worked in China,' in Rodrick, ed., *In Search of Prosperity: Analytic Narratives on Economic Growth*, Princeton and Oxford 2003.

২০. See José Luis Rodríguez García's report, 'La Economía de Cuba ante la cambiante coyuntura internacional', in *Economía Cubana*, vol. 1, nos. 1 and 2, 1991 and 1992.

২১. oecd, *Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries*, 1998.

২২. On post-crisis strategy as *rectificación*, see the contributions by Mesa-Lago, Svejnar and Pérez López in Mesa-Lago's *Cuba after the Cold War*; Jorge Pérez López, 'Castro Tries Survival Strategy', *Transition*, World Bank 1995. On failure to address the crisis: Marifeli Pérez-Stable, *The Cuban Revolution: Origins, Course and Legacy*, Oxford 1999, p. 176.

২৩. Nauro Campos and Fabrizio Coricelli, 'Growth in Transition: What We Know, What We Don't and What We Should', *Journal of Economic Literature*, vol. 40, no. 3, September 2002, Table 6.

২৪. *Economía Cubana: Boletín Informativo*, vol. 1, no. 2, p. 21 and vol. 1, no. 7, p. 22, 1992.

২৫. José Alvarez, 'Overview of Cuba's Food Rationing System', Gainsville, fl 2004, p. 4.

২৬. Paul Collins, 'Cuba's Food Distribution System', in Sandor Halebsky et al., *Cuba in Transition: Crisis and Transformation*, Boulder, co 1992.

২৭. Julia Wright, *Sustainable Agriculture and Food Security in an Era of Oil Scarcity: Lessons from Cuba*, London 2008.

২৮. Efforts to sustain basic nutrition are described by Angela Ferriol Muruaga in 'La seguridad alimentaria en Cuba', *Economía Cubana: Boletín Informativo*, vol. 2, no. 3, 1996; 'Pobreza en condiciones de reforma económica: el reto a la equidad en Cuba', *Cuba: Investigación Económica* 4, no. 1, inie, 1998; 'Política social cubana: situación y transformaciones', *Temas*, 1998; and 'Retos de la política social', *Cuba: Investigación Económica* 11, no. 2, 2005.

২৯. Antoni Kapcia, *Cuba in Revolution: A History Since the Fifties*, London 2008, p. 165, describes the creation of the Consejos Populares, 'a new level of barrio-level political representation'.

৩০. Elena Álvarez, 'Características de la Apertura Externa Cubana (I)', *Economía Cubana: Boletín Informativo*, vol. 1, no. 26, 1996.

৩১. pcc, *iv Congreso del Partido Comunista de Cuba: Discursos y Documentos*, Havana 1992.

৩২. For the account, see Gail Reed, *Island in the Storm: The Cuban Communist Party's Fourth Congress*, Melbourne and New York 1992.

৩৩. Campos and Corricelli, 'Growth in Transition: What We Know', Table 10.

৩৪. Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, London 2002, pp. 133–65; see also Branko Milanovic´, 'Income, Inequality and Poverty during the Transition from Planned to Market Economy', *World Bank Regional and Sectoral Studies*, Washington, dc 1998.

৩৫. Marisa Wilson, 'No Tenemos Viandas! Cultural Ideas of Scarcity and Need', *International Journal of Cuban Studies* 3, June 2009.

৩৬. Early 1990s editions of *Economía Cubana: Boletín Informativo* trace the shifting preoccupations and responses.

৩৭. George Carriazo, 'Cuba: Apertura y adaptación a una nueva realidad', *Economía Cubana: Boletín Informativo* 15, May 1994.

৩৮. Fidel Castro, *Por el camino correcto: Recopilación de textos*, Havana 1986, quoted in Díaz-Briquets and Pérez-López, *Corruption in Cuba*, p. 164. ১৯৮৬ সালে র‍্যাটিফিকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে বন্ধ হওয়া কৃষক বাজার আবার খুলে দেওয়ার একটি প্রস্তাব ১৯৯১ সালে পিসিসি কংগ্রেস দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে; সম্প্রতি ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বরে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি আরেকটি পুনঃ প্রবর্তন প্রস্তাব বরখাস্ত করেছে। এই বিষয়টি পার্লামেন্টোস ওবরেরোস জানু-মে ১৯৯৪-এর আলোচ্যসূচি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৩৯. Carriazo, 'Cuba: Apertura y adaptación a una nueva realidad'.

৪০. Campos and Coricelli, 'Growth in Transition: What We Know', Table 6.

৪১. onei; World Bank, *World Development Indicators*.

৪২. Average calorie intake was back at pre-crisis level by 1999: Franco et al, 'Impact of Energy Intake'.

৪৩. ১৯৯০-৯৪ সালে পেসোর মূল্য নিম্নমুখী থাকার সময় ভোক্তার মূল্যসূচক প্রকাশিত হয়নি, তাই আনুষ্ঠানিক কোনো মজুরি ইনডেক্স নেই। নিম্ন খাদ্যমূল্য ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে সরকারি ভোক্তা মূল্যসূচক যথাক্রমে ১১.৫ ও ৪.৯ শতাংশ কমিয়েছে।

৪৪. ১৯৯৭-২০০০ সালে কিউবার আনুষ্ঠানিক বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির গড় ছিল শূন্য এবং ২০০০-১২ সালে মাত্র ২ শতাংশ যেখানে ক্রান্তিকালীন অর্থনীতির দেশগুলোয় ৯০ দশকের শেষে গড়ে ২৮ শতাংশ এবং ২০০০-১২তে ৮ শতাংশ ছিল। কিউবার সরকারি মূল্যহার নিয়ে অনেক বিতর্ক রয়েছে; গৃহস্থালিগুলোর মধ্যে প্রকৃত জীবনযাত্রার ব্যয়ে ভিন্নতা রয়েছে যা কোন ধরনের বাজারে তারা কত পরিমাণ ব্যয় করেছে তার ওপর নির্ভর করে—সরকারি বা বেসরকারি, শহুরে বা গ্রামীণ, পেসো বা স্থিত মুদ্রা। আবার মূল্যও অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। যাহোক, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে যদিও ক্রয়ক্ষমতা কমতে পারত, কিন্তু গৃহস্থালিগুলোর প্রকৃত ভোগ এমন হারে কমেনি যা '৯০ দশকের মাঝামাঝি থেকে ক্রান্তিকালীন অর্থনীতির দেশগুলোর গড় মুদ্রাস্ফীতির সমান হতে পারত।

৪৫. এসব আত্মস্বীকৃত রাষ্ট্রবহির্ভূত ক্ষমতা মার্কিন মিত্রদের অনেকগুলোর মধ্যে একটি প্রতিবাদ জাগিয়েছিল : ইইউ ডব্লিউটিওতে হেলমস-বার্টনের ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং তখনই শুধু সরে দাঁড়ায় যখন যুক্তরাষ্ট্র ইইউ দেশগুলোর বিচার করবে না বলে রাজি হয়। কানাডা, মেক্সিকো, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি এবং নেদারল্যান্ডস কিউবার সঙ্গে বাণিজ্য চালিয়ে যায়; কানাডার কোম্পানি শেরিত ইন্টারন্যাশনালের কর্মকর্তাদের যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

৪৬. Julio Carranza Valdés, Luis Gutiérrez Urdaneta, and Pedro Monreal González, *Cuba: Restructuring the Economy: A Contribution to the Debate*, London 1996. The sequence of events is documented in Mauricio Guilliano, *El Caso de cea: Intelectuales e Inquisidores en Cuba. ¿Perestroika en la Isla?*, Miami 1998.

৪৭. Investment rates of the 1990s are provided by Campos and Coricelli, 'Growth in Transition: What We Know'; more recent data is provided by the undp and World Bank *World Development Indicators*.

৪৮. fdi policy is discussed more fully in Emily Morris, 'Cuba's New Relationship with Foreign Capital: Economic Policy-Making since 1990', *Journal of Latin American Studies*, vol. 40, no. 4, 2008.

৪৯. World Bank (data are for Central and Eastern Europe).

৫০. কিউবার প্রকৃত জিডিপি সিরিজটি ১৯৯৭ সালের মূল্য ও মূল্য সংশোধনীর ওপর নির্ভর করে করা হয়েছে। তাই বার্ষিক প্রবৃদ্ধি হারে কিছুটা গরমিল থাকতে পারে, যদিও তা সামগ্রিক চিত্রে তেমন কোনো পার্থক্য তৈরি করে না। শুরুতে জর্গ পেরেজ-লোপেজ এবং কারমেলা মেসা-লাগো ২০০৫ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত একটি প্রবৃদ্ধির উত্থানের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছে এবং সেটাকে 'পরম্পরতাহীন, ইচ্ছাকৃত অস্পষ্টতা ও ধাঁধা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল : See 'Cuban GDP statistics under special Period,' *Cuba in Transition 2009*, ASCE, PP. 153-66. তারা আনুষ্ঠানিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির চিত্র গ্রহণ করতে তখনই রাজি হয়েছিল, যখন সে চিত্রে স্থবিরতা প্রদর্শন করছিল।

৫১. 'Revolution senses the historical moment; it changes everything that must be changed': Fidel Castro, 1 May 2000.

৫২. Partido Comunista de Cuba, 'Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución', 2011.

৫৩. On the role of trade unions see Steve Ludlam, 'Cuban Labour at 50: What About the Workers?', *Bulletin of Latin American Research*, vol. 28, no. 4, 2009, and 'Aspects of Cuba's Strategy to Revive Socialist Values', *Science and Society*, vol. 76, no. 1, 2012, pp. 41–65. সরকার ও ইউনিয়নের সর্বশেষ আলোচনার ফলাফল ছিল লেবার কোড (ল'১১৬) যা ২.৮ মিলিয়ন শ্রমিকের সঙ্গে আলোচনা করে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে অনুমোদিত হয়েছে।

৫৪. আক্ষরিক অনুবাদ : 'আর্থিক একত্রীকরণে অগ্রগতি, শ্রমিকদের উৎপাদনক্ষমতা এবং বণ্টন ও পুনঃবণ্টন প্রক্রিয়া কার্যকারিতাকে গ্রহণ করার মাধ্যমে এগিয়ে যাবে। এর জটিলতার কারণে এই প্রক্রিয়ায় অবজেক্টিভ ও সাবজেক্টিভ দুই পর্যায়েই কঠোর প্রস্তুতি ও কার্যোদ্ধার প্রয়োজন।'

৫৫. *Gaceta Oficial*, 6 March 2014.

৫৬. For further details, see 'Cuba prepares for exchange-rate reform', Economist Intelligence Unit, 12 March 2014.

খাতি চিন্তা
বই আলোচনা

ইসলামি রাষ্ট্রের পতন ও উত্থান

আইরিন খান

দ্য ফল অ্যান্ড রাইজ অব দ্য ইসলামিক স্টেট—নোআহ ফেল্ডম্যান, প্রিন্সটন : প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৮।

৯/১১ ও ২০১১-পরবর্তী পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত বিভিন্ন দেশে শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন এসেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটলেও মানচিত্রের এই অংশ দীর্ঘদিন ধরে ছিল স্বৈরশাসনের অধীন। ২০১১-পরবর্তী বিভিন্ন দেশে স্বৈরশাসনের পতনের পর নতুন শাসনব্যবস্থা কী হবে তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে রয়েছে নানা মতবাদ। আফগানিস্তান ও ইরাকে গণতন্ত্র ব্যর্থ হওয়ায় পশ্চিমা শক্তিরা বুঝতে পেরেছে যে এই ভূখণ্ডে উদারবাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় এখন নয়। উপরন্তু এই দেশগুলোর জনগণের মধ্যে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি সমর্থন রয়েছে। এমতাবস্থায় এই দেশগুলোতে নতুন এক মতবাদের প্রবর্তন দেখা যাচ্ছে, যা গণতন্ত্র ও ইসলামবাদের একটি মিশ্রণ। এই মতবাদকে বলা হচ্ছে 'ইসলামবাদ' বা 'রাজনৈতিক ইসলাম'। বর্তমানে বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান মূলত এই 'ইসলামবাদ' মতবাদের আলোকে। নোআহ ফেল্ডম্যান *দ্য ফল অ্যান্ড রাইজ অব দ্য ইসলামিক স্টেট* বইটিতে মূলত এই মতবাদের প্রতি সমর্থন রেখে আলোচনা করেছেন। ফেল্ডম্যান মনে করেন, ইসলাম ও গণতন্ত্র সংগতিপূর্ণ। শরিয়তের গণতন্ত্রায়ণ ও সাংবিধানিকীকরণ করে যথার্থ প্রতিষ্ঠানিকীকরণের মাধ্যমে ইসলামি রাষ্ট্র কার্যকর করা সম্ভব। লেখক বইটিতে বিভিন্ন যুক্তি ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে বলেছেন কীভাবে এই নতুন ইসলামি রাষ্ট্র সফলতা লাভ করতে পারে।

মার্কিন নাগরিক নোআহ ফেল্ডম্যান একজন লেখক ও একাধারে হার্ভার্ড ল স্কুলের আইন বিষয়ের অধ্যাপক। তিনি *নিউইয়র্ক টাইমস* ম্যাগাজিনের লেখক ও কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশন্স-এর সিনিয়র ফেলো। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি স্নাতক, ইয়েল থেকে আইন ও অক্সফোর্ড থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। ২০০৩ সালে তিনি জ্যেষ্ঠ সাংবিধানিক উপদেষ্টা হিসেবে ইরাকে 'কোয়ালিশনাল প্রভিশনাল' কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করেন। তিনি একই সঙ্গে ইরাকের নতুন সংবিধান লেখার উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন। ফেল্ডম্যান কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হলো: *আফটার জিহাদ: আমেরিকা দ্য স্ট্রাগল ফর ইসলামিক ডেমোক্রেসি* (২০০৩), *হুয়াট উই ও ইরাক: ওয়ার অ্যান্ড দ্য এথিকস অব নেশন বিল্ডিং* (২০০৪)—What We Owe Iraq: War and the Ethics of Nation Building, *ডিভাইডেড বাই গড: আমেরিকাস চার্চ—স্টেট প্রবলেম অ্যান্ড হুয়াট উই শুড ডু অ্যাবাউট ইট* (২০০৫) Divided by God: America's Church-State Problem and What we Should Do About It. *দ্য ব্যাটেলস অ্যান্ড ট্রিয়াম্পস অব এফডিআর'স গ্রেট সুপ্রিম কোর্ট জাস্টিসেস* (২০১০) Scorpions: The Battles and Triumphs of FDR's Great Supreme Court Justices. এবং *কুল ওয়ার: দ্য ফিউচার অব গ্লোবাল কম্পিটিশন* (২০১৩) Cool war: The Future of Global Competition[১]. ফেল্ডম্যান একজন অ-ইহুদি (non-Jew) নারীকে বিয়ে করার জন্য সনাতনী (orthodox) ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে নিন্দিত।[২] তিনি আরব বিশ্বের ইসলামপন্থীদের প্রতি নমনীয় দৃষ্টি রেখেছেন। তিনি মনে করেন, এই ভূখণ্ডে গণতন্ত্র কায়েমে ইসলামপন্থীরাই একমাত্র ভরসা।[৩] তিনি তাঁর এমন ধারণার জন্য বিশ্বজুড়ে সমালোচিত। এত সমালোচনার পরও ফেল্ডম্যান সমাদৃত। *নিউইয়র্ক* ম্যাগাজিন ফেল্ডম্যানকে একজন নতুন ধারার প্রভাবক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মার্কিন পত্রিকা/সাময়িকী *ইস্কয়ার* তাদের ২১ শতকের সর্বাধিক প্রভাবশালী মানুষের তালিকায় ফেল্ডম্যানকে 'আমাদের সময়ের একজন বুদ্ধিজীবী' হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

সরকার ও রাজনীতিতে কৃতিত্ব রাখার জন্য ফেল্ডম্যান *দ্য ফল অ্যান্ড রাইজ অব দ্য ইসলামিক স্টেট* বইটির জন্য ২০০৮ সালে 'প্রোজ' (Prose Award) পুরস্কার পান। ২০১২ সালে লেখক বইটিতে একটি নতুন সূচনা যোগ করেন, যেখানে তিনি ইসলামবাদের উত্থান বর্ণনা করেছেন, আলোকপাত করেছেন ২০১১-পরবর্তী আরব বিশ্বে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন-পরবর্তী রাজনৈতিক ইসলামবাদে বিশ্বাসী বা ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি জনসমর্থন সম্পর্কে।

১৩০০ বছর ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম থেকেছে। এর অবসান বা পতন ঘটেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে। নোআহ ফেল্ডম্যান

১৩০০ বছরের ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার অবসানকে 'ইসলামি রাষ্ট্রের পতন' ও ৯/১১ ও ২০১১-পরবর্তী শরিয়ত আইনের প্রতি জনসমর্থনকে 'ইসলামি রাষ্ট্রের উত্থান' হিসেবে আখ্যা করেছেন। পতনের আগের ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থাকে তিনি বলছেন, 'ট্র্যাডিশনাল বা ক্লাসিক্যাল ইসলামিক স্টেট' (traditional/Classical Islamic State) বা 'ঐতিহ্যিক/ধ্রুপদি ইসলামি রাষ্ট্র' এবং বর্তমানে সাংবিধানিক গণতন্ত্রের সংমিশ্রণে যে শরিয়ত আইন প্রণয়নের ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে তাকে লেখক বলছেন, 'Political Islam' ও 'Islamism' বা 'রাজনৈতিক ইসলাম' ও 'ইসলামবাদ/ইসলামবাদিতা'। এই আধুনিক রাজনৈতিক ইসলামের মতাদর্শে বিশ্বাসী এই ধারার প্রবর্তকদের বলেছেন, 'Islamic Democrats' ও 'Islamists' বা 'ইসলামি গণতন্ত্রবাদী' বা 'ইসলামপন্থী গণতন্ত্রবাদী' ও 'ইসলামপন্থী'। নোআহ ফেল্ডম্যান *দ্য ফল অ্যান্ড রাইজ অব দ্য ইসলামিক স্টেট* বইটি তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে লিখেছেন। প্রথম অধ্যায়ে লেখক পতন-পূর্ববর্তী অর্থাৎ ১৩০০ বছর ধরে যে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা চলেছে অর্থাৎ 'ঐতিহ্যিক বা ধ্রুপদি ইসলামি রাষ্ট্র' তার শক্তিশালী দিকগুলো তুলে ধরেছেন। লেখক এই ব্যবস্থার বর্ণনা করে বলেছেন কী কী কারণে এই ব্যবস্থার স্থায়িত্ব এত দিন ছিল। এ ব্যবস্থায় 'খিলাফত প্রথা'র মাধ্যমে শাসনকাজ পরিচালিত হতো। আইনের যথার্থ প্রয়োগ ও বিচারের জন্য খলিফা ও আইনি বিচারক ও জনগণের মাঝে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য ছিল 'Scholors' বা 'ধর্মীয় পণ্ডিত/ধর্মগুরু'। ১৯০০ শতকে অটোম্যান শাসনব্যবস্থার অধীনে এ ব্যবস্থার বিনাশ ঘটে। রাজনৈতিক সংস্কারের নামে ধর্মগুরুদের কার্যকারিতা কমিয়ে খলিফাদের একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাতে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার স্থায়িত্বের যে মূল কারণটি ছিল—ক্ষমতার ভারসাম্য, তা ভেঙে যায় এবং এ ব্যবস্থা পতনমুখী হয়। বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক ক্লাসিক্যাল ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা পতনের কারণগুলো ব্যাখ্যা করেছেন। তৃতীয় অধ্যায় ফেল্ডম্যান ব্যাখ্যা করেছেন বর্তমান ইসলামবাদিতার ধারণা ও তার উত্থান সম্পর্কে।

১.

৯/১১-পরবর্তী বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো জনসমর্থন পেয়েছে। তুরস্কে 'টার্কিশ জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি' বা একেপি সর্বাধিক ভোট পেয়ে ক্ষমতায় এসেছে, যারা আদর্শগত দিক থেকে ইসলামি চেতনায় উদ্বুদ্ধ।[৪] আফগানিস্তানে মার্কিন পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা সরকার একটি সাংবিধানিক 'লয়া জিরগা' গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে, যাতে ইসলামি ও গণতান্ত্রিক উভয় আদর্শের প্রতিফলন আছে।[৫] বাগদাদেও দেখা যায় জনসমর্থন আছে এমন একটি সাংবিধানিক পথের, যা ইসলাম ও গণতন্ত্র দুইয়ের

মিশ্রণে তৈরি।[৬] ২০১১-পরবর্তী 'আরব বসন্তের' পরও দেখা যায় স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে 'ইসলামাবাদিতা' বা 'ইসলামি গণতন্ত্রবাদীরা' জনসমর্থন অর্জন করছে। তিউনিসিয়ার স্বৈরশাসক বেন আলীর দুর্নীতির প্রতিবাদে এক ফলবিক্রেতা তাঁর শরীরে আগুন ধরিয়ে প্রতিবাদ করেন। তারপর আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে শ্রমিক সমিতি ও মধ্যবিত্ত পরিবারের তরুণদের মাধ্যমে। দেশের মিলিটারি জনগণের সঙ্গে একাগ্রতা প্রকাশ করে এবং বেন আলী শাসনের অবসান ঘটে। এই পুরো আন্দোলনে ইনাহদা—ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের কোনো ভূমিকা ছিল না। রশিদ ঘানৌচি, ইনাহদা দলের প্রতিষ্ঠাতা, ২০ বছর ধরে তাঁর পরিবারসহ লন্ডনে নির্বাসনে ছিলেন।[৭] অথচ আন্দোলনের পর গণতন্ত্রের পথযাত্রায় জনগণের সর্বাধিক ভোট যায় ইনাহদা দলের প্রতি। ২০১১ সালের অক্টোবরের নির্বাচনে দলটি ৪১ শতাংশ ভোট পেয়ে সর্বোচ্চ জনসমর্থন অর্জন করে।[৮]

তিউনিসিয়ার পরপরই মিসরে শুরু হয় শাসনব্যবস্থা ও সরকার পরিবর্তনের আন্দোলন। আন্দোলন বেগবানের অপরাধে 'মুসলিম ব্রাদারহুড'কে (মিসরে সবচেয়ে বড় বিরোধী দল) অভিযুক্ত করা হলেও তারা তা অস্বীকার করে।[৯] নভেম্বর ২০১১ সালের সংসদীয় নির্বাচনে বিপুল ভোট অর্জন করে ক্ষমতায় আসে 'মুসলিম ব্রাদারহুড' এবং একই বছর ব্যাপক ভোট অর্জন করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন একই দল থেকে। আরব বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলেও 'আরব বসন্ত' বিভিন্ন রাজনৈতিক পরিবর্তন এনেছে। মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের পর লিবিয়ার শাসন ইসলামপন্থী ও সামরিক বাহিনীর মাঝে দোদুল্যমান। ইয়েমেনে 'আরব বসন্তের' হাওয়ায় ২০১১ সালের প্রথমার্ধে আন্দোলন দেখা দেয়, যার নেতৃত্ব দেয় তাওয়াকেল কারমান। কারমান ইসলাহ দলের সদস্য, যার সংযোগ রয়েছে মুসলিম ব্রাদারহুডের ইয়েমেন অংশের এবং আহমার গোষ্ঠীর সঙ্গে। সিরিয়ায় আরব বসন্তের আন্দোলনের ছোঁয়া লাগলেও এর গতি মন্থর। বিদ্যমান আসাদ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা মূলত সুন্নি মুসলমান, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ (৬০ শতাংশ) জনগোষ্ঠী। সিরিয়ার আন্দোলন সফলতা না পাওয়ার পেছনের কিছু কারণের মধ্যে একটি হলো বিদ্যমান শাসনব্যবস্থা সংখ্যালঘু কিছু গোষ্ঠীর সহায়তা লাভ করেছে, যাদের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি মুসলমানদের ক্ষমতায় আসা খুব লাভজনক হবে না।[১০] মরক্কোর রাজতন্ত্রও এই বসন্তের বাইরে থাকতে পারেনি। যদিও রাজতন্ত্রের পতনও হয়নি। জনগণ যখন সংস্কারের আন্দোলন শুরু করে, রাজা মুহাম্মদ-৬ তখন অন্যান্য স্বৈরশাসকদের মতো (মিসর, লিবিয়া, বাহরাইন, সিরিয়া) বলপ্রয়োগে তা দমন না করে আন্দোলনকারীদের দাবির সঙ্গে কিছুটা আপস করেন। রাজা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে মরক্কোর সবচেয়ে বড় বিরোধী দল মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নেন। একজন ইসলামপন্থীকে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন করা হয়

এবং আন্দোলনকারীরাও সংস্কারে সন্তুষ্ট থাকে।[১১]

অপর এক রাজতন্ত্র জর্ডানে মরক্কোর মতোই দ্রুত এবং দায়িত্বপূর্ণ প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আন্দোলন প্রতিহত করেছে সেই দেশের রাজা এবং শাসন ও আসন দুই-ই রক্ষা করেছে। জর্ডানে আন্দোলনের ধরনও ছিল ভিন্ন, মূলত সামাজিক যোগাযোগ মধ্যমকেন্দ্রিক। তবে রাজধানী আম্মানে কিছু সংস্কারপন্থীদের আন্দোলন হয়েছে।[১২] জর্ডানের আন্দোলনকারীরা মূলত সংস্কারের দাবি করে, তারা শাসক বা শাসনব্যবস্থা পতনের আন্দোলন করেনি। সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের দেশ জর্ডানে জনগণ যখন সংসদীয় নির্বাচনের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১০-এ, রাজা আবদুল্লাহ, আন্দোলনকারীদের দাবি রক্ষার্থে সংসদ ভেঙে দিয়ে নতুন করে সংসদ গঠন করে।[১৩] ভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় অপর এক রাজতন্ত্র বাহরাইনে। এখানে শিয়া জনগোষ্ঠী সুন্নি শাসক দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। প্রাথমিকভাবে আন্দোলন সংস্কারের জন্য হলেও সরকার তা দমনে বলপ্রয়োগ করে। তাতে আন্দোলনের মাত্রা বেড়ে যায়। সৌদি আরবের সাহায্যে এক হাজার সৌদি সশস্ত্র বাহিনী এসে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা করে বুঝিয়ে দেয় যে মানচিত্রের আরব উপসাগরীয় অংশে আরব বসন্তের স্থান নেই।[১৪]

পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে ৯/১১ বা ২০১১-পরবর্তী আন্দোলন ও শাসন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দেখা যায়, জনগণের মাঝে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। জনগণ চায় স্বৈরশাসনের পতন। স্বৈরশাসনের পতনের পর কী ধরনের শাসন আসবে তা নিয়ে বিশ্বজুড়ে রয়েছে বিভিন্ন মতবাদ। এই দেশগুলোতে জনমনে রয়েছে ইসলামের প্রতি নমনীয়তা। আবার জনগণ চায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং উন্নয়ন। এসব দেশে রাজনৈতিক দল বলতে ইসলামপন্থী দলগুলো সক্রিয়। ইসলামপন্থী দলগুলো দেশে শরিয়ত আইন প্রতিষ্ঠা করার কথা বলে। বইটিতে লেখক এই ইসলামপন্থী দলগুলোর সক্রিয়তা ও ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতি জনসমর্থনের কারণ খুঁজতে আলোকপাত করেছেন ইসলামি রাষ্ট্রের অতীত ইতিহাসের ওপর।

২.

মুসলমানদের কাছে ইসলামি রাষ্ট্র কোনো অতীত ইতিহাস নয় বরং একটি বর্তমান বিষয়, যা থেকে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলেও ইসলামি চেতনা মানুষের মাঝে উজ্জীবিত ছিল, যার মূল চালিকা মুসলিম ব্রাদারহুড বলে উল্লেখ করেছেন লেখক। ইসলামি রাষ্ট্রের ধারণা, যা পূর্ববর্তী প্রজন্ম প্রত্যাখ্যান করেছে তা বর্তমান প্রজন্মের কাছে এত জনপ্রিয় কেন, তা জানতে লেখক ইসলামি রাষ্ট্রের ইতিহাসে আলোকপাত করেছেন। ইসলামি রাষ্ট্রের জনপ্রিয়তা ও স্থায়িত্বের কারণ হিসেবে লেখক দুটি বিষয় চিহ্নিত করেছেন—আইনের শাসন ও ক্ষমতার ভারসাম্য।

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়কাল থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ১৩০০ বছর, ইসলামি শাসনব্যবস্থা কায়েম ছিল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। ফেল্ডম্যান ইসলামি শাসনব্যবস্থার ব্যাখ্যা দিয়েছেন—

> শরিয়ত আইন ইসলামি রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি। এই শরিয়ত আইনের দুটি উৎস। কোরআন ও হাদিস। কোরআন ও হাদিসের আলোকে পরিস্থিতি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন হবে। এই আইনের ব্যাখ্যা দেবেন ইসলামি ধর্মগুরু বা পণ্ডিতগণ। কেউ এই আইনের উর্ধ্বে নয়। একজন শাসক বা খলিফা স্রষ্টা প্রদত্ত আইন দ্বারা শাসন করবেন। খলিফাও আইনের শাসনের বাইরে নয় (ফেল্ডম্যান- পৃ. ২)।

অনেক পাশ্চাত্য চিন্তাবিদের মতে, ইসলামি আইন বর্বরতাপূর্ণ। অনেকে মনে করেন এ ব্যবস্থায় শাসক যা খুশি তা-ই করতে পারেন। মন্টেস্কুর মতো বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে বেআইনি মনে করেন (The worst possible non-legal regime)। ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, ইসলামি শাসনব্যবস্থায় মুসলিম কাজিরা বিচারকাজের নামে গাছের নিচে বসে তাঁদের ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত দেন (ফেল্ডম্যান, পৃ. ২২) । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি রাষ্ট্রের পতন ঘটে। ১৯২৪ সালে আদর্শগত দিক থেকে কিংবা অনুশীলনের দিক থেকে উভয় ক্ষেত্রেই এত বছরের পুরোনো ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার মৃত্যু ঘটে। লেখক এখানে ইসলামি রাষ্ট্র বিষয়ে বিভিন্ন মতামতের উল্লেখ করেননি। ইসলামি রাষ্ট্রের সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও সংকীর্ণতা দেখা যায়। প্রথমত, ইসলামি রাষ্ট্রের ধরন বা উপাদানগুলো যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করেননি। দ্বিতীয়ত, ইসলামি আইনের কথা বলতে গিয়ে নানা পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন—ট্র্যাডিশনাল বা ঐতিহ্যিক ইসলামি আইন বা ক্লাসিক্যাল ইসলামি আইন, এবং সনাতনী বা ancient ইসলামি আইন। কখনো ট্র্যাডিশনাল বা ঐতিহ্যিক ও ক্লাসিক্যাল ইসলামি আইন প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কখনো বা আলাদা অর্থ বহন করেছে। ইসলামি আইনের এই বিভিন্ন পরিভাষার যথার্থ ব্যাখ্যা বা আলোচনা নেই। সৌদি আরবের ইসলামি আইনকে উল্লেখ করেছেন সনাতনী বলে, আবার অটোমান সাম্রাজ্যের আইনকে বলেছেন ট্র্যাডিশনাল বা 'ঐতিহ্যিক ও ক্লাসিক্যাল ইসলামি আইন'। এমন দুই ধরনের পরিভাষা ব্যবহার করার কারণ স্পষ্ট নয় এই বইটিতে।

তিনি বলেছেন ইসলামি আইনের উৎস শরিয়ত আইন। শরিয়ত আইন বলতে তিনি কী বুঝিয়েছেন তা ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা ছিল এই বইটির আলোচ্য বিষয় বুঝতে। লেখক উল্লেখ করেছেন শরিয়ত আইনের উৎস কোরআন ও হাদিস।

কোরআনে যা বর্ণিত আছে তা হলো মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাপনের নির্দেশনা, যা মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর ওহি আকারে নাজিল হয়েছে। মুহাম্মদ (সা.) পরলোকগমন করার পর ২০০ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন উলামা বা ধর্মগুরু তাঁর বাতলানো পথের কথা এবং তাঁর অনুশীলনের কথা সংকলন করেছেন। বিভিন্ন উলামার লেখার মধ্যে পার্থক্য আছে, দ্বিমতও আছে। এই বইগুলোর মধ্য থেকে কিছু বই আবার জনসমর্থন পেয়েছে, যেমন—আল-হানাফি, আল-মালিকি, আল-শাফি, আল-হাম্বলি প্রমুখ। এই বিভিন্ন লেখা থেকে বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে।[১৫] ইসলামি আইন বলতে এমন বিভিন্ন মতবাদের প্রভাব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মাঝে দেখা যায়। লেখক ক্লাসিক্যাল ইসলাম বলতে যা বুঝিয়েছেন তাতে কোনো মতবাদের প্রাধান্য আছে বা আদৌ আছে নাকি তা স্পষ্ট নয়।

ইসলামি রাষ্ট্রে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করতে ফেল্ডম্যান ইসলামি ধর্মগুরুদের অবস্থান গুরুত্বসহকারে দেখেছেন। এই ধর্মগুরুরা খলিফা ও আইন প্রয়োগকারীদের মাঝে যোগসূত্র এবং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষাকারী। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম কাজিরা আইনের প্রয়োগ করেন। তিনি যদি ঘটনা বিচারে যথার্থ আইন প্রয়োগে অপারগ হন, তবে তিনি যোগ্য কোনো আইনি ব্যক্তির শরণাপন্ন হবেন অথবা ঘটনাটি তাঁর হাতে স্থানান্তর করবেন। সেই দ্বিতীয় অভিজ্ঞ ব্যক্তি শরিয়ত ও হাদিসের আলোকে সেই ঘটনার সমাধান বাতলাবেন, যা ফতোয়া নামে পরিচিত। ইসলামি শাসনব্যবস্থায় ফতোয়া জারি করা একটি আইনি প্রক্রিয়া। সুন্নি ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় খলিফা সর্বোচ্চ ক্ষমতায় আসীন। বিচারক নিয়োগ করার দায়িত্ব যথাযথ ব্যক্তির, যিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন, এই আইন বিশেষজ্ঞরা খলিফার নিকট দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকেন। তবে এই আইন বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ ধর্মগুরুরা দিয়ে থাকেন। আইন বিশেষজ্ঞরা তাঁদের আইন জ্ঞানের প্রমাণ ধর্মগুরুদের কাছে দিয়ে থাকেন। আইন বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান ও ধারণার প্রমাণ দিতে পারলেই কেবল পণ্ডিতরা তাঁদের 'মুফতি' উপাধি দেন এবং তাঁরা ফতোয়া দেওয়ার অধিকারপ্রাপ্ত হন। কেবল বিশ্বস্ত ও জ্যেষ্ঠ পণ্ডিতবর্গই তাঁদের শিষ্যদের মধ্য থেকে কাউকে এ ক্ষমতা পালনের জন্য নির্বাচন করতে পারেন। বিচারকেরা রাষ্ট্র প্রদত্ত নিয়োগপ্রাপ্ত। তবে পণ্ডিতরা রাষ্ট্রের নিয়োগপ্রাপ্ত নয়। তাই তাঁরা খলিফার কাছে দায়বদ্ধ থাকেন না, যার ফলে বিচারকেরা যদি তাঁদের নিয়োগদাতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে থাকেন বা খলিফা যদি বিচারকদের বিচারিক কাজে হস্তক্ষেপ করেন, পণ্ডিতরা সে ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করেন। পণ্ডিতদের অবস্থান নির্ধারিত হয় তাঁদের জ্ঞান ও চালচলনের ভিত্তিতে, অন্য পণ্ডিতদের মাঝে তাঁদের খ্যাতির ভিত্তিতে। (ফেল্ডম্যান, পৃ. ২২-২৩)

ইসলামি শাসনব্যবস্থায় শাসক তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন

না। বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্ব খলিফার হাতে। তবে কোন ঘটনায় কোন আইন প্রয়োগ হবে, সেটা পণ্ডিতরা ধার্য করেন শরিয়ত মোতাবেক। কোনো খলিফা যদি তাঁর অধীনে কর্মরত বিচারকদের ওপর আইনি প্রক্রিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করেন, তা পণ্ডিতগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়। ইসলামি রাষ্ট্রে আইন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত। তাই কোনো খলিফা যদি আইন ভঙ্গ করেন, তবে তিনি সৃষ্টিকর্তার আদেশ অমান্য করলেন, যা পাপের সমতুল্য। শাসক যদি পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত আইনের শাসন প্রয়োগে ব্যর্থ হন, আইন বা বিচারের প্রতি নমনীয় বা পক্ষপাতদুষ্ট হন, তবে তিনি জনগণের কাছে দোষী এবং শাসন করতে অপারগ। এমন শাসক জনগণের কাছে কাম্য নয়। তাই লেখক মনে করেন, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা ১৩০০ বছর স্থায়ী হওয়ার অন্যতম কারণ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয়ত আইন প্রণয়নব্যবস্থা।

আইনগতভাবে পণ্ডিতদের ক্ষমতা আছে খলিফা নিয়োগ বা বরখাস্ত করার। একজন খলিফা পদে আসীন হতে পারেন উত্তরাধিকার সূত্রে কিংবা নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে। এই নির্বাচকমণ্ডলী হলেন একদল ব্যক্তি, যাঁরা কোনো সম্প্রদায়কে একত্র করে রাখা বা না রাখার কাজ করেন—যাঁরা আসলে পণ্ডিতদের মধ্যকারই কেউ। খলিফা যদি যথার্থ বিচার করতে ব্যর্থ হন, তবে পণ্ডিতদের অধিকার আছে খলিফাকে ব্যর্থ বলে ঘোষণা দেওয়ার। তবে বাস্তবিকভাবে খলিফাকে কখনোই ব্যর্থ বলে ঘোষণা দেওয়া হয় না। পণ্ডিতরা তাঁদের এই ক্ষমতার বলেই খলিফাদের আইনের শাসনের মাঝে রাখতে পারেন। এ ছাড়া যেহেতু খলিফা নির্ধারণ পণ্ডিতদের হাতে, তাই এক খলিফার পর অন্য কোন খলিফা আসবেন, সেটা ক্ষমতাসীন খলিফার জন্য জরুরি। এ ছাড়া ক্ষমতাসীন খলিফারা তাঁদের বৈধতা অর্জনের জন্য পণ্ডিতদের ওপর নির্ভরশীল। খলিফারা তাঁদের সম্ভাব্য প্রতিকূলতাগুলো উভয়, অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত, মোকাবিলা করতে পণ্ডিতগণের ওপর নির্ভরশীল। কোনো বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে শাসক ও রাষ্ট্রকে রক্ষার্থে পণ্ডিতরা 'জিহাদি' নীতি বা আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ ধার্য করেন (ফেল্ডম্যান, পৃ. ৩১-৪০) ।

কঠোর দৈহিক শাস্তির জন্য শরিয়ত আইন পশ্চিমা বিশ্বে সমালোচিত। ক্লাসিক্যাল ইসলামি আইন মোতাবেক চোরের শরীর থেকে তার হাত ছেদ করা হবে এবং ব্যভিচারীকে পাথর মারা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মৃত্যুবরণ করে। লেখক উল্লেখ করেছেন, শরিয়তে এমন বিধানের উল্লেখ থাকলেও এমন বিচারের উদাহরণ খুবই বিরল। কারণ, এমন শাস্তির জন্য অনেক কঠিন প্রমাণ পদ্ধতির বিচারকাজ পালন করা হয়। ব্যভিচারের দায়ে পাথর মেরে মৃত্যু নিশ্চিত করা শাস্তি প্রমাণ করতে যৌন নির্যাতনের ঘটনার চারজন প্রাপ্তবয়স্ক ভালো চরিত্রের পুরুষ

প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী থাকতে হবে।[১৬]

লেখক শাসক ও পণ্ডিতদের মধ্যে ভারসাম্য ব্যাখ্যা করলেও পণ্ডিত ও খলিফাদের নির্বাচন বা নির্ধারণপ্রক্রিয়া সম্পর্কে তা থেকে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। ফেল্ডম্যান ক্লাসিক্যাল ইসলামি আইনের বর্ণনায় এতটাই উদারনৈতিকতার পরিচয় দিয়েছেন যে বইটি পড়লে মনে হয়, ইসলামি আইনের কোনো বিকল্প হতে পারে না। তিনি তাঁর বর্ণনায় এই আইনের প্রতি কোনো পাল্টা মতবাদ বা যুক্তির উল্লেখ করেননি। ইসলামি আইনের সবচেয়ে সমালোচিত দুটি বিষয়—কঠোর দৈহিক শাস্তি ও মেয়েদের অবস্থান। ফেল্ডম্যান দৈহিক শাস্তির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, এমন শাস্তির উদাহরণ বিরল। তবে যাঁরা ইসলামি আইনের এই বিধান নিয়ে সমালোচনা করেন, তাঁদের যুক্তি তিনি উল্লেখ করেননি। মেয়েদের অবস্থান নিয়েও একই প্রশ্ন জাগে বইটি পড়ে। এই দুটি বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট করা পরবর্তী আলোচনা গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ।

৩.

বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক আলোচনা করেছেন কীভাবে ইসলামি শাসনব্যবস্থার পতন হয়। অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার পতন জড়িত। ১৮২০ সালে অটোমান সামরিক সংস্কারের পরও ১৮২৮ সালের যুদ্ধে ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও রাশিয়ার সঙ্গে অটোমান নৌবাহিনীর পরাজয় হয়। ১৮৩০ সালে ফ্রান্স আলজেরিয়া দখল করে নেয়। ১৮৩৯ সালে আবদুল মাজিদ অটোমান শাসক থাকাকালীন পাঁচ বিশ্বশক্তির সহায়তা নিয়ে মিসরের আগ্রাসন থেকে অটোমান অঞ্চলগুলো রক্ষা করা হয়। বারবার পরাজয় এবং পরনির্ভরশীলতা সংস্কারের দাবি রাখে। এমতাবস্থায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতরা পাশ্চাত্যের আলোকে সংস্কারের দাবি তোলেন। ১৬০০ শতাব্দীর পর অটোমান আমলাতন্ত্রেরও কোনো সংস্কার হয়নি। তাই ঢালাওভাবে এ সাম্রাজ্যের সংস্কার ও পরিবর্তন আনা হয়। ১৮৩৯ থেকে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত অটোমান শাসনব্যবস্থায় কর, সামরিক, বিচারব্যবস্থা—সব ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনা হয়। এই সংস্কারকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় 'তানজিমাত'। এ সময় বিচারব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন আনা হয়। এই পরিবর্তন দুই ধরনের—আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক। এর ফলে ধর্মনিরপেক্ষ শাসনের উদ্ভব হয়। তবে একই সঙ্গে এই সংস্কার আগের ক্ষমতার ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়।

শরিয়ত আইনের প্রয়োগের জন্য পণ্ডিতদের ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। কারণ, কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কোন আইন প্রণীত হবে, তা সাধারণভাবে লিখিত ছিল না। ফলে ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রণয়নের জন্য পণ্ডিতদের সাহায্য প্রয়োজন

হতো। ইসলামি আইন তাই সংকলন করা হয়, যা 'তানজিমাত'। ইসলামি আইনের ব্যাখ্যার প্রথা বন্ধ করে তা সর্বজনীন করা হলো। নতুন এই আইনিলিপি ছিল ইউরোপিয়ান আদর্শে গৃহীত। ১৮৫৮ সালের দণ্ডবিধি আইন ছিল ফরাসি অপরাধ আইনের আদলে। এই ব্যবস্থায় একজন বিচারক বা আইনজীবী একটি উৎস থেকে আইন নিয়ে তা কার্যকর করতে পারে। তাতে বিভিন্ন ঘটনা সর্বতোভাবে একটা আইনে আনা হলো। এতে আগের মতো আইনের প্রয়োগ শরিয়ত থেকে নিয়ে ব্যক্তিবিশেষে ব্যাখ্যা করে প্রয়োগ করার দরকার পড়ল না। তাতে পণ্ডিতদের কাজ ও গুরুত্ব দুটোই হ্রাস পায়। ১৮৭৬ সালে এই অটোমান সংবিধান ছিল মুসলিম বিশ্বের প্রথম লিখিত আইনের সংবিধান। এটি ছিল প্রথম মনুষ্য প্রদত্ত আইনের বিধান রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য (ফেল্ডম্যান, পৃ. ৬১)। ফেল্ডম্যান মনে করেন লিখিত এই আইনি সংবিধান ছিল মুসলিম বিশ্বে ইসলামি রাষ্ট্র পতনের মূল। লেখকের ভাষায়—

'The Ottoman constitution of 1876 was the first self-described constitutional document issued anywhere in the Muslim world. So it would not be an overstatement to say that the arrival of written constitutionalism in the Muslim world marked the beginning of the end of the Islamic State.' (পৃ. ৭১)।

নতুন সংবিধান সীমিত আকারে ইসলামি ছিল, ধর্মীয় বা আইন উভয় দিক থেকেই। সুলতানকে 'সর্বোচ্চ খলিফা' আখ্যা দিয়ে তাঁকে মুসলমান ধর্মের অভিভাবক বানানো হয়। ইসলামি রাষ্ট্র বলতে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি মুক্তভাবে ও নিঃসংকোচে ধর্ম পালনের অঙ্গীকার করা হয়। সংবিধান প্রণয়নকারী সংগঠনের অধীন হয়ে যায় ইসলাম। পণ্ডিতশ্রেণি, যারা খলিফা ও বিচারকের মাঝে ক্ষমতার ভারসাম্যকারী হিসেবে অবস্থান করছিল, সেই ভারসাম্য আর রক্ষা হলো না। খলিফা হয়ে উঠলেন সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী। বিচারকদের আইনি প্রক্রিয়ায় এখন তিনি সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারেন। নতুন আইন প্রণয়ন ও সেই আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনার জন্য পণ্ডিতশ্রেণিকে প্রতিস্থাপন করল একদল বিচারক শ্রেণি। তাদের কাছে আইন সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত নয়, বরং রাষ্ট্রপ্রদত্ত। তাই রাষ্ট্রের প্রতি তারা অনুগত হয়ে গেল। খলিফা আইনের ঊর্ধ্বে উঠে যান। বিধাতা প্রদত্ত আইন তাঁর ওপর বলবৎ কি না বা খলিফা বা তাঁর শাসন কীভাবে আইনের গণ্ডিবদ্ধ, এ বিষয়ে কোনো ধারণাও দেওয়া হয় না। ফলে ফেল্ডম্যান মনে করেন, ইসলামি রাষ্ট্রের সফলতার যে মূল কারণ আইনের শাসন ও সুষ্ঠু বিচার তা ভেঙে যায়। এই সংবিধান গণতান্ত্রিক ছিল না। এই সংবিধান জনগণকে সব ক্ষমতার

অধিকারী না করে সুলতানকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়। সব ক্ষমতা, সার্বভৌমত্ব সুলতানের অধীন হয়ে পরে (ফেল্ডম্যান, পৃ. ৭১)।

সংবিধানে গণতান্ত্রিক ধারায় পরিবর্তন করার অঙ্গীকার করা হয়। এ লক্ষ্যে দুই কক্ষবিশিষ্ট একটি সাধারণ সভা তৈরি করা হয়, যা ছিল পাশ্চাত্য আদলে মুসলিম বিশ্বের প্রথম আইনসভা (Legislative body) দুই কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উচ্চকক্ষ তৈরি হলো সুলতান কর্তৃক মনোনীত সিনেটর নিয়ে, যাঁদের সদস্যপদ আমৃত্যু পর্যন্ত। আর নিম্নকক্ষের সদস্যরা প্রতি চার বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। সুলতান হামিদ-২ ১৮৭৬ সালের ডিসেম্বরে ক্ষমতায় আসে। নির্বাচন হয় এবং ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে আইনসভা ধার্য করা হয়। বাক-স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ তা চর্চা করতে লাগল। হামিদের সরকার ও তাঁর মন্ত্রীদের সমালোচনা করা হলো। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৮, এক বছরেরও কম সময়ে সুলতান এই আইনসভা ভঙ্গ করে দেন এবং সংবিধানও বানচাল করে দেন। অটোমান সাম্রাজ্যের লিখিত প্রথম সংবিধানের এখানেই ইতি ঘটে। তবে নতুন এই সংস্কার 'তানজিমাত' বানচাল করে আবার আগের ক্লাসিক্যাল ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় ফেরত যাওয়া হয়নি। সংস্কারের নামে যে পণ্ডিতদের অবস্থান নষ্ট করে সুলতান সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন, সংস্কার বানচাল করার পরও তা বলবৎ থাকে। এভাবে সংস্কার সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের জন্ম দেয়। ৩০ বছর ধরে আবদুল হামিদ এভাবে শাসন করার পর তরুণ তুর্কিরা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসে। আধুনিক তুর্কি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী তুর্কি তরুণেরা জন্ম দিল আতাতুর্কের অসাম্প্রদায়িক তুরস্কের।

ফেল্ডম্যান উল্লেখ করেন যে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পেছনে একটি বড় কারণ হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন সংস্কার-পরবর্তী শরিয়ত নতুন দায়িত্বে অবতীর্ণ হয়েছে। আগে ক্লাসিক্যাল সুন্নি সংবিধান ছিল সব ক্ষমতার অধিকারী, যার প্রণয়ন হতো ধর্মগুরুদের মাধ্যমে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শরিয়ত পারিবারিক আদালতে সীমাবদ্ধ থাকে। ধর্মগুরুরা তাঁদের আগের আধা স্বায়ত্তশাসনের অবস্থানচ্যুত হন এবং রাষ্ট্রের একটি অঙ্গসংগঠনে পরিণত হন। যেহেতু ধর্মগুরুদের ক্ষমতা ও অবস্থানগত অবনতি ঘটে তাই তাঁরা তাঁদের সীমিত ক্ষমতা নিয়েই খলিফার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকেন এবং খলিফার শাসনের প্রতি বৈধতা প্রদান করেন। লেখকের মতে, কামাল পাশা, যিনি আতাতুর্ক নামে পরিচিত, ধর্মকে কোণঠাসা করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁর অসাম্প্রদায়িক আদর্শ রাষ্ট্র ও ধর্মের মধ্যকার যোগসূত্র খর্ব করে দেয়। ধর্ম কেবলই রাষ্ট্রের অধীন এবং মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত হয়। ১৯২৪ সালে আতাতুর্ক খিলাফত প্রথা সম্পূর্ণ বাতিল করে দেন। তবে সৌদি আরব মুসলিম বিশ্বের একটি ভিন্ন উদাহরণ। সেখানে আজও ক্লাসিক্যাল ইসলামি আইনের প্রচলন

আছে, যাকে লেখক বলেছেন প্রাচীন ইসলামি আইন। সেখানে রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহকের কাজ এখনো ধর্মগুরুরা করে থাকেন। তবে লেখক এটাও স্পষ্ট করে বলেছেন যে তিনি এমনটিও মনে করেন না যে সুন্নি মুসলিম বিশ্বে ক্লাসিক্যাল ইসলামি প্রথা থাকলেই কেবল এই শাসনব্যবস্থা স্থায়িত্ব পাবে ও যথার্থ আইনের শাসন কায়েম হবে।

৪.

ইসলামি রাষ্ট্রের জনপ্রিয়তা ও পতনের কারণ উল্লেখ করে লেখক আলোকপাত করেছেন বর্তমানের ইসলামি রাষ্ট্রের উত্থানের ওপর। তিনি আলোচনা করেছেন বর্তমানের ইসলামি রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবং তা কীভাবে ১৯২৮-পূর্ববর্তী ইসলামি আইন থেকে পৃথক। বর্তমান ইসলামি রাষ্ট্র যে মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাকে লেখক বলছেন 'রাজনৈতিক ইসলাম' বা 'ইসলামবাদ' বা 'ইসলামবাদিতা'। অটোমান সাম্রাজ্যের অধীনে যখন ইসলামি সংস্কার হয়, বিস্ময়করভাবেই তখন এই সংস্কারের ফলে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত শ্রেণি ধর্মগুরুরা তাদের অবস্থান রক্ষার্থে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো পদক্ষেপ নেননি। তেমনি অস্বাভাবিক একটি ব্যাপার হলো বর্তমানের ইসলামবাদের উত্থানের পেছনেও এ ধরনের কোনো ধর্মগুরুদের অবদান নেই। সুন্নি মুসলিম বিশ্বে আধুনিকতাবাদী ইসলামি চেতনার উত্থান হয় ধর্মীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। একে বলা হয় 'ইসলামবাদ' বা 'ইসলামবাদিতা'। এ ধারায় সবচেয়ে প্রভাবশালী মূলধারার ইসলামি সংগঠন—আন্তর্জাতিক মুসলিম ব্রাদারহুড। ১৯২৮ সালে মিসরে এই সংগঠনটি গঠিত হয়। বর্তমানে মরক্কো, আলজেরিয়া, ফিলিস্তিন, জর্ডান, লেবানন হয়ে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোসহ দক্ষিণ এশীয় বিভিন্ন দেশ যেমন পাকিস্তান, আফগানিস্তান এমনকি পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও ইসলামি রাজনৈতিক শক্তিগুলো সক্রিয়। 'ইসলামবাদ' প্রচারে লেখক মুসলিম ব্রাদারহুডকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই তারা বিশ্বের বুকে ইসলাম সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে যাচ্ছে। তাদের মতে, ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে ধর্মকে পরিত্যাগ করার কারণেই ইসলামি সমাজের পতন ঘটেছে। ইসলামকে আবার মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অপরিহার্য অংশে পরিণত করতে পারলে সর্বতোভাবেই মুসলিম সমাজের উন্নতি হবে। মুসলিম ব্রাদারহুডের কাছে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আদর্শের পাশাপাশি ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, এমনকি খেলাধুলার ক্ষেত্রেও ইসলাম অপরিহার্য। এভাবে মুসলিম ব্রাদারহুড মানুষের জীবনের সব পর্যায়ে ইসলামকে নিয়ে যাওয়ার আদর্শে কাজ করতে থাকে। তাই স্বৈরশাসনের বিপরীতে এসব দেশে অন্য কোনো রাজনৈতিক দল টিকতে না

পারলেও মুসলিম ব্রাদারহুড একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিদ্যমান থেকেছে।

১৯৭৬ সালের আগে সুন্নি মুসলমান দেশগুলোতে ধর্মগুরুরা ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেভাবে নীতিনির্ধারকের কাজ করতেন, তানজিমাত-পরবর্তী ধর্মগুরুদের প্রতিস্থাপন আর দেখা যায় না। কোনো পদক্ষেপও নেওয়া হয়নি ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত করে ইসলামি পণ্ডিত, শাসক ও বিচারকদের মধ্যে যোগসূত্র সাধন করবে।

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে রাজনীতি অঙ্গনে ইসলামপন্থী মনোভাব দেখা গেলেও প্রকৃত ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দেখা যায় না। এর কারণ হিসেবে লেখক বর্তমানের 'ইসলামবাদ' বা 'ইসলামবাদিতা'র সঙ্গে অতীতের ক্লাসিক্যাল ইসলামি রাষ্ট্রের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। প্রথমতই, ক্লাসিক্যাল ইসলাম শরিয়ত আইন প্রবর্তনের কথা বলে এবং দ্বিতীয়ত ক্লাসিক্যাল ইসলামি রাষ্ট্র পরিচালনায় সাংগঠনিক কাঠামো ক্ষমতার ভারসাম্য রাখতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামবাদ বিংশ শতাব্দীর একটি আধুনিক ধারণা। কমিউনিজম, সমাজতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদী ধারণার মতোই ইসলামবাদ একটি ধারণা, যা শরিয়ত আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দুইয়ের মিশ্রণ। ইসলামবাদ শরিয়ত আইন প্রয়োগের কথা বললেও তা ক্লাসিক্যাল ইসলামি রাষ্ট্র কায়েমের কথা বলে না। পণ্ডিতশ্রেণির পুনরুত্থানের কথা বলে না ক্ষমতা ভারসাম্য রক্ষার্থে। ধর্মীয় পণ্ডিতগণ, যাঁদের কেবল পারিবারিক আদালতে বিয়ে, তালাক, সম্পত্তি বণ্টন—এসব কাজে আবদ্ধ রাখা হয়েছে, তাঁদের হারিয়ে যাওয়া অবস্থান পুনর্গঠনের কথা বলা হয় না। ইসলামপন্থীরা ইসলামি আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। তাঁরা মনে করেন, ধর্মগুরুদের ওপর নির্ভর না করেও ইসলামি চেতনায় ও আদর্শে রাষ্ট্র পরিচালনা করা যায়। এই বিশ্বাস নিয়েই তাঁরা মনে করেন কোরআনের ব্যাখ্যা সবাই তাঁর মতো করেই দিতে পারেন। তবে বিভিন্ন মতবাদের ইসলামপন্থীদের এই বিষয়ে ভিন্নমত আছে। উদারপন্থী ইসলামবাদীরা পণ্ডিতদের জ্ঞান ও শিক্ষার কিছু সংস্কার চান। আবার একই সঙ্গে কিছু গোঁড়া ইসলামবাদী পণ্ডিতের বিচারকাজ ও অবস্থান গুরুত্বের সঙ্গে দেখেন।

ইসলামপন্থীরা এমন একটি ইসলামি রাষ্ট্রের কথা বলেন, যেখানে লিখিত সংবিধান থাকবে শরিয়ত মোতাবিক। আইনের প্রয়োগ করবেন নতুন আইনি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা। শাসক নির্বাচিত হবেন জনগণের ভোটে। এখানে শাসকের একচ্ছত্র ক্ষমতা কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে তার স্পষ্ট কোনো উল্লেখ নেই। শাসনকাজ নির্বাহ, আইন প্রয়োগ, বিচার ও আমলাতান্ত্রিক কাজগুলো করবেন রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত ইসলামপন্থীরা। শাসনব্যবস্থায় শরিয়ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে থাকলেও ধর্মগুরুরা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের কাজ পরিচালনা বা

নীতিনির্ধারণের ক্ষেত্রে থাকবেন না। বরং 'উপদেষ্টা' হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ইসলামপন্থী রাজনৈতিক মতবাদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক 'ইসলামপন্থী শরিয়ত'-Islamist Shari'a ও 'ইসলামি শরিয়ত' 'Islamic Shari'a-এর মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করেছেন। 'ইসলামপন্থী রাজনৈতিক' ধারা 'ইসলামি রাষ্ট্র' কায়েমের কথা বলে। যেখানে 'ইসলাম' শব্দটির একটি আধুনিক অর্থ দাঁড় করানো হয়েছে, যা আগে ক্লাসিক্যাল ইসলামি ব্যবস্থায় অনুপস্থিত ছিল।

"Islam, understood as an encompassing and modern idelogy. Islam is the thing that makes Islamism into a distinctive approach to the reform of government and society. It is the engine meant to restore Muslim societies to world prominence and power" (ফেল্ডম্যান, পৃ. ১১১).

তাঁদের মতে, 'ইসলাম' সরকার ও সমাজে সংস্কার আনার লক্ষ্যে একটি ধারণা। এই ধারণা বিশ্বের বুকে মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরবে। ইসলামপন্থী রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল ভিত্তি হিসেবে লেখক চিহ্নিত করেছেন—(i) ইসলামি আইন, যা সংস্কারের কারণে লিখিত আকার ধারণ করেছে এবং (ii) ইসলামি মূল্যবোধ, যা প্রাচীন বা ঐতিহ্যবাহী/ঐতিহ্যগত ইসলামি আইনের সংকীর্ণতামুক্ত। এখানে ইসলামি আইন বলতে আগের শরিয়ত আইন বোঝায়, আর ইসলামি মূল্যবোধ হলো ইসলামি চেতনা। ইসলামি আইনের বিভিন্ন বিধান বিশ্বের বুকে এই আইনকে সমালোচিত করলেও ইসলামবাদীরা মনে করেন ইসলামি আইন থেকে বিচ্যুতি মূলত ইসলামি রাষ্ট্র পতনের মূল। তাই তাঁরা আইনের প্রতি তাঁদের আহবান অক্ষুণ্ন রাখতে চান (ফেল্ডম্যান, পৃ. ১০৫-১১৩)।

ইসলামি আইনের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আইনের প্রয়োগ ও আইনের বিচার সমান গুরুত্ববহ। ইসলামপন্থী শরিয়তে বিচার তিন ভাগে ভাগ করা যায়—সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনের বিচার। সামাজিক বিচারের মধ্যে পড়ে ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, সরকার ও জনগণের সম্পর্ক। এখানে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যবর্তী একটি অবস্থানের কথা বলা হয়েছে, যেখানে সবাই সমানাধিকার উপভোগ করবে। এখানে যে কর-ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে তা ক্লাসিক্যাল ইসলামি আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোনো অনৈতিক সরকার এলে তার অবসানের জন্য সহিংস পন্থা সব সময় অবলম্বন করা যেতে পারে। সরকার এমন হবে যে ইসলামবাদীদের বর্ণনা করা ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী।

ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠায় আর একটি উপাদান হলো ইসলামি চেতনা। ফেল্ডম্যানের লেখা পড়ে বোঝা যায় যে তিনি বিশ্বাস করেন ইসলাম ও গণতন্ত্র সংগতিপূর্ণ। তাঁর ইসলামবাদের বর্ণনা মূলত এই ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি

বর্তমানের ইসলামবাদ বর্ণনায় এর প্রতিকূল মতবাদের উল্লেখ করেননি। অনেক চিন্তাবিদ মনে করেন ইসলাম ও গণতন্ত্র অসংগতিপূর্ণ, এমনকি পরস্পরবিরোধী মতবাদ। গণতন্ত্র যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন, ইসলাম সমানাধিকারের কথা বলে। ইসলামি সংবিধানে জনগণের মতামত ও আদর্শের ওপরে স্থান পায় ঐশ্বরিক শ্রেষ্ঠত্ব। জনগণের শাসন কায়েম করার কথা বলা হয়েছে। আবার এও বলা হয়েছে যে ইসলামি আইন যেকোনোভাবেই কায়েম করা হবে। আইন যেহেতু স্রষ্টা প্রদত্ত, ধারণা করা যায় যে জনগণের স্বার্থে আইনের কোনো পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন সম্ভব নয়। গণতন্ত্র যেখানে জনগণের শাসন, জনগণের দ্বারা, জনগণ হতে এবং জনগণ থেকে, সেখানে শরিয়ত আইন অপরিবর্তনীয়। শরিয়ত আইন কীভাবে গণতন্ত্রের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ তা আরও একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায় বইটিতে। রাষ্ট্রের সংবিধানে আইনের উৎস হিসেবে বলা হয়েছে শরিয়ত আইনের একটি উৎস। যেখানে ইসলামি আইন একার্থকভাবে কোনো সমস্যার সমাধান দিতে পারবে না, সেখানে গণতান্ত্রিক প্রথায় মনোনীত ইসলামপন্থী বিধান সাহায্য করবে। অর্থাৎ, আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্র নকশায় ইসলামি আইন সব আইনের উৎস। এই আইনে ব্যাখ্যা দেওয়ার যে অবকাশ থেকে যায়, যার ফলে পণ্ডিতদের প্রয়োজন হয়। বর্তমান নকশায় যেহেতু পণ্ডিতদের অবস্থান নেই, তাই শরিয়ত আইনের ব্যাখ্যা ইসলামি মূল্যবোধের আলোকে জনগণের নির্বাচিত সংবিধানে সংকলিত থাকবে। এই হবে মূল সংবিধানের একটি সাহায্যকারী সংবিধান। যেখানে ইসলামি আইনের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে, সেখানে এই সাহায্যকারী সংবিধান ব্যবহৃত হবে। জনসম্মতিতে গৃহীত এই সংবিধানকে বলা হয়েছে শরিয়তের গণতান্ত্রিকীকরণ, যা ধর্মগুরুদের প্রতিস্থাপন করবে। শরিয়তের সঙ্গে সাহায্যকারী এই সংবিধানকে বলা হচ্ছে শরিয়তের সাংবিধানিকীকরণ। শরিয়তের সাংবিধানিকীকরণ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পণ্ডিতশ্রেণিকে প্রতিস্থাপন করবে। শরিয়তের সাংবিধানিকীকরণের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের কাজ করবে ইসলাম বৈধ পর্যালোচনাকারী কোর্ট। এই কোর্টের বিচারকেরা ইসলামি আইনের প্রয়োগের ব্যাখ্যা দেবে। ধর্মগুরুদের মতোই বিচারকেরা ইসলামি আইন পর্যালোচনা করে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাঝে সমন্বয় সাধন করবে (ফেল্ডম্যান, পৃ. ১১৩-১১৮)।

ইরানের উদাহরণ দিয়ে লেখক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, ইরানে ইসলামি বিপ্লবের পর গঠিত সরকার ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করলেও দুর্নীতিগ্রস্ত ও স্বৈরাচারী হওয়ার কারণে জনগণের কাছে নিন্দিত। ইসলামবাদীরা যদি যথার্থ বিচার কায়েম করতে পারে, তবে শরিয়ত আইনের শাসন সমগ্র আরব ও মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব। লেখক মনে করেন ইসলামবাদ তখনই সফল হবে, যখন আইনের

শাসন যথাযথভাবে কায়েম থাকবে এবং সেই শাসন ও ক্ষমতার ভারসাম্য নিশ্চিত করার জন্য যথার্থ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা হবে, আইন বিভাগ, বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের সব স্তরের সংগঠন আইন ও সাংবিধানিক বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং তা পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে। অন্যথায় যেকোনো বিপ্লব বিফলে যাবে। আগের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাংবিধানিক পরিবর্তন এলে স্বাভাবিকভাবেই তা বৈধতা পাবে, ধর্মগুরু ও বিচারকদের বহিরাগত বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫.

নোআহ ফেল্ডম্যান-এর *দ্য ফল অ্যান্ড রাইজ অব দ্য ইসলামিক স্টেট* বইটি মূলত ইসলামি রাষ্ট্রের ইতিহাস বর্ণনা করে। এখানে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তাঁর অভাব অনেক জায়গাতেই অনুভূত হয়। বইটির ওপর বিভিন্ন মন্তব্য দেখলে দেখা যাবে, সবাই বইটিকে ইসলামি রাষ্ট্রের ইতিহাস-বিষয়ক একটি ছোট লেখনী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। জে টলসন, ইউ এস নিউজ ও ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট বইটির পর্যালোচনায় বলেছে, বইটি ইসলামি আইনব্যবস্থা সম্পর্কে একটি ছোট ও চিন্তাশীল ইতিহাস। *ইকোনমিস্ট* লিখেছে, বইটি ইসলাম ও ইসলামি রাজনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞ বা নতুন পাঠকের জন্য ভালো একটি বই, যেখানে ইসলামি রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায়। বইটি মূলত ইসলামি রাজনীতি বিষয়ে কৌতূহলী পাঠকদের ইসলামি রাষ্ট্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা দেয়। তবে বইটি ইসলামি রাষ্ট্রের ইতিহাসের একপেশে বর্ণনা দেয়। এখানে অন্যান্য মতবাদের উল্লেখ নেই। বইটিতে যথেষ্ট গবেষণার অনুপস্থিতি অনুভূত হয়।

লেখক ইসলামি রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (ক) আইনের শাসন ও (খ) পণ্ডিত কর্তৃক ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করে আইনের শাসন কায়েম। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে ইসলামি রাষ্ট্র ১৩০০ বছর স্থায়ী হয়েছে। ইসলামি রাষ্ট্রের পতনের কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন (ক) ইসলামি আইনের সংস্কার এবং (খ) পণ্ডিতশ্রেণিকে অপসারণ করে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা। তিনি এই প্রথম অধ্যায়ে ইসলামি শরিয়ত আইনের কোনো সমালোচনা না করে এই ব্যবস্থাকে উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলেছেন কীভাবে সংস্কারের ফলে এ অবস্থার পতন ঘটে। তৃতীয় অধ্যায়ে যখন ইসলামবাদ বা আধুনিক ইসলামি রাষ্ট্রের উত্থানের কথা উল্লেখ করা হচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে বর্তমানের ইসলামপন্থীরা অতীতের ইতিহাস ও ভুল থেকে শিক্ষা নেবে । কিন্তু দুঃখজনকভাবে তৃতীয় অংশে তা দেখা যায় না। বরং তৃতীয় অধ্যায়ে যে আধুনিক

ইসলামবাদের আদর্শে ইসলামি রাষ্ট্রের বর্ণনা করা হয়েছে, তার সঙ্গে দ্বিতীয় অংশে উল্লিখিত ইসলামি রাষ্ট্রের পতনের কারণ সদৃশ। লেখক যে নতুন ইসলামি রাষ্ট্রের আদর্শের কথা বলেছেন তার প্রতি লেখকের সমর্থন প্রকাশ পায়। লেখক বলেছেন, নতুন ইসলামি রাষ্ট্র তখনই সফল হবে যখন ইসলামপন্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের মাধ্যমে এই রাষ্ট্রে নতুন প্রাণ দেবেন। লেখক উল্লেখ করেছেন, নতুন ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি (ক) শরিয়তের গণতন্ত্রীকরণ ও (খ) শরিয়তের সাংবিধানিকীকরণ। এ ব্যবস্থায় শরিয়ত রাষ্ট্রীয় আইনের উৎস। এ ক্ষেত্রেও লেখক শরিয়তের যথার্থ ব্যাখ্যা দেননি। শরিয়ত আইনের উৎস যদি কোরআন ও হাদিস হয়, সে ক্ষেত্রে আবারও প্রশ্ন জাগে কোন মতবাদের হাদিস এখানে গৃহীত হবে। দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে যে এই ব্যবস্থায় আইনের একটি উৎস হবে শরিয়ত। একটি গণতান্ত্রিক উপায়ে সংগৃহীত সংবিধান থাকবে, যা শরিয়তের সাহায্যকারী দলিল হিসেবে কাজ করবে। ইসলামি আইনে পতনের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লেখক উল্লেখ করেছেন আগের ক্লাসিক্যাল ইসলামি আইন থেকে বিচ্যুতি পতনের একটি কারণ। আবার পতনের দ্বিতীয় কারণ পণ্ডিতশ্রেণির অপসারণও পুনঃস্থাপন করা হচ্ছে না নতুন মতবাদে এবং তা ন্যায্য করা হচ্ছে বারবার ইরানের রাষ্ট্রব্যবস্থার উল্লেখ করে। ইরানে পণ্ডিতরা তাঁদের আধিপত্য ও দুর্নীতির কারণে জনপ্রিয়তা হারিয়েছেন বলে লেখক পণ্ডিতদের অবস্থান প্রত্যর্পণ করার পক্ষপাতী নন (পৃ. ১২৮-১২৯)। সে ক্ষেত্রে পণ্ডিতদের অবস্থান নেবে একটি সর্বজনগৃহীত লিখিত সংবিধান, যা শরিয়তের সঙ্গে সাহায্যকারী দলিল হিসেবে থাকবে। যদি ক্লাসিক্যাল ইসলামের জনপ্রিয়তার উপাদান ও পতনের কারণ থেকে আমরা শিক্ষা না নিই, তাহলে কেন তা ব্যাখ্যা করা হলো তা স্পষ্ট নয়। যদিও এই ব্যাখ্যা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ইসলামি রাষ্ট্রের ইতিহাস সম্পর্কে ভালো একটি ধারণা দেয়।

দ্বিতীয় অংশের পতনের কারণে লেখক বলেছেন, একদল পশ্চিমা শিক্ষায় দীক্ষিত মানুষের মাধ্যমে ইসলামি আইনের সংস্কার হয়েছে। যারা পণ্ডিতদের অপসারণ করে তাদের অবস্থান নিয়েছেন। নতুন ইসলামি রাষ্ট্রের আদর্শেও তা পরিলক্ষিত। মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে যেভাবে শাসনের পরিবর্তন হচ্ছে, তাতে এই ইসলামপন্থীরা কীভাবে ক্ষমতায় আসবে এবং শরিয়তের গণতান্ত্রিকীকরণ ও সাংবিধানিকীকরণ করবে তা উল্লেখ নেই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুসলিম ব্রাদারহুড মুসলিম সমাজের সংস্কার ও ইসলামি মূল্যবোধ জাগ্রত রাখতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন বলে লেখক উল্লেখ করেছেন। তবে এই ইসলামবাদীরা সবাই কি মুসলিম ব্রাদারহুডের অনুসারী কি না তা উল্লেখ নেই। কীভাবে তারা সংঘবদ্ধ হবে তারও উল্লেখ নেই।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্নায়ুযুদ্ধকালীন ধর্মহীন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিজম-ব্যবস্থার বিপরীতে যে ধর্মীয় আদর্শের উত্থান ও প্রসার ঘটেছে, এই

লেখায় তার উল্লেখ নেই। জিহাদি চেতনায় উদ্বুদ্ধ বিভিন্ন চরমপন্থী দল ধর্মের নামে যে মতবাদের প্রচার ও প্রসার করে চলেছে তারও কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সত্তর-পরবর্তী সৌদি আরবের তেলের অর্থে ওয়াহাবি ইসলামের আদর্শ দূরপ্রাচ্য এমনকি ইউরোপ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। সেখানে লেখকের উল্লেখিত এই উদারনৈতিক ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা কীভাবে জায়গা করে নেবে তা লেখক উল্লেখ করেননি।

লেখক যে নব ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার সমর্থক তার প্রমাণ হলো তিনি ইরাকের গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। তবে গণতান্ত্রিক মতাদর্শ গ্রহণ না করে ইসলামি মতবাদের গণতান্ত্রিকীকরণ কেন প্রয়োজন হলো তা লেখক এড়িয়ে গেছেন। আফগানিস্তান ও ইরাকে একটি উদারপন্থী গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের ব্যর্থতা ও তার কারণ লেখক কোথাও উল্লেখ করেননি। বর্তমান ইসলামি রাষ্ট্রের ব্যাখ্যা এবং তা সফলতার কারণগুলো উল্লেখের ক্ষেত্রে লেখক যদি ৯/১১-পরবর্তী আফগানিস্তান ও ইরাকে মার্কিন গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়ার প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতার আলোকে করতেন, তবে তা অধিক গ্রহণযোগ্যতা পেত।[১৭]

নতুন ইসলামি রাষ্ট্রে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিচারক ও সাহায্যকারী সংবিধানের উল্লেখ রয়েছে, ক্লাসিক্যাল ইসলামের পতন যখন লেখক বর্ণনা করেছেন তখন লেখক উল্লেখ করেছেন যে পণ্ডিতদের অপসারণ করে লিখিত সংবিধান গৃহীত হয়, যাতে পণ্ডিতদের ব্যাখ্যার প্রয়োজন থাকে না। এই কার্য পরিচালনার জন্য বিচারকমণ্ডলী ছিলেন। তবে যেহেতু তাঁরা রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত, তাই তাঁরা সরকারের প্রতি অনুগত হন। ফলে শাসক তাঁদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন এবং ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। পূর্ববর্তী ব্যবস্থায় পণ্ডিতগণ রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োজিত ছিলেন না বলে শাসকের অনুগত হতে বাধ্য থাকতেন না। নতুন ইসলামবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিচারকেরা কীভাবে নিয়োগ পাবেন তা উল্লেখ করা হয়নি। তাঁরা যদি রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন তাহলে আমরা এই লেখাতেই জানতে পারি তার পরিণতি কী হয়। এই ব্যবস্থা কীভাবে এই প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করবে তার উল্লেখ নেই।

নতুন ইসলামি রাষ্ট্রের উত্থানের কথা বলতে গিয়ে লেখক কেবল আরব বিশ্বের দেশগুলোর কথা বলেছেন। প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশেও ইসলামবাদ রাজনীতিতে অনেক দিন ধরে আছে বা শক্তিশালী হয়ে উঠছে। এ বিষয়ে বইটিতে আলোকপাত করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে এমনকি অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পেছনেও সমসাময়িক বিশ্বরাজনীতি বড় অবদান রেখেছে। যেকোনো শাসনের পতন ও উত্থানের ক্ষেত্রে বিশ্বরাজনীতি এবং অন্যান্য বহিঃশক্তি প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তাই কোনো ব্যবস্থার উত্থান বা পতন সম্পর্কে জানতে হলে অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির সঙ্গে

সঙ্গে বাহ্যিক বিভিন্ন প্রভাবকের কার্যকরী গণনা করাও একান্ত প্রয়োজনীয়।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হলে নোআহ ফেল্ডম্যানের এই বইটি *দ্য ফল অ্যান্ড দ্য রাইজ অব দ্য ইসলামিক স্টেট* উল্লেখযোগ্য। এ কারণেই এত সমালোচনা ও দুর্বলতার পরও বইটি বহুল পঠিত ও সমাদৃত। তবে উল্লেখ্য, বইটি সাবলীল ভাষায় ইসলামি রাষ্ট্রের ইতিহাস বর্ণনায় পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে সমর্থ। তবে গবেষণামূলক লেখনী হিসেবে বইটি গ্রহণযোগ্য নয়। বইটিতে পর্যাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও উদাহরণের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

তথ্যসূত্র

১. Noah Feldman, Faculty Profile. Harvard Law School. http://hls.harvard.edu/faculty/directory/10257/Feldman. accessed on 3 July 2015

২. Mark J., 'Snap, Crackle, But Not Cropped', *The Jewish Week,* 31 August 2007. http://www.thejewishweek.com/features/snap_crackle_not_cropped. accessed on 2 July 2015

৩. Collected from Kramer M.'s personal blog *Sandbox*, from the write-up 'Noah Feldman: No more Baghdad', 6 January 2005. Kramer Martin is a President of Shalem College in Jerusalem. http://www.martinkramer.org/sandbox/tag/noah-feldman/. Accessed on 2 July 2015.

৪. Finkel A., 'Viewpoint: What now for Turkey's ruling party?', 31 October 2012, *BBC News.* http://www.bbc.com/news/world-europe-20141894. accessed on 4 July 2015.

৫. Fange A., 'The Emergency Loya Jirga: Hopes and Disappointments", July 2012, *Afghanistan Analysts Network.* http://www.afghanistan-analysts.org/wp-content/uploads/downloads/2012/09/2_Fange_The_Emergency_Loya_Jirga.pdf.

৬. 'Unmaking Iraq: A Constitutional Process Gone Awry', Policy Briefing, Middle East Briefing N 19, Amman/Brussels, 26 September 2005, *International Crisis Group: Working to Prevent Conflict Worldwide.* http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Iraq/B019%20Unmaking%20Iraq%20A%20Constitutional%20Process%20Gone%20Awry.pdf

৭. Gardner F., 'Tunisia one year on: Where the Arab Spring started', 17 December 2011, *BBC News.* http://www.bbc.com/news/world-africa-16230190. accessed on 1 July 2015.

৮. McCarthy R., 'What happens when Islamists lose an election?' 11 June 2015, *Washington Post.* http://www.washingtonpost.com/blogs/monkey-cage/wp/2015/06/11/what-happens-when-islamists-lose-an-election/. Accessed on 6 July 2015.

৯. Hamid S. and Brooke S., 'The Muslim Brotherhood's Role in the Egyptian Revolution' , 1 February 2011, *Combating Terrorism Center.* https://www.ctc.usma.edu/posts/the-muslim-brotherhood%E2%80%99s-role-in-the-egyptian-revolution. Accessed on 65 July 2015

১০. Phillips C., 'Syria's Bloody Arab Spring', *LSE Ideas: Analysis,* http://www.lse.ac.uk/IDEAS/publications/reports/pdf/SR011/FINAL_LSE_IDEAS__SyriasBloodyArabSpring_Phillips.pdf. pg 37-42

১১. Lewis A., 'Why has Morocco's king survived the Arab Spring?', 24 November 2011, *BBC News: Middle East,* http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15856989. accessed on 2 July 2015.

১২. Rohde D., 'In Jordan, the Arab Spring Isn't Over', 19 July 2013, *The Atlantic: Global.* http://www.theatlantic.com/international/archive/2013/07/in-jordan-the-arab-spring-isnt-over/277964/. Accessed on 1 July 2015.

১৩. Murad M., 'Here is how Jordan escaped the Arab Spring', 9 February 2014, *Aljazeera: Opinion.* http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/02/here-how-jordan-escaped-arab-spr-20142510106257977.html. Accessed on 30 June 2015.

১৪. Murphy B., 'Bahrain Mass Job Dismissals: Shiite Majority Claim Discrimination', 9 August 2011, *Huffington Post.* http://www.huffingtonpost.com/2011/09/08/bahrain-jobs-shiite-protests_n_954298.html. accessed on 29 June 2015.

১৫. Otto M. J., 'Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of the Twelve Muslim Countries in Past and Present', 2010, *Leiden University Press: Law, Governance and Development Research.* Pg: 23.

১৬. S. Powers, 'Law, Society and Culture in the Maghrib: 1300-1500', in *Cambridge Studies in Islamic Civilization,* October 2009, page: 82

১৭. L. Diamond, 'Building Democracy After Conflict: Lessons from Iraq', in *Journal of Democracy,* Vol.: 16, Number 16, January 2005, page: 9-10.



পাঁচ বছরের প্রকাশিত প্রবন্ধ ও বই আলোচনা

১ম সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১)

কেন 'প্রতিচিন্তা'—**মতিউর রহমান ও বিনায়ক সেন**
বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন ও গণতন্ত্র—**নুরুল ইসলাম**
বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে দুটি প্রস্তাব—**নজরুল ইসলাম**
ব্যাংক-ব্যবস্থা ও নৈতিকতাবোধ—**আকবর আলি খান**
দেশ বিভাগের অভিজ্ঞতা ও জাতীয় ইতিহাস রচনার সমস্যা—**আহমেদ কামাল**
রবীন্দ্রনাথের পূর্ববঙ্গ এবং বাংলাদেশের অভিযাত্রা—**আবুল মোমেন**
কীভাবে আরম্ভ থেকে (ফের) শুরু করতে হয়—**স্লাভো জিজেক**
বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা : আখ্যান ও বাস্তবতা
(বই আলোচনা)—**সোহরাব হাসান**
বাংলাদেশের যুদ্ধ-বিবেক (বই আলোচনা)—**মিজানুর রহমান খান**

২য় সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১১)

তত্ত্বাবধায়ক সরকারে দুই ব্যক্তির ছায়া—**মিজানুর রহমান খান**
একবিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের নতুন চ্যালেঞ্জ—**এম এম আকাশ**
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক : অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—**এম হুমায়ুন কবির**
ছিটমহলের মানুষ : রাষ্ট্রহীনতার ইতিবৃত্ত—**মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী**
সামাজিক ইতিহাসের আকর : 'বেগম' পত্রিকা—**মালেকা বেগম**
বালুচদের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বিজেঞ্জোর আত্মানুসন্ধান
(বই আলোচনা)—**সোহরাব হাসান**
বাংলাদেশের সুদীর্ঘ প্রেক্ষাপট (বই আলোচনা)—**ইফতেখার ইকবাল**

৩য় সংখ্যা (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০১২)

আমাদের কালে বৈষম্য—**আজিজুর রহমান খান**
বাংলাদেশে গণতন্ত্র : প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও ভবিষ্যৎ—**আলী রীয়াজ**
নদীর বিনিময়ে ট্রানজিট ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কোন্নয়নের
চাবিকাঠি—**নজরুল ইসলাম**
দেশভাগের আগে—**আবু সাঈদ চৌধুরীর সাক্ষাৎকার**
চল্লিশ বছর ধরে : স্মৃতি ও ন্যায়বিচার—**ইয়ান মার্টিন**
পাকিস্তান ও জিন্নাহ : গোড়ায় গলদ (বই আলোচনা)—**হাসান ফেরদৌস**
আবেগ ও বিশ্বরাজনীতি (বই আলোচনা)—**বদরুল আলম খান**

৪র্থ সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৩)

মার্কিন শিল্পবিপ্লবে বাংলার অবদান (১৭৮৪-১৮৩০)—**সিরাজুল ইসলাম**
বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়ন কেন ঘটে না?—**মির্জা হাসান**
খনার বিজ্ঞান-দর্শন—**পাভেল পার্থ**
প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা এবং শূদ্র সম্প্রদায়—**রাহমান চৌধুরী**
'সওগাত' ও আমার জীবনকথা—**মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের সাক্ষাৎকার**
কর্মী থেকে নেতা : উত্তরণের অসমাপ্ত কাহিনি (বই আলোচনা)—**আবুল মোমেন**

৫ম সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৩)

গণতন্ত্র, উপনিবেশোত্তর রাষ্ট্রশক্তি ও রাজনৈতিক উন্নয়ন : বাংলাদেশ
প্রেক্ষাপট—**হোসেন জিল্লুর রহমান**
রাজনৈতিক দলীয় অর্থায়ন : বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত—**আল মাসুদ হাসানউজ্জামান**
গণজাগরণ মঞ্চ : আত্মপরিচয়ের পুনঃ অনুসন্ধান—**সাঈদ ইফতেখার আহমেদ**
বাঙালি পল্টন ও তৎকালীন নারীসমাজ—**মুহাম্মদ লুৎফুল হক**
ফুটপাতের চটি বই ও 'মাঝারি' গরিবের আত্মপরিচয়—**সুমন রহমান**
আমার সাংবাদিকতা জীবন, দেশভাগ ও তৎকালীন
সমাজ—**আবু জাফর শামসুদ্দীনের সাক্ষাৎকার**
মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর কথোপকথন (বই আলোচনা)—**মুনির-উজ-জামান**
পরিবেশতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বাংলা বদ্বীপের রাষ্ট্র, রাজনীতি ও সমাজ
পরিবর্তনের ইতিহাস (বই আলোচনা)—**আজিজুল রাসেল**

৬ষ্ঠ সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৪)

বাঙালি জাতীয়তাবাদ : চার দশক পর—**বদরুল আলম খান**
ইয়াংকি বণিকদের বঙ্গবাণিজ্য ও প্রাচ্যচর্চা (১৭৮৫-১৮৩০)—**সিরাজুল ইসলাম**
বাংলাদেশে হরতাল ও স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতা
কাঠামো—**বার্ট সুইকেন্স ও আইনুল ইসলাম**
তারেক মাসুদের চলচ্চিত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপস্থাপনা—**সাজেদুল আউয়াল**

উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা : প্রয়োজনীয়তা ও সীমাবদ্ধতা—**মিজানুর রহমান খান**
কুলদীপ নায়ারের আত্মজীবনী বা ইতিহাসের পুনরুল্লেখ (বই আলোচনা)—**সোহরাব হাসান**
বাঙালি এক ইতিহাসবিদের আত্মকথনে সমসাময়িক সমাজ-রাজনীতি (বই আলোচনা)—**মোশারফ হোসেন**

৭ম সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ২০১৪)

বাংলাদেশ : একটি ইসলামি প্যারাডাইমের সন্ধানে—**বদরুল আলম খান**
নবধারার নাগরিক আন্দোলন : প্রসঙ্গ বাংলাদেশ—**মহিউদ্দিন আহমদ**
গণমুখী জাতীয় আর্থরাজনৈতিক কৌশলপত্রের সন্ধানে একটি দলনিরপেক্ষ অনুসন্ধান—**হায়দার আলী খান**
বাংলাদেশের পোশাক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা এবং সামাজিক অগ্রগতির একটি বিশ্লেষণ—**খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম ও ফারজানা সেহরীন**
আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের দুই দশক : একটি মূল্যায়ন—**রাশেদ উজ জামান ও নিলয় রঞ্জন বিশ্বাস**
মুজিব হত্যায় মার্কিন সংশ্লিষ্টতা : একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান (বই আলোচনা)—**এ এস এম আলী আশরাফ**
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ : ভূরাজনীতি ও বিস্মৃত গণহত্যা (বই আলোচনা)—**খলিলউল্লাহ্**

৮ম সংখ্যা (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৪)

সপ্তদশ শতকের বাংলায় ধর্মীয় জীবন : কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা—**আকবর আলি খান**
বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক ও 'অন্যের' ভাবমূর্তির ধারণা—**ইমতিয়াজ আহমেদ**
গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা : বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট—**সাঈদ ইফতেখার আহমেদ**
বাংলাদেশের লোকায়ত জলবায়ুবিজ্ঞান : একটি প্রতিবেশ-নারীবাদী আলাপ—**পাভেল পার্থ**
মওদুদ আহমদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের একটি মূল্যায়ন (বই আলোচনা)—**মিজানুর রহমান খান**
'যদি ইসলাম পৃথিবীতে না থাকত?' (বই আলোচনা)—**আসজাদুল কিবরিয়া**

৯ম সংখ্যা (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৪)

প্রপাগান্ডা ও গণমাধ্যম : যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ—**সামিয়া রহমান ও সৈয়দ মাহফুজুল হক**
পলাশীর যুদ্ধ ও সম্পদ পাচারের সূত্রপাত—**এম মোফাখখারুল ইসলাম**

মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্তে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অস্ত্র ও গ্যাসপ্রবাহ—**ভিলেম ভ্যান শেন্ডেল**
মোখলেসুর রহমানের (সিধু ভাই) সাক্ষাৎকারভিত্তিক রচনা 'আমার জীবন-কথা ও সময়'—**সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সরদার ফজলুল করিম ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম**
রাজনীতিতে দায়িত্বশীলতা ও গণতন্ত্রের শর্ত (বই আলোচনা)—**হাসান শফি**
বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট (বই আলোচনা)—**আজিজুল রাসেল**

১০ম সংখ্যা (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫)

বাংলাদেশে নতুন ইসলামপন্থী জনপরিমণ্ডল—**আলী রীয়াজ**
নজরদারির পুঁজিবাদ : একচেটিয়া-ফিন্যান্স পুঁজি, সামরিক শিল্প কমপ্লেক্স ও ডিজিটাল যুগ—**জন বেলামি ফস্টার ও রবার্ট ডব্লিউ ম্যাকচেনজি**
স্বামীর প্রবাসকালে গ্রামীণ বাংলার নারী : ক্ষমতা, শক্তি ও অধীনতার ধারণার পুনর্ব্যাখ্যা—**সৈয়দা রোয়ানা রশীদ**
লিসবনে শহীদ মিনার : পর্তুগালপ্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে স্মৃতি ও সম্প্রদায়ের রাজনীতি এবং দীর্ঘ দূরত্বের জাতীয়তাবাদ—**হোস ম্যাপ্রিল**
মার্কিন দলিলপত্রের সাক্ষ্য : কেন বুদ্ধিজীবী হত্যা? কীভাবে জামায়াত জড়িত?—**মিজানুর রহমান খান**
'অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিন' (বই আলোচনা)—**আসজাদুল কিবরিয়া**
কিসিঞ্জারের বয়ানে পরিবর্তনশীল বিশ্বব্যবস্থার রূপকল্প (বই আলোচনা)—**রেজওয়ান মাসুদ**

১১তম সংখ্যা (এপ্রিল-জুন ২০১৫)

বাংলাদেশ : যেখানে গণতন্ত্রের রং ধূসর—**বদরুল আলম খান**
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠের আধিপত্য—**লাইলুফার ইয়াসমিন**
গ্রামীণ নারীর পরিবেশ সচেতনতা ও পরিবেশ অবনয়নের প্রতিক্রিয়া—**সাবেকুন নাজমুন**
ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মন—**আবদুর রাজ্জাক**
ঢাকার বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত এক নারীর শিক্ষা-সাংস্কৃতিক উদ্যোগ—**আনোয়ারা বাহার চৌধুরী**
জামদানির ইতিহাস, ঐতিহ্য ও ভৌগোলিক নির্দেশনা—**ইফতেখার ইকবাল**
বাগান থেকে মহাকাশ—**মীজান রহমান**

লেখক পরিচিতি

এম এম আকাশ

অর্থনীতিবিদ ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক। কৃষি খাত ও অর্থনীতির নানা বিষয়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—বাংলাদেশের অর্থনীতি: অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ (প্যাপিরাস, ২০০৪); ভাষা আন্দোলন : শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ (ইউপিএল, ১৯৯০); [যৌথ] রিফর্ম অব স্টেট ওন্ড এন্টারপ্রাইজেস অ্যান্ড প্রাইভেটাইজেশন (পাঠক সমাবেশ ও সিপিডি, ১৯৯৮)।

এমিলি মরিস

ক্যারিবিয়ান ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়ন অর্থনীতির বিশেষজ্ঞ হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু হওয়ার আগে এমিলি মরিস বিনিয়োগ বিশ্লেষক, রিসেপশনিস্ট, হাউজিং ডেভেলপমেন্ট কো-অর্ডিনেটর, স্কুলশিক্ষক ও শিক্ষা প্রভাষক হিসেবে কাজ করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের উন্নয়ন অর্থনীতি, সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন গবেষণা ইনস্টিটিউটে দুই বছর কাজ করার পর লন্ডনের ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে ১৩ বছর কাজ করেন যেখানে তিনি জ্যেষ্ঠ সম্পাদক/অর্থনীতিবিদ ছিলেন। তিনি ২০০৮-১২ সালে ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব আমেরিকা (আইএসএ) সে পিএইচডি থিসিস সম্পন্ন করেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও প্রতিবেদনের মধ্যে 'How exceptional is the Cuban economy?' Chapter 3 in Laurence Whitehead and Bert Hoffman (eds) Debating Cuban exceptionalism, Palgrave Macmillan, 2007; 'Macroeconomic risks of Cuban economic adjustment', Temas magazine, Havana; regular reports on Cuba for the Economist Intelligence Unit, Oxford Analytica and Latin American Newsletters; 'How Will U.S.-Cuban Normalization Affect Economic Policy in Cuba?' (opens as pdf), Center for Latin American & Latino Studies at American University and Cuba Program at the Social Science Research Council, Implications of Normalization Forum, 2015 ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গোলাম রব্বানী

শিক্ষক ও গবেষক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। শিক্ষকতা ও গবেষণার ক্ষেত্র বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস, বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত বিষয়াবলি ও দক্ষিণ এশিয়া। ছিটমহল বিষয়ে এম ফিল গবেষণার পর বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত ও ছিটমহল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা অব্যাহত রেখেছেন। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা: স্টেটলেসনেস ইন সাউথ এশিয়া: লিভিং ইন বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া এনক্লেভ্স (রিসার্চ মনোগ্রাফ), থিওরিটিক্যাল পার্সপেক্টিভ্স, ২০০৭।

আলতাফ পারভেজ

লেখক, গবেষক, সাংবাদিক; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে স্নাতকোত্তর অধ্যয়ন শেষ করে সাংবাদিকতার পাশাপাশি গবেষণামূলক কাজ করেছেন মূলত পলিটিক্যাল হিস্ট্রি ও দলিত বিষয়ে। সাংবাদিকতায় তিনি আশির দশকে আনসার বিদ্রোহ ও কারা বিদ্রোহের ওপর অনুসন্ধানী কাজে 'কাউন্টার রিপোর্টিং' ধারণার প্রবর্তন করেন। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ *মুজিব বাহিনী থেকে গণবাহিনী: ইতিহাসের পুনর্পাঠ* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রাহমান চৌধুরী

লেখক, গবেষক ও নাট্যকার। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—মহাবিদ্রোহ ও সম্রাট বাহাদুর শাহ (বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫); ক্রীড়নক (বাংলা একাডেমী, ২০০১); রাজনৈতিক নাট্যচিন্তা ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মঞ্চনাটক (বাংলা একাডেমি, ২০০৭); 'মুক্তিযুদ্ধ', 'দুই বিঘা জমি' এবং 'বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের পুড়ে যাওয়া বিবেক' (সাপ্তাহিক ২০০০, ২০০৫)।

আইরিন খান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেছেন। তিনি ডাড বৃত্তি নিয়ে জার্মানি থেকে উন্নয়ন ও শাসন বিষয়ে স্নাতকোত্তর করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পিস অ্যান্ড স্টাডিজ ও বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইন্সটিটিউটে গবেষণার কাজ করেছেন। তিনি বর্তমানে শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কাজের সাথে যুক্ত আছেন। তাঁর আগ্রহের বিষয় নিরাপত্তা, ইসলামি চরম পন্থা, রাজনৈতিক ইসলাম, ভূরাজনীতি ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন :

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৮১




Study in Abroad
Student, Spouse
Business & Visit
VISA Support
USA · Canada · Australia
Austria · Hungary · Slovakia
New Zealand · Germany
Finland · Sweden · Switzerland
UK · Cyprus · Malaysia · China
ইউরোপে একই ভিসায় SCHENGEN ভূক্ত ২৫টি দেশে ভিজিট করার সুযোগ।
Certificate / Diploma / Undergraduate /Postgraduate / Masters Programs
-এ প্রায় ৩০০ এর বেশি বিষয়ে পড়ার সুযোগ
বিদেশে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী HSC ২০১৫ পরীক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে বিশেষ ব্যবস্থা
বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক -এর মাধ্যমে
মালয়েশিয়ায় উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য
AirAsia Free Ticket
BSB
Global Network
Admission & Information
Plot-22, Gulshan Circle-2, Dhaka
Tel: 9890523, M: 01720557104-8, 0172057118/113